রূপছায়া

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নাথ ব্রাদার্স
২৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ নাথ
নাথ ব্রাদার্স
২৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
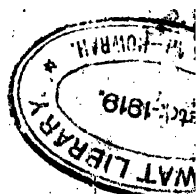
কথাটার ভিতর হইতে এমন ইতর ইঙ্গিত দারুণ বীভৎসতা লইয়া ফুটিয়া বাহির হইল যে, মানস-নেত্রে তা দেখিয়া ব্রজনাথ শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল,—পয়সার কথা হচ্ছে না, নীরু! আমার ছেলে...আমার খুবই স্নেহের ধন, আদরের বস্তু! এ হলো মনের কথা। আমার মনের অবস্থা এখন ভালো নয়, অর্থাৎ আমোদ-আহ্লাদ করবার মতন.. বুঝলে!

—কে বলচে তোমায় আমোদ-আহ্লাদ করতে...করো না ..বলিয়া বিদ্যুৎগতিতে নীরজা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

এমনি করিয়াই নানা ব্যাপারে ক'বৎসর ধরিয়া অহর্নিশি খিটিমিটি চলিয়া আসিতেছে। যে-বয়সে মানুষের প্রাণ সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব-দ্বেষ বা দেনা-পাওনার হিসাব দূরে ঠেলিয়া রাখে, সে-সবের সন্ধানও লইতে জানে না—আকাশ-প্রমাণ দরদ, মমতা, আর আশার রঙীন স্বপ্নে প্রাণটাকে ভরপূর রাখে, ঠিক সেই বয়সে এ সব তর্ক-কলহ, আর তাও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে...ব্রজনাথের এক-একবার মনে হইত, এই সংসার, এই স্ত্রী...ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া জীবনের পথে তাকে চলিতে হইবে! এর চেয়ে আশার ফানুষটাকে ছিঁড়িয়া চূর্ণ করিয়া লোটা-কম্বল লইয়া বাহির হইয়া পড়াও যে ঢের ভালো—তাহাতেও ঢের বেশী আরাম!

তার এই তরুণ বয়স, এই যৌবন-স্বপ্ন সবই যে ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে! কতবার মনকে প্রস্তুত করিয়া নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে নত করিয়া সে গিয়া নীরজার কাছে দাঁড়াইয়াছে,...ওগো তরুণী প্রিয়া, তোমার যৌবন-কুঞ্জে ঐ যে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়াছে, যার বর্ণে-গন্ধে একটা পিয়াসী চিত্তকে পরিপূর্ণ মশগুল, প্রাণটাকেও সার্থক সুন্দর করিয়া তুলিতে পারো, সে ফুলগুলাকে কেন অকারণ রোষের ঐ বিদ্যুৎ-দাহে, কথার ঝড়ে

ঝরাইয়া নির্মূল করিয়া দাও! ইহাতে বেদনাই যে সার হয়, তা নয়! ঐ ভ্রূভঙ্গী, ঐ রোষের দাহ ..ও যে তোমারো চিত্তে অনেকখানি অস্বস্তির সৃষ্টি করিয়া তোলে। জীবন বড় ক্ষণিক,...যৌবন সে ক্ষণিক-জীবনের অতি-ক্ষুদ্র একটা নিমেষমাত্র—কেন এ যৌবনের অপব্যয় কর! তোমার প্রাণের সুধা-মধু,...তার একটি বিন্দুর কাঙাল যে আমি! কিন্তু হায়, সবই মিছা হয়! নীরজা তার চতুর্দ্দিকে অহঙ্কারের প্রাচীর তুলিয়া এমন কঠিন দুর্গ রচিয়া তার মধ্যে বসিয়া থাকে যে, ব্রজনাথের সমস্ত মিনতি বেদনায় ব্যথাতুর হইয়া ফিরিয়া আসে!

পাছে স্ত্রী-পুরুষের এই কলহ বাহিরে এতটুকু কৌতুক বা কোনো অলস জল্পনা গড়িয়া তোলে, এই আশঙ্কায় ব্রজনাথ নীরবে এ রূঢ়তা সহিয়া যায়। দৃষ্টির ভঙ্গীতে, মুখের ভাবে বা বাক্‌হীন পরুষতায় অন্তরের এ দাহের একটু ছিটাও সে বাহিরে প্রকাশ হইতে দেয় না! এত বড় বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসীর এই কলরব, তার মধ্যে কেহ বুঝিতেও পারে না, এই তরুণ বয়সে ব্রজনাথ নিজের মনকে কি দুশ্চর বৈরাগ্যের মাঝে নিঃসহায় ছাড়িয়া দিয়াছে! যে-বয়সে তরুণ প্রাণ তরুণী প্রিয়তমার দুটো সোহাগ-বচন, তার রূপের দীপ্তি, সরস অনুরাগ-পরশ চাহিয়া আকুল হয়, সেই বয়সে তার সব-চাওয়ার মূলে স্ত্রী এমন আঘাত করিল যে, চাওয়ার জিনিষ জগতে কিছু থাকিতে পারে, এ কথাটাই ব্রজনাথ ভুলিয়া গেল।

সংসার তবু গড়াইয়া চলিয়াছিল। যে-সংসারে টাকা-পয়সারূপ তৈলের জোগান ঠিক থাকে, তার চলিবার পক্ষে কোথাও বড় বাধে না। হয় তো স্বামী-স্ত্রী একদিন পাশাপাশি মিলিতে পারিত—যদি এ সংসারে

বাহিরের দিক হইতে কোনো অভাব বা অভিযোগ উঠিত! কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না! স্ত্রী নিজের দর্পে নিজের খেয়াল লইয়া মত্ত থাকিত, কোনো অভিযোগ-অনুযোগ লইয়া স্বামীর সামনে তাকে দাঁড়াইতে হইত না এবং স্বামীও স্ত্রীর কোনো কাজে না লাগিয়া আর-পাঁচটা আস্‌বাবের সামিল হইয়া সংসারে সজ্জার সম্পূর্ণতাই বিধান করিতেছিল! আস্‌বাবের যেমন প্রাণ নাই, মন নাই—স্বামী ব্রজনাথও নীরজার কাছে তেমনি!...একটা প্রাণহীন আসবাব মাত্র! যখনি স্বামী বা স্ত্রীর মন জাগিত, তখনি তর্ক উঠিত, কলহ-কলরব বাধিত! মনের সে ক্রোধ-গর্জ্জন কোনমতে দাবিয়া রাখিয়া ব্রজনাথ হয় নীচের ঘরে, নয় বন্ধু-মজলিসে প্রস্থান করিত, এবং নীরজা তার রাগের ঝাল মিটাইত দাসী-চাকর বা আশ্রিত আত্মীয়-পরিজনের উপর।

কিন্তু এত দোলায়, এত আঘাতে শক্ত ষ্টীমার যেমন চিরদিন জলের বুকের উপর টিঁকিয়া থাকিতে পারে না, একদিন জলের নীচে তলাইয়া যায়, তেমনি কঠিন কথার ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যাপার এমন দাঁড়াইল যে, ঐ তুচ্ছ ভৃত্যটাকে বকাবকি লইয়াই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মস্ত ব্যবধান দেখা দিল। নীরজা তিন ছেলে-মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়া উঠিল—আর ব্রজনাথ বন্ধু-মজলিসে ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া বায়োস্কোপ দেখিতে চলিয়া গেল।

২

পিকচার-প্যালেস, না, অপ্সর-লোক! শ্রী ও সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন! রূপের উৎস ছুটিয়াছে, হাসি-আনন্দের অজস্র লহর চারিদিকে! সজ্জিত বেশভূষা! এদের পানে চাহিলে মনে হয়, এরা কোন্ কল্প-লোকের অধিবাসী—হাসি আর আনন্দ লইয়াই শুধু আছে! মনে কাহারো কোনদিন কোনো বেদনার আঘাত লাগে নাই,—তরল কৌতুকে জীবনটাকে ঢালিয়া নিশ্চিন্ত আরামে, পরম সুখে বাস করিতেছে! এদের মধ্যে নিজের এই বাসনা-খিন্ন মনটাকে লইয়া বসিতে তার এমন বাধিতেছিল! কি অশুচিতার কালিই না তার অন্তর চিরিয়া সারা অবয়বে লাগিয়া রহিয়াছে!

বায়োস্কোপের পর্দ্দা উঠিলে কয়েকটা সাজ-পোষাকের ও রং-তামাসার ক্ষুদ্র ছবির পর যে-ছবি জাগিল, সে-ও কোন্ দুনিয়া-ছাড়া স্বপ্ন-লোকের সৃষ্টি করিয়া তুলিল! রূপের সেখানে উৎসব চলিয়াছে! তরুণীর দলে মন লইয়া কি ও খেলা! ছবি ছিল,—এক সমুদ্রের নীল জলে তরুণীর দল সাঁতার কাটিতেছে—জলের বুকে যেন কমলের মালা ভাসিতেছে! কি স্বচ্ছন্দ তাদের জলখেলার ভঙ্গী! রাজ্যের রূপ ঐ সব পরিপুষ্ট-যৌবনারা যেন তাদের সর্ব্ব অবয়বে লুটিয়া আনিয়াছে! বিশেষ ঐটি... তার কৌতুক, তার হাসি...যেন কোন্ মায়া-লোকের!

তারপর এক মোটর-বোটে চড়িয়া সেখানে আসিল এক তরুণ যুবা। তাকে দেখিবামাত্র তরুণীদের চঞ্চলতার মাত্রা আরো বাড়িয়া উঠিল..

বিশেষ সেই নায়িকাটির। তরুণীরা গিয়া বোটে চড়িয়া তরুণকে সবলে জলে ফেলিয়া দিল। তাদের সঙ্গে খেলায় মাতিয়া নায়িকার পানে চাহিবার অবসরও তরুণের মিলিল না! এই খেলা-রঙ্গের মাঝ দিয়া ক্রমে জীবনের সুগভীর মুহূর্তে আসিয়া সকলে পৌঁছিল!...তরুণীর অভিমান প্রচণ্ড হইয়া তার উদ্যত হৃদয়কে তরুণের সহস্র আবেদন হইতে এমন পৃথক করিয়া রাখিল যে, কোথায় গেল তরুণের সে চপল খেলা-হাসির উচ্ছ্বাস! বেচারীর শত সাধনা ব্যর্থ নিস্ফল করিয়া তরুণী তেমনি বিমুখতায় নিজের মনকেও বাঁধিয়া ফেলিল! ইহার পর ইন্‌টারভ্যাল।

দপ্ করিয়া বিজ্‌লী-বাতিগুলা জ্বলিয়া উঠিল। সামনের সীটে দর্শকের দলে নানা চীৎকার-কলরব উঠিতে ব্রজনাথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে বুঝিল, সে কঠিন সহরের বুকে পিক্‌চার-প্যালেসে বসিয়া ছবি দেখিতেছে! পরীর ডানায় ভর করিয়া কোনো মায়ায় রচা স্বপ্ন-লোকে সত্যই উড়িয়া যায় নাই! আর তার চোখের সামনে ঐই যে নিমেষ-পূর্বে ঘটনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে কোন্ অজানা পুরীর মানব-হৃদয়ের দুঃখ-সুখ চপলার চকিত-চমকের মত জাগিয়া নিবিয়া, নিবিয়া জাগিয়া বহিয়া চলিয়াছিল, তার প্রাণকে নানা ছন্দে দোল দিয়া—সেগুলা স্বপ্নলোকেরও নয়, মর্ত্যলোকেরও নয়, সেগুলা অবোলা ছবি, বিভ্রম মাত্র...তখন সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া একবার ঐ দর্শকের দলের উপর দুই চোখের দৃষ্টি বুলাইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

এই যে ছবির জগতে আনন্দের দীপ্ত সুর জাগিয়া উঠিয়াছে, ও সুর সত্য করিয়া প্রাণের মধ্যে পাওয়া কি এমনি কঠিন? ও প্রীতি, ঐ স...? অমনি তার মনে হইল, তার নিজের জীবনটা কি-ভাবেই

না ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে! মানুষের জীবনে তরুণী নারীর রূপ কি কুহক জাগাইয়া তোলে, আবার কি নিষ্ফলতাও সে আনিয়া দেয়,—কাজ-কর্ম্মের শত কোলাহল ভেদ করিয়া মন ঐ রূপের সুধা পান করিতে পাইলে কি আনন্দেই না মশ্‌গুল হয়!......

হায় রে, তার জীবনটা আঁধারেই কাটিয়া গেল! এই যৌবন, যা নেহাৎ ক্ষণিক; যে-যৌবনে শত কল্পনা ময়ূর-পুচ্ছের বিচিত্র বর্ণচ্ছটার মত রঙীন রেখায় ফুটিয়া ওঠে...সে-যৌবন তার প্রাণে কল্পনার একটু রেখাও পাত করিয়া গেল না! জীবনের ঘন আঁধারে ঐ রূপ বিদ্যুতের ক্ষণিক চমকও একটা ফুটাইয়া তুলিল না! অথচ একদিন...কি স্বপ্নই সে দেখিত!

অদূরে একটা সীটে তার নজর পড়িল। এক তরুণ যুবা কি আদরে, কি সোহাগে তার পাশের সঙ্গিনীটিকে আইশ-ক্রীম খাওয়াইতেছে.... ও-ধারে ঐ দুটি তরুণ-তরুণীর নিভৃত গুঞ্জন! কি কথা কহিতেছে? ...প্রাণের কত আবেগ-ভরা কি সাধ, কি আশার রাগিণী...? দুনিয়ার আশে-পাশে আরো যে বহু প্রাণী পড়িয়া আছে, সেদিকে তাদের যেন কোনো লক্ষ্যও নাই...!

প্রচণ্ড বেদনায় ব্রজনাথের সারা অন্তর হা-হা করিয়া উঠিল। ওরে প্রেমস্বর্গচ্যুত, ওরে দুর্ভাগা, এখানে কি লইয়া এদের মাঝখানে তুই আসিয়া বসিয়াছিস্! ওরে অভিশপ্ত, ওরে উপেক্ষিত, সরিয়া যা, তোর নিশ্বাসে এদের এ হাসি-খেলা, এ রূপের উৎসব শুকাইয়া ম্লান হইবে!

ওদিকে আবার আলো নিবিল,...ছবি সুরু হইল। তরুণের বেদনার ধারা...প্রচুর ধৈর্য্য লইয়া অধীর প্রতীক্ষা...নায়িকার মনটাও ক্ষণে ক্ষণে

উদাস হইয়া আসে, তার খেলা সহসা থামিয়া যায়, ভিড়-জটলা ছাড়িয়া বিদ্যুতের মত কোথায় নিভৃত অন্তরালে সে সরিয়া পড়ে! হাসি-খুশীর মাঝে অকস্মাৎ তাঁর দুই চোখ ছলছলিয়া ওঠে, রূপের জ্যোৎস্নার উপর ম্লানিমার মেঘ পাৎলা কালো পর্দার আড়াল রচিয়া তোলে...সে কি করুণ, কি মধুর! নায়িকার মনের মধ্যে ঐ যে নীরব দ্বন্দ্ব, ওটুকুও প্রাণ দিয়া অনুভব করিবার মত...!

শেষে নায়িকা তার ঐ মৌন অভিমানে-রচা কঠিন দুর্গে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না! তরুণ কোন্ পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িয়া মূর্চ্ছাতুর দেহে গৃহের কোণে পড়িয়াছিল, নায়িকা পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া তার চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িল, দুই চোখে অশ্রুর ঝরণা—ওগো প্রিয়, ওগো বন্ধু, মার্জ্জনা, মার্জ্জনা কর! আমার বিমুখতার তীক্ষ্ণ শর তোমার অন্তরটাকে বিঁধিয়া বিঁধিয়া জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছে—জানি, তা জানি! নিজের মন দিয়াই জানি, কি আঘাত তোমায় আমি দিয়াছি, এই দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি ধরিয়া! কিন্তু এ মনও সেই সঙ্গে কি বেদনা সহ্য করিয়াছে, অহরহ...তা যদি তুমি বুঝিতে!

ব্রজনাথের মন ভরিয়া উঠিল। নায়িকার ঐ অশ্রুর রাশিতে কি আরাম, সান্ত্বনার কি স্নিগ্ধ পরশ!

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিতে ব্রজনাথ চাহিয়া দেখে, লোকগুলা উঠিয়া বাড়ী চলিয়াছে। কখন্ যে ছবি বন্ধ হইয়াছে, সেদিকে তার হুঁস ছিল না। স্বপ্নাভিভূতের মত ব্রজনাথ উঠিয়া বাহিরে আসিল।

সোজা আসিয়া সে কার্জ্জন পার্কে ঢুকিল। একধারে একটা বেঞ্চ খালি পড়িয়াছিল, ব্রজনাথ বেঞ্চটায় বসিয়া পড়িয়া একটু-আগে-দেখা

ছবির কথাই ভাবিতেছিল! ঐ তো নায়িকা—ও'ও নারী, রূপে-সুষমায় চারিদিক আলো করিয়া তুলিয়াছে! তবু তো সেই তরুণের পানে দরদে একেবারে ফাটিয়া লুটাইয়া পড়িল! কতখানি তার প্রীতি আর ভালোবাসা! সার্থক ঐ তরুণের জীবন! তার কিসের অভাব? অমন রূপসী তরুণীর এত দরদ পাইলে ব্রজনাথ যে দুনিয়ায় আর কোনো কিছুর পানেও চাহিয়া দেখে না!

আর, তার ভাগ্য?...ব্রজনাথ শিহরিয়া উঠিল। মুখরা স্ত্রী, রূপের ছায়াও তার অবয়বে নাই! অথচ এই স্ত্রীকে ব্রজনাথ চিরদিন সহ্য করিয়া আসিয়াছে! তার পরুষ বচন, তার সহস্র অভিযোগ—এ-সবের বিরুদ্ধে নিমেষের জন্ত ব্রজনাথ কোনো দিন চোখ রাঙাইয়া চাহে নাই! সে যা বলিয়াছে, ব্রজনাথ তাই মাথা পাতিয়া লইয়াছে। তার রূঢ়তা, তার বিমুখতা... এত আঘাতেও ম্লান হাসি ঠোঁটে লইয়া সে নীরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে!

তবু নীরজা চলিয়া গেল...তুচ্ছ ব্যাপারে কতখানি রোষের বহ্নি জ্বালিয়া দিয়া! ব্রজনাথের মনটাকে দুই পায়ে নির্ম্মমভাবে মাড়াইয়া দলিয়া সে চলিয়া গেল! নারী, না, পাষাণী!......

ব্রজনাথ আকাশের পানে চাহিল, একরাশ নক্ষত্র স্তম্ভিত নেত্রে তারি দিকে চাহিয়া আছে! তার বুক দুলিয়া উঠিল। তার মন এখানে বেদনায় সারা হইয়া যাইতেছে, সেই মুখরা হৃদয়-হীনা স্ত্রীর প্রসাদটুকু ফিরিয়া পাইবার জন্ত আজো...এখনো সে কি অধীর আকুল!...কিন্তু নীরজা কি সেখানে ব্রজনাথের কথা একটুও ভাবিতেছে?...তার

মিনতি-ভরা অশ্রুর স্মৃতি...? একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বুকের মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, না!

দূরে গাড়ী ছুটিয়াছে! ওই-কর্ম্ম-শ্রান্ত লোকজন,...কি আশা বুকে লইয়াই চলিয়াছে সব...গৃহ-কোণটুকু লক্ষ্য করিয়া! সেখানে কি আরাম, কি স্নেহ-প্রীতি না তাদের জন্য পুঞ্জিত আছে!...ব্রজনাথ উঠিয়া পড়িল। এত-বড় দুনিয়ায় একটু গিয়া জুড়াইতে পারে, এমন একটি ক্ষুদ্র গৃহকোণ...শুধু তারি নাই! একটু দরদ-ভরা দৃষ্টিতে প্রাণের পানে চাহিবে, এমন-জনও তার কোথাও নাই! এই বিপুল বিশ্বে সে একা, নেহাৎ একা! মন তখনি সহসা গর্জ্জিয়া উঠিল, কাপুরুষ! সে কি কিছু পারে না? দরদ-প্রীতি সবলে লুণ্ঠন করিতে না পারুক, এই বিমুখতা, এই দর্প,...সেগুলাকে প্রচণ্ড আঘাতে খর্ব্ব করিতে পারে, এটুকু শক্তিরও তার এমনি অভাব!

পার্কে নামিয়াই গাড়ী সে বিদায় করিয়া দিয়াছিল; উঠিয়া এস্‌প্লানেডে ট্রামের আস্তানায় আসিল। হঠাৎ পিছন হইতে কে আসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া ডাকিল,—ব্রজনাথ...

ব্রজনাথ ফিরিয়া দেখে, অবিনাশ। সে কহিল,—অবু যে! এমন সময় কোথা থেকে হে?

অবিনাশ কহিল,—আর বল কেন! বোনটার জন্যে পাত্র দেখতে গেছলুম ভবানীপুরে। ডাগর হয়েচে, বিয়ে দিতে হবে, অথচ সে তো এতগুলি পয়সার খেলা! কি যে করবো!...কথার শেষে অবিনাশের কণ্ঠ হইতে একরাশ হতাশা ঝরিয়া পড়িল।

ব্রজনাথ কহিল,—পছন্দ হলো?

অবিনাশ কহিল,—তা হয়েচে। তবে পছন্দ হলেই তো শুধু চলবে না।...এক কাঁড়ি টাকা যোগাতে হবে।

ব্রজনাথ কহিল,—কত চায়?

অবিনাশ কহিল,—ফর্দ্দ কাল পাঠাবে, বল্লে...তা তুমি এখন বাড়ী যাবে তো?

ব্রজনাথ কহিল,—এখনি ফিরে কি করবো?

অবিনাশ কহিল,—জানি, বিরহী তুমি! কিন্তু একা এই মাঠে এত রাত্রে...

ব্রজনাথ কহিল,—রাত হয়ে গেছে, তা ঠিক! কিন্তু কি করা যায়, বল দিকিন্? বলিয়া অবিনাশকে একবার নিরীক্ষণ করিয়া সে আবার কথা কহিল, বলিল,—খিদেও পেয়েচে। যাবে হোটেলে? তোমারও তো খাওয়া-দাওয়া হয়নি?

অবিনাশ কহিল,—হোটেলে! তা চল! বাড়ীতে তো সেই নিত্যি-পূজোর নৈবিদ্যি! এ-তবু একটু মুখ বদলানো যাবে, মন্দ কি!

দুইজনে উঠিয়া তখন ইম্পীরিয়ালের দিকে চলিল।

৩

আহার করিতে বসিয়া জীবনটাকে লইয়া বহু আলোচনা হইল। ব্রজনাথ কহিল,—জীবনটা ভারী একঘেয়ে ঠেকচে। কোনো বৈচিত্র্য নেই।...এ কি জীবন? ঘৃণা ধরে গেছে।

অবিনাশ কহিল,—তা তো ধরবেই হে! ভগবান পয়না দিয়েচেন, মন দিয়েচেন,—এত বড় পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্যও রয়েচে—তবে তা নিতে জানা চাই!

—তার মানে?

অবিনাশ কহিল,—চারিদিকে একটু চোখ মেলে চেয়ে দেখতে হয়।

বায়োস্কোপের সেই রূপ-লীলার দৃশ্য তখনো ব্রজনাথের মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই!...রূপ! রূপ! যৌবনের উদ্যানে রূপের গোলাপ... তার শোভা, তার গন্ধ...মন যে তারি স্বপ্নে বিভোর! তার মন অমনি রূপের সঙ্গ চাহিতেছে আজ...অমনি হাসি-খুশী-আনন্দের ডালি! কিন্তু সে যে দুর্লভ, সাধনার সামগ্রী! সজ্জিত বেশে হাসির উচ্ছ্বাসের মতই তরুণী মেম-সাহেবরা পথ হাঁটিয়া চলিয়াছে, হোটেলের প্রকাণ্ড খোলা জানলার মধ্য দিয়া তাদের হাসির অতি-মৃদু উচ্ছ্বাসটুকু অবধি আসিয়া প্রাণের উপর পরশ বুলাইয়া যাইতেছিল!

ব্রজনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তাই চেয়েই দেখবো এবার—রাজী!

অবিনাশ স্থির দৃষ্টিতে ব্রজনাথের পানে চাহিল। ব্রজনাথ কাঁটা-চামচ নামাইয়া প্লেটের উপর রাখিয়া কহিল,—বৈচিত্র্য কিছু দেখাতে পারো? আমার বন্ধুর কাজ করবে, তাহলে। আমি তোমার কাছে চিরঋণী থাকবো। সত্যি, প্রাণটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল! এই বয়সে অবু, এতখানি হাহাকার নিয়ে একা ঘরের কোণে পড়ে থাকা, এ যে কি দুর্ভাগ্য, তা বলতে পারি না! যৌবনকে এমনি করেই গেরুয়া পরিয়ে ছেড়ে রেখে দেবো?

অবিনাশ কহিল,—কিন্তু গৃহিণী...?

ব্রজনাথ কহিল,—Pooh! গৃহিণী মানুষ হলে কি আর এ যাতনা সহ্য করি! আমার সব-চেয়ে অপরাধ কি, জানো? তারে ভালোবাসা! কিন্তু কিসের জন্য? এ ভালোবাসা আমি দুই পায়ে চেপে মাড়িয়ে চূর্ণ করতে চাই! কি না সহ্য করেচি...? তোমরা জানো না অবু, হাসি-মুখ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে মিশেচি, কথা কয়েচি, গল্প করেচি, কিন্তু প্রাণ আমার সারাক্ষণ জ্বলে পুড়ে একশা হয়ে গেছে। আজ আমি জীবনটাকে ফিরিয়ে পাবার জন্য, উপভোগ করবার জন্য আকুল মরিয়া হয়ে উঠেচি। এসপার, নয়, ওসপার! একবার দেখতে চাই, এ-মনকে তার যোগ্য খোরাক দিয়ে একে সরস, উপভোগ্য করে তুলতে পারি কি না!—কথাগুলা বলিতে বলিতে ব্রজনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

অবিনাশ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ব্রজনাথকে লক্ষ্য করিতেছিল,...ক্ষণিকের উত্তেজনা, না, এ সত্যই ভোগের আকুলতা!

অবিনাশ সেই শ্রেণীর জীব, অপরকে আনন্দের ডালি দিবার ছলে যারা নিজেদের চারিদিকটাকে বেশ করিয়া গুছাইয়া তোলে! পরকে নন্দনের মাঝে পাঠাইয়া তারি নেশায় মশগুল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াও

নিজে সে নেশায় বিহ্বল আত্মহারা হয় না, আপনাকে সচেতন রাখে! বন্ধু সাজিয়া ধনীর বৈঠকখানায় শুধু যে-সব জীব আস্তানা পাতে, এবং ধনীকে সর্ব্বসুখী করার ছলে নিজের পাওনা ষোল আনা হিসাব করিয়া পকেটে পুরিয়া লয়! বন্ধুর জন্য অসহ্য দরদ জানাইতে যে সহস্র-মুখ হইয়া ওঠে, অথচ ভিতরে ভিতরে নিজের দিকে লক্ষ্য যার সর্ব্বক্ষণ!

অবিনাশ কহিল,—বুঝেচি। তা একটু গানটান শোনো যদি...

ব্রজনাথ বিরক্ত হইয়া কহিল,—কি তুচ্ছ গান শোনার কথা তুলচো হে! আমার প্রাণের মধ্যে যে-শূন্যতা, তা দুটো গানের সুরে ভরিয়ে তুলবে? তুমি নেহাৎ গর্দ্দভ!

ব্রজনাথের সামনে পেগ্ আগাইয়া দিয়া অবিনাশ কহিল,—একটু মুখে দাও না...

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া ব্রজনাথ কহিল,—মদ খেতে বলচো তুমি?... আমি কি সে আমোদ চাইচি?...

পরক্ষণেই সে হাসিয়া ফেলিল; কহিল,—তুমি আমায় থিয়েটারের নাটকের সেই নায়ক পেলে নাকি! মন খারাপ হয়েচে, অতএব মদ খাও—মনে হাজার বাতির ঝাড় জ্বলে উঠবে? পাগল! নেশা করে মাতাল হয়ে নাচতে হবে, আর সেই নাচ নেচে জীবনে বৈচিত্র্য আনবো!...মাতাল! হুঁঃ, নিজে খাচ্ছ, খাও। ও লোভ আমায় দেখিয়ো না। আমার ওতে রুচি তো নেইই, বরং ঘৃণা হয়!

অবিনাশ অপ্রতিভভাবে কহিল,—না, না, তা নয়। তবে এমনি বলছিলুম। এ তো শুধু জিভে একটু ঠেকানো! তাতে নেশা হয় না!... মনটা শ্রান্ত রয়েচে, টনিকের কাজ করতো!

হাসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—টনিকের কোনো প্রয়োজন নেই !...

ব্রজনাথ চুপ করিল। অবিনাশ পেগটা নিঃশেষ করিয়া একবার ব্রজনাথের পানে চাহিল, পরে কহিল,—তাই তো...তা, ঠিক কি চাও, বল দিকি আমায়। বুঝিয়ে দাও...হাজার হোক, বন্ধু তো—দেখি, তোমায় একটুও আনন্দ দিতে পারি কি না !

ব্রজনাথ কহিল,—নাও, আর ভাবতে হবে না। গেলা হয়েচে তো? চল, একটা ট্যাক্সি নিয়ে একটু ঘোরা যাক মাঠের চতুর্দ্দিকে। দিব্যি জ্যোৎস্না ফুটেচে।

অবিনাশ কহিল,—তা নেহাৎ মন্দ বল নি ! খাওয়া-দাওয়ার পর...

দুইজনে উঠিয়া ট্যাক্সি লইল এবং ট্যাক্সিতে করিয়া নিরুদ্দেশ ভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘড়ির পানে নজর করিতে ব্রজনাথ দেখে, রাত এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ড্রাইভারকে বলিল—চৌরঙ্গী হয়ে আবার গঙ্গার ধারে চলো।

গাড়ী চৌরঙ্গীতে আসিলে পিক্‌চার হাউসের সামনে ব্রজনাথ দেখে, লোকের কি ভিড় ! বায়োস্কোপ ভাঙ্গিয়াছে—প্রমোদ-রত নর-নারীর দল হাস্য-কলরবে চারিদিক উছলিত করিয়া বাহির হইতেছে ! তেমনি দুনিয়া-ভোলা, স্বপ্ন-লোকের জীব সব ! হাসি আর আনন্দ ছাড়া কিছু আর জানে না !

ব্রজনাথ ভাবিল, কি দিলে সে ওদের ঐ অত হাসি-আনন্দের একটি কণা আয়ত্ত করিতে পারে !

অবিনাশকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া ব্রজনাথ আসিয়া নিজের গৃহে নামিল—নামিয়া ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া সোজা দোতলায় উঠিয়া নিজের

ঘরে ঢুকিল। আঁধারে ভরা, বেদনায় জীর্ণ...এ যেন কোন্ পাতালের এক অতল গহ্বর! না আছে এখানে আলো বা বাতাস! নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে!

ভৃত্য আসিয়া সুইচ্ টিপিয়া বিজ্‌লী বাতি জ্বালাইয়া দিলে ব্রজনাথের মনে হইল, ও আলো যেন ঘরের এই দারুণ দীনতার প্রতি অট্টহাসির প্রচণ্ড পাথর ছুড়িয়া মারিল! বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রজনাথ ভৃত্যকে কহিল,—আলো নিবিয়ে চলে যা। আলোর দরকার নেই!

ভৃত্য আলো নিবাইয়া চলিয়া গেলে ব্রজনাথ জানলার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। বাহিরে জ্যোৎস্না তখন সুরের তরঙ্গ তুলিয়া আলোর ধারায় বহিয়া চলিয়াছে!

৪

পথে একটা লোক গান গাহিয়া চলিয়াছিল। এত রাত্রেও পথে গান গাহিয়া লোক চলে...সৌখীন বটে! পথিক কাছে আসিল। তার গানের ছত্রও বেশ স্পষ্ট শুনা গেল। সে গাহিতেছিল,—

কারো পানে তাকাস্ নে কো
কেউ চাবে না তোরি পানে ;
এ জীবন লুটিয়ে দে রে
যেমন-খুশী গন্ধে-গানে!

এ গানের কথায় ব্রজনাথের মন তার ধ্যানের কল্পলোক ছাড়িয়া আবার এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিল। গ্যাসের আলোয় গায়কের পানে নজর পড়িতে সে তাকে চিনিল। গায়ক তারি প্রতিবেশী ; বিনোদলাল। দিলদরিয়া লোক...মল্লিক-বাড়ীতে গানের মজলিসে মাথায় চাদর জড়াইয়া গায়ক ও গায়িকার দলকে বাহবা দিয়া বেড়ায়! সেবার বাড়ীতে তার ছেলের অসুখ, আর কথা নাই, বার্ত্তা নাই, সোজা সে এক থিয়েটার কোম্পানির সঙ্গে মেদিনীপুর চলিয়া গেল। তাই কি পয়সা পাইবে? মোটে না! তাদের দলে থাকিয়া দুটা খোশ্ গল্প করিয়া অভিনয়ের সময় কখনো বাহিরে বসিয়া দুটা হাততালি দিয়া নয়তো রান্নার ব্যাপারে যোগ দিয়া বিশ্ব-ভুবনের সব খপর ভুলিয়া থাকিবে! স্ত্রী তার জ্বালায় দিবারাত্র জ্বলিয়া খুন! রাত এগারোটার

সময় চার-পাঁচ জন মদিরা-বিহ্বল বন্ধু ও সেই সঙ্গে সেরটাক পাঁটার রান্ আনিয়া স্ত্রীর সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া বলিল,—এখনি রেঁধে দাও। এরা খাবে বলে ধরেচে! স্ত্রীর তো চক্ষুস্থির! অথচ রান্না চাই, নহিলে গৃহে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে!

এ-পাড়ায় বিনোদের বহুদিন বাস। ব্রজনাথের চেয়ে বয়সে সে ঢের বড়! কতদিন অমন কত অভিযোগ লইয়া বিনোদের স্ত্রী ব্রজনাথের মার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছে, ছেলেমেয়েগুলো না খাইয়া পড়িয়া আছে, স্বামীর দেখা নাই! সে আজ তিনদিন ডায়মণ্ড হারবারের ওদিকে দত্ত-বাড়ীর মেজ বাবুর সঙ্গে মাছ ধরিতে চলিয়া গিয়াছে, ঘরে এক পয়সার সংস্থান রাখিয়া যায় নাই!

বিনোদ দায়িত্বের কোনো ধার ধারে না, অথচ তার দিন এক-রকমে চলিয়া যাইতেছে! বেশ খোশ খেয়ালেই জীবনটাকে সে কাটাইয়া চলিয়াছে!

ব্রজনাথ চাহিয়া দেখে, বিনোদের হাতে শালপাতায় ঢাকা ছোট একটি মাটীর ভাঁড়। দোকান হইতে নিশ্চয় রান্না মাংস লইয়া চলিয়াছে—মৌতাতের মুখে রুচিবে ভালো!

বিনোদ গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। ব্রজনাথ তার পানে দুই চোখের সুগভীর দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল। গায়ক চোখের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল...তার গানের রেশ ব্রজনাথের দুই কা... বাজিতে লাগিল—

এ জীবন লুটিয়ে দে রে
যেমন-খুশী গন্ধে গানে!

ঠিক! যেখানে ভাবনা-চিন্তা, অপরের মুখ চাওয়া...সেইখানেই প্রতিপদে বাধা আর বিপত্তি! কেন যে সাধ করিয়া অপরের মুখ চাওয়া! তার চেয়ে যারা ঐ বিনোদের মত অমনি নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, পরের মুখ চায় না, পরের নিন্দা-স্তুতির কোনো ধার ধারে না, জীবনটাকে তারা কি প্রচণ্ডভাবেই না উপভোগ করিয়া বেড়ায়! অর্থকষ্ট? বিনোদের তা খুব আছে! অথচ একটি দিনের জন্যও তার মুখ মলিন দেখিয়াছে বলিয়া ব্রজনাথের মনে পড়ে না! গৃহে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা? থাকুক বা না থাকুক, তার তাহাতে কি আসিয়া গিয়াছে! ছেলে-মেয়ের শৃঙ্খল? তাও কোনদিন আঁটিয়া চাপিয়া তার জীবনকে কোনো দিকেই বাঁধিয়া ধরিতে পারে নাই!...

আর সে?...যখনি গৃহে অশান্তি উঠিয়াছে, কলরব উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি নিজের বুক দিয়া অমনি তার উপর পড়িয়া সেগুলাকে চাপা দিতে গিয়াছে! হায়রে, আগুন কি চাপা পড়ে? ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গগুলায় বুক দিয়া পড়ায় বুকটাই জ্বলিয়া একশা হইয়াছে, সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ সে নিবাইতেও পারে নাই। সেই স্ফুলিঙ্গগুলাই শেষে একদিন প্রবল তেজে জ্বলিয়া তার জীবনকে কি ভস্মস্তূপেই না পরিণত করিয়াছে! লোকের চোখে পাছে এই গৃহ-কলহ ধরা পড়িয়া যায়, সেই ভয়ে বেদনায় জর্জ্জর হইয়া গেলেও হাসি-মুখে সে সকলের সামনে দাঁড়াইয়া আসিয়াছে,—চিরকাল! তাহাতে কোনো দিকই তো রক্ষা পাইল না!

কাজ কি তবে এই লোকাচার, আর সামাজিক রীতি-নীতির আড়ালে বসিয়া এমনভাবে আপনাকে দগ্ধ করিয়া প্রাণে মারা! সব

বন্ধন সে এবার কাটিয়া দিবে—কারো মুখের পানে চাহিবে না। প্রাণ যে যায়! যে-পিপাসায় কণ্ঠ তার শুষ্ক, আকুল হইয়াছে, সে পিপাসা সে মিটাইবে, এবার...যেমন করিয়া, যে-ভাবে, যা দিয়া পারে......

বিনোদের মত অমন নিস্পরোয়া না হোক—উপায়ও তা বলিয়া এমন দুর্লভ নয়!

অবিনাশের কথা মনে পড়িল। জীবনটাকে উপভোগ্য করার সম্বন্ধে সে যে উপদেশ দিল, তা কি এমনি উড়াইয়া দিবার মত? দেখাই যাক্ না! তার মত বহু লোক তো ও পথের পথিক হইয়া আনন্দ পাইয়াছে—এমন আনন্দ, যা তাদের মত্ত মশ্‌গুল করিয়া দিয়াছে! ভূতনাথ, পঞ্চানন, সতীশ, সত্য...এরা কি কোন আনন্দ পায় নাই? যদি না পাইবে, তবে ও-পথে ঘুরিয়া মরিবে কিসের জন্য!...অবুকেই সে অবলম্বন করিবে...নানা দুঃখ-চিন্তার মধ্যে থাকিয়াও তো প্রাণ তার এতখানি কাহিল হয় নাই! ব্রজনাথের জীবনটাকেই যে একান্ত ভার বলিয়া মনে হইতেছে! বুকের উপর অষ্টপ্রহর যেন জগদ্দল পাথর চাপানো! নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল! এ-ভাবে আর একটা দিনও কাটানো সম্ভব নয়!...

জানলার ধার ছাড়িয়া ব্রজনাথ আসিয়া শয্যায় বসিল। কিছু নাই, তার কেহ নাই! নীচে একটা চাকর সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল। এত রাত্রে সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে কোথায় ঐ বইখানার কয়েকটা ছেঁড়া পাতায় আরাম পাইয়া বাঁচিয়াছে! ও-ও সুখী! ব্রজনাথ যদি ব্রজনাথ না হইয়া ঐ দাণ্ড ভৃত্য হইত—তাহা হইলে এ জ্বালা বুকে লইয়া তাকে এমন অস্থির আকুল হইতে হইত না! এই ঘর, এই আসবাব-পত্র, অর্থ, দাস-দাসী,...কি এর দাম, যদি তারা এতটুকু আরামও

না দিতে পারে? কিছুই নয়! এ নিঃসঙ্গতা ঘুচাইতে পারিলে সে যে এ-সব ত্যাগ করিতে পারে!

শয্যায় দেহ-ভার লুটাইয়া দিয়া ব্রজনাথ আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। বাহিরে ভরপুর জ্যোৎস্না! সে যেন ছবির পটে আঁকা শুভ্র রঙের একটা আঁচড় মাত্র—তাহাতে প্রাণ গলে না, মনও টলে না!

সকালে অবুর কাছে দাশু গিয়া হাজির,—বাবু ডাকিতেছেন। অবু কহিল—চা খেয়ে যাচ্ছি। বল্‌গে...

ব্রজনাথ বাহিরের ঘরে বসিয়া খপরের কাগজখানা লইয়া তার উপর চোখ বুলাইতেছিল। দাশু আসিয়া অবুর কথা বলিল। ব্রজনাথ কহিল,—তুই বললি না কেন যে ভারী দরকার? এখানে এসেই নয় চা খেতো।

দাশু এ-কথার কি জবাব দিবে, ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজনাথ বিরক্ত চিত্তে খপরের কাগজে মন দিবার চেষ্টা করিল।

বাজনা-ওয়ালা এস্ দাসের লোক আসিয়া অর্গিনটা টিউন করিতে বসিয়া গেল। মাসে একবার করিয়া সে আসিয়া অর্গিন টিউন করিয়া দিয়া যায়। বাঁধা বরাদ্দ। আজ তার সেই নির্দ্দিষ্ট দিন। সে একটা ভৈরবী গৎ ধরিল। ব্রজনাথ কাগজ রাখিয়া তার পানে চাহিয়া রহিল—কি হাল্‌কা মন লইয়া ভোর হইতেই লোকটা নিজের কাজে লাগিয়া গিয়াছে! কেন লাগিবে না? তাকে তো মর্ম্মদাহ লইয়া বিনিদ্র রাত্রি কাটাইতে হয় নাই, তার মত!...দুনিয়ায় সকলেই সুখী! লঘু মনে সকলে নিজের কাজ করিয়া চলিয়াছে। স্ত্রীর সঙ্গে কলহ হয়, তবে সে

বাদ-বিসম্বাদ এমন নৃশংস নির্ম্মম মূর্ত্তি লইয়া কাহারো প্রাণে আতঙ্ক বা বিভীষিকার সৃষ্টি করে না! স্ত্রী...? আঃ, একটা পৈশাচিক প্রতিহিংসা যদি লওয়া যাইত—এমন প্রতিহিংসা, যাতে করিয়া সেই অপ্রিয়বাদিনী, প্রাণহীনা পাষাণী নারীর অস্থি-মজ্জা অবধি জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দেওয়া যায়...

বাজনা থামাইয়া টিউনার কহিল,—একটা ভালো পিয়ানো বিক্রী আছে, নেবেন?

ব্রজনাথ উদাস মনেই জবাব দিল,—না।

টিউনার কহিল,—দাম ভারী শস্তা!...একটা জিনিষের মত জিনিষ! তার পর সে আপনার মনে বকিয়া চলিল—থিয়েটারের হিরণ!...বাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে...ঐ যে সেনেদের বাড়ীর ছোটবাবু! তা হিরণও পিয়ানো বাড়ীতে রাখবে না, বাবুও সে বাজনা নিয়ে যাবে না। হিরণ বলে, যা পাই, বেচে দেবো...

কথাগুলা ব্রজনাথের শ্রুতির মূল স্পর্শ করিল মাত্র। তার পর টিউনার ব্রজনাথের পানে চাহিয়া কহিল,—আপনি বলেছিলেন একবার, যে, একটা ভালো পিয়ানো পেলে নেন! তাই আপনার কথা ভেবেই আমি বলে এসেচি, বেচতে পারবো।...পাঁচশো হলেই হয়। কি বলেন?

ব্রজনাথ কহিল—না, নেবো না।

টিউনার পকেট হইতে নস্যের শিশি বাহির করিয়া এক-টিপ নস্য লইয়া নাকে গুঁজিল, তার পর চলিয়া গেল।

ব্রজনাথ ভাবিল, চারিদিক দিয়া এ কোন্ অজানা লোকের বার্ত্তা থাকিয়া থাকিয়া তার কানে আসিয়া বাজিতেছে! বায়োস্কোপ! সেই

আলো আর রূপের পরীস্থান! তারপর খেয়ালী বিনোদের সেই গানের ছত্র! আর এই কোন্ সেনেদের বাড়ীর কোন্ তরুণ কোন্ হিরণকে ধরিয়া গানের-সুরে কি সুরের পুরীর সৃষ্টি করিতে ছুটিয়াছিল...পিয়ানো, গান, নাচ,...সবগুলা জড়ো হইয়া তার চোখের সামনে কি ইন্দ্রজালের যে সৃষ্টি করিয়া তুলিল!...

অবিনাশ আসিয়া কহিল—ডেকেচো কেন হে? সকালেই এমন জোর তলব...?

ব্রজনাথ কহিল,—এমনি। একা নেহাৎ অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

অবিনাশ কহিল,—কেন, বন্ধুবর্গ...?

ব্রজনাথ কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিল,—সময়ে সকলে সখা, অসময়ে চলে গেছে!

অবিনাশ কহিল,—হঠাৎ এমন অসময় হলো কি করে...? বলিয়া সে চারিদিকে একবার চাহিয়া লইল।

ব্রজনাথ কহিল,—ভালো লাগে না। অর্থাৎ মন যখন বেদনায় ভরে থাকে, তখন তারা কোনো সান্ত্বনা কোনো আশাই গড়ে তুলতে পারে না।

অবিনাশ কহিল,—তাই আমায় ডাকা?...তা আমি কি সাহায্য করতে পারি, বল?...

ব্রজনাথ একটু কুণ্ঠিত হইল। কি সাহায্য!...এ-কথার উত্তরে কি বলিবে, অবিনাশই যে কাল তার ইঙ্গিত দিয়াছে—বেকুব, গর্দ্দভ! . .

সে চুপ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

অবিনাশও হতভম্বের মত বসিয়া! ব্রজনাথ তখন কাশিয়া গলাটা সাফ করিয়া বলিল—অর্থাৎ, তোমায় তাহলে আগাগোড়া আমার দুঃখের কথা বলতে হয়! শুনলে বুঝবে, আমার মত দুঃখী আর নেই, ভাই!...

ব্রজনাথ তখন নিজের মনের বেদনার ইতিহাস খুলিয়া বলিল। তরুণ জীবনে স্বপ্নের অরুণ-রাগ যখন জাগিয়া ওঠে, মন যখন তরুণীর প্রসন্ন দৃষ্টি, প্রেমের বাণী, রূপের আবেশ পাইবার জন্য আকুল অধীর হইয়া ওঠে...আশা আর আনন্দের রাগিণী যখন নিমেষের জন্য স্তব্ধ হইতে জানে না,...তখন হইতেই কি আঘাতে জর্জ্জর হইয়া, নৈরাশ্যের কি আঁধার কূপেই না তাকে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে! কি অসীম ধৈর্য্য লইয়া এ আঁধারের সঙ্গে সে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে, যুদ্ধ করিয়া কি-ভাবেই না ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহারি অশ্রুময় করুণ কাহিনী! বলিতে বলিতে ক্ষণে-ক্ষণে স্বর তার বাষ্পরুদ্ধ, দুই চোখ আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল...তারপর নিতান্ত নির্ম্মমভাবে সেই স্ত্রী তাকে রূঢ় আঘাত দিয়া চলিয়া গিয়াছে! ব্রজনাথ কি তাকে ভালোবাসিত? না! পাছে সহস্র দৃষ্টির সাম্‌নে আপনার জীবনের ব্যর্থতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়েই ব্রজনাথ গুম্ হইয়া থাকিত, সে বেদনাকে সবলে চাপা দিয়া মুখে হাসি ফুটাইত! সে স্ত্রীকে ভালোবাসা যায় না! কোনো মানুষ তেমন স্ত্রীকে ভালোবাসিতে পারে না! যাই হোক, তা বলিয়া এই বয়সেই তার জীবনের সমস্ত আশা কি সে বিলুপ্ত করিয়া দিবে?...অমন লক্ষীছাড়া স্ত্রীর জন্য...!

অবিনাশ কহিল,—এ কথা তো কাল তুমি বলেচো...

ব্রজনাথ কহিল,—হ্যাঁ, বলেচি। কিন্তু তুমিও কাল বলেচো, তুমি আমার বন্ধু...তা, এখন বন্ধুর কাজ কর। আমায় সঙ্গ দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে বাঁচাও ভাই...এ নিঃসঙ্গতা আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

অবিনাশ কহিল,—বেশ, চল, আজ বায়োস্কোপে যাই—তুমি তো চিরদিন বায়োস্কোপ দেখতে ভালোও বাসো।

ব্রজনাথ কহিল,—তা বাসি! কিন্তু বায়োস্কোপ দেখে মন আমার আরো অধীর হয়ে ওঠে! ছবির পর্দায় ঐ যে আনন্দের জীবন দেখতে পাই, ও জীবন কি একান্ত দুর্ল্লভ...?

অবিনাশ কহিল,—দাঁড়াও ভাই, তুমি ভাবুক লোক! অর্থাৎ একটু ভাবতে দাও আমায়...

অবিনাশ ভাবিতে লাগিল; ব্রজনাথ তার পানে চাহিয়া রহিল,... হঠাৎ একটা কথা ব্রজনাথের মনে হইল। সে বলিল,—ভাখো অবু, অনেক সময় কি মনে হয়, জানো? ঐ যখন বায়োস্কোপের ছবি দেখি, কি কোনো উপন্যাস পড়ি, তখন সেই-সবের মধ্যে যে-সব প্রাণীর পরিচয় পাই, সুখ-দুঃখের যে-দোলায় তাদের মন দুলে ওঠে, সে-সবের মধ্যে আমি কেমন বিহ্বল আত্মহারা হয়ে পড়ি! যত দুঃখই তারা পাক—প্রেমের গভীর নৈরাশ্যই হোক, বা অন্য যে কোনো বেদনাই হোক, তার মধ্যে মন আমার ডুবে ভারাক্রান্ত হলেও, তাদের চারিদিকে কোথা থেকে আশার আলোও যেন ঝরতে থাকে! আর আমাদের এই সত্যিকার জীবনগুলো? নেহাৎ বিশ্রী, আশাহীন, সান্ত্বনা-হীন...আশার এতটুকু ইঙ্গিতও কোনোদিকে দেখতে পাই না। ওদের মতই যদি

অমন হাল্‌কাভাবে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে পারতুম! ব্রজনাথ থামিল, পরে কহিল,—চিরদিন আমি ঐ কল্পনা-রাজ্যের প্রাণীদের সঙ্গে এতখানি মিশে যাই যে, সেই রাজ্যেই শুধু যা-কিছু আরাম আমার!...

হাসিয়া অবিনাশ কহিল,—এ যে ভাবুকের কথা হলো, ভাই। জানি, চিরদিন তুমি ভাব-রাজ্যের পথিক......

ব্রজনাথ কহিল,—না, তামাসা নয়। প্রাণের কথা বলছিলুম...

অবিনাশ কহিল,—বেশ, তা হলে চলো নয় বায়োস্কোপে...কথাটা বলিয়া ব্রজনাথের পানে সে চাহিল।

ব্রজনাথ কোন জবাব দিল না। তখন অবিনাশ ভ্রূটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—ভালো কথা...আজ তো শনিবার...চলো না, খানিক থিয়েটারে যাই। ওরা একটা নতুন বই প্লে করচে—মোহিনী। নাচ-গানের ফোয়ারা খুলে দেবে একেবারে—বিজ্ঞাপনে লিখেচে! কাতারে-কাতারে লোক চলেছে।

ব্রজনাথ কহিল,—বাংলা থিয়েটার? রামচন্দ্র! অভিনয় কাকে বলে, ওরা তা জানেও না। কোনোদিনই আমার ভালো লাগে না ওই জন্যে! মনে হয়, সেই চড়কের সাজা সং দেখতে এসেচি।

অবিনাশ কহিল,—না, না, এখন ভালো হয়েচে বাংলা থিয়েটার। পাশ-করা কজন ছোকরা থিয়েটারে ঢুকেচে না? তাছাড়া এ্যাক্‌ট্রেসও যা জোগাড় করেচে...একেবারে বহুৎ সেরা!

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ, চলো। দুটো শীট্ তুমি রিজার্ভ করে এসো। টাকা দিচ্ছি।...কত দিতে হবে?

অবিনাশ কহিল,—পাঁচ টাকার শীট তো নেবে !...তা হলে-হলো ছুটো শীটে দশ টাকা। আজকাল আগাম শীট রিজার্ভ হয় টাকা দিলে !

ব্রজনাথ কহিল,—রিজার্ভ করেই রেখো।...

ব্রজনাথ উঠিয়া দশ টাকার নোট আনিয়া অবিনাশের হাতে দিল, দিয়া কহিল,—কটায় যেতে হবে ?

অবিনাশ উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—ঠিক সাড়ে সাতটায় পৌঁছুনো চাই। আমি সাতটায় আসবো...বুঝলে ?

ব্রজনাথ কহিল,—আচ্ছা।

৫

থিয়েটারের দ্বারে ভারী ভিড়। লোক ঠেলিয়া পথ করিয়া চলিতে হয়। ব্রজনাথকে লইয়া গিয়া পাঁচ টাকার একটা শীটে বসাইয়া অবিনাশ কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল! ব্রজনাথ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—স্মিত মুখের যেন হাট বসিয়াছে! এসেন্সের গন্ধে নাট্যগৃহ ভরপুর! সামনে প্রকাণ্ড পর্দ্দা—তাহাতে নানা ব্যবসায়ী প্রখর বচন-বিন্যাসে সাধারণের ধাঁধা লাগাইয়া দিবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে বিরাট পাল্লা দিতেছে! হাস্যোচ্ছ্বাসে কল-কোলাহলে নাট্যগৃহ মুখরিত। সামনে ষ্টেজের সামনে নীচু ঘেরা-জায়গায় বেয়ালা বাঁশী প্রভৃতি যন্ত্রগুলায় ক'জনে মিলিয়া সুরের ভীষণ কসরৎ লাগাইয়া দিয়াছে! সেদিকে দর্শকদের কাহারো লক্ষ্য নাই—সকলে নিজেকে লইয়াই মত্ত! যারা সঙ্গীহীন, তারা বসিয়া কেহ গোঁফ চুমরাইতেছে, কেহ ঊর্দ্ধে চোখ তুলিয়া বক্সগুলার পানে এমনভাবে তাকাইয়া আছে, যেন জন্মে তারা কখনো অমন নর-নারী চক্ষে দেখে নাই! বক্সে সজ্জিত সৌখীন নর-নারীর দল......

ব্রজনাথ ভাবিল, ভাগ্যে এই আনন্দ-নিকেতনগুলা আছে! এই থিয়েটার, ঐ সিনেমা হাউস...কল্পলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে যেখানে মিলন হয়!...নহিলে বাহিরে কেবলি দুঃখ-ধান্দার ঘা খাইয়া খাইয়া লোকগুলা কোন্ দিন বুঝি বা ক্ষেপিয়াই মারা যাইত!

হঠাৎ পিছনকার এক দর্শকের স্বর তার কানে গেল। সে তার পাশের সঙ্গীকে বলিতেছিল—আজ যে মোহিনী সাজচে, তার গান শুনে মশগুল হয়ে যাবে। সে কত মাহিনা পায়, জানো?

সঙ্গী কহিল,—না।

—চারশো টাকা! এমন গান কখনো শোনোনি!

—বটে!

ব্রজনাথ আরাম পাইয়া ভাবিল, তবু ভালো! দুটা ভালো গান শুনিতে পাইবে। তার পর তার হুঁশ হইল, অবিনাশ...অবু কোথায় গেল?

কন্সার্টের দল তখন অস্তর্টানে বাজাইতেছে! বাজিয়েরা সব হাতে মুখে যেন মুহূর্ত্তে অসুরের বল পাইয়াছে! যে বেহালা বাজায় তার বিক্রমে বেহালায় যেমন আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে, বাঁশীওয়ালার মুখের ফুঁয়ে বাঁশীরও তেমনি দশা! ব্রজনাথ ভাবিল, গোড়াতেই যা নমুনা দেখা যাইতেছে, তার উপর যদি নির্ভর করিতে হয়...

হঠাৎ অবিনাশ দু'হাতের দুই মুঠায় একরাশ পানের দোনা ভরিয় লইয়া শশব্যস্তে আসিয়া পাশে বসিল, বসিয়া কহিল,—আমার কি দুদণ্ড স্থির হবার জো আছে ছাই, থিয়েটারে এসে! লক্ষ লোকের লক্ষ কথা... তার উপর ম্যানেজার ভিতরে ডেকে পাঠিয়েছিল...

ব্রজনাথ নিরুত্তরে তার পানে চাহিয়া রহিল।

অবিনাশ কহিল,—শীলেদের বাড়ীর গোবর্দ্ধন এসেচে! তারো জো তাগিদ! দুটো বক্স নিয়েচে...আমায় বলে, এখানে এসো! আমি বললুম সঙ্গে একজন বন্ধু আছেন, তাঁকে ফেলে তো আসতে পারি না! ত

বলে, তাঁকে শুদ্ধু নিয়ে এসো...আলাপ করি!...এই অবধি বলিয়া সে একটু চাপা গলায় কহিল,—আলাপ করিয়ে দেবো। খাসা লোক... যাকে বলে, একবারে'মাই ডিয়ার! জীবনটাকে কি করে ভোগ করতে হয়...হ্যাঁ, বেনের পো জানে বটে!

তারপর অবিনাশ আরো কি বলিতে যাইতেছিল,...কিন্তু বলা হইল না। হঠাৎ বাজনার আওয়াজ এমন অকস্মাৎ তার মরণ-ডাক ডাকিয়া থামিয়া গেল যে ব্রজনাথ চমকিয়া সামনের দিকে চাহিতেই দেখিল, থিয়েটারের পর্দা উঠিয়া গেছে। একটা ধূমাচ্ছন্ন দৃশ্যপট চোখে পড়িল। অবু কহিল,—এটা দেবলোক! দেখচো না, দেবতারা বসে আছেন মহা-ভাবিত হয়ে। ওঁদের ভাবনার জন্য দেবলোকের আলো নিবে গেছে...তাই ধোঁয়ায় ভরা! অর্থাৎ ষ্টেজ-ম্যানেজারের আর্টের জ্ঞান দেখচো তো! হুঁ:—কবে তুমি সেই সেকালের বাংলা থিয়েটার দেখেচো, প্রহ্লাদ চরিত্র, না, সতী কি কলঙ্কিনী! তাই থিয়েটারের নিন্দে কর! এখন একবার ছাখো দিকি...এখন খালি আর্টিষ্টিক ব্যাপার! নয়?

অন্যমনস্কভাবে ব্রজনাথ কহিল,—হ্যাঁ, করেচে বটে মন্দ নয়!

পিছনের গ্যালারি হইতে তুমুল চীৎকার উঠিল—লাইট! লাইট! সঙ্গে সঙ্গে দু'টাকার শীট হইতে তার জবাবও তেমনি আরো তুমুলতর গর্জ্জনে ধ্বনিত হইল—চুপ্, চুপ্, সাইলেন্স!

সে এক বিশ্রী কলরব! দেবতাদের কথাগুলা প্রথমে বুঝা গেল না। কলরব থামিতেই পাঁচ মিনিট লাগিল। যখন একটু থামিল, তখন প্রকাণ্ড বাদামী রঙের কটা-দাড়িওয়ালা এক দেবতা...পরণে টক্‌টকে লাল রঙের শালু—তাঁর কথাই কানে প্রবেশ করিল। নাটকের

দেবতাটি বলিতেছিল,—নিরুপায়ের উপায় শ্রীহরি, অগতির গতি সেই বিপদভঞ্জন নারায়ণ, বৈকুণ্ঠেশ্বর। কমলালয়ে তিনি হয়তো শয়ন করে তন্দ্রালস-চক্ষে আবার কোনো জীব-লোকের কল্পনায় বিভোর হয়ে আছেন, তাঁর কাছে এ বিপদের বার্তা নিবেদন করিগে চল...

এ কথার উত্তরে আর একজন দেবতা...এঁর বপু খুব স্থূল; পরণে কালো প্যারামেটা কাপড় তার গায়ে চক্‌চকে জরির হিজিবিজি কাটা, মাথায় একটা প্রকাণ্ড জরির তাজ, তাজের মাথায় লাল রঙের পালক উড়িতেছে, তার উপর সেই লাল পালকে আলো পড়িয়া রক্তের মত টক্-টক্ করিতেছে! হুঙ্কার তুলিয়া তিনি বলিলেন,—ঐ তো তাঁর দোষ! দেব-লোক এদিকে রসাতলে যায়—আর, ওদিকে তাঁর নূতন জীব-লোকের কল্পনা চলেছে! ঘরের দিকে নজর নেই—পরের জন্য ভেবে আকুল! চলুন, দু'কথা তাঁকে শুনিয়ে দিইগে...

অবু কহিল,—ইনি হলেন অগ্নি। যে অগ্নি সেজেচে, সেই নাট্যকার!

তার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা গৃহে করতালি-ধ্বনি উঠিল। ব্রজনাথের পিছনে একজন দর্শক চাপা গলায় তার সঙ্গীকে বলিল,—সুরেন বাঁড়ুয্যেকে কেমন ঠুকে দিয়েচে, বুঝলে?

সঙ্গীটি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ!

ব্রজনাথের তাক লাগিয়া গেল। এ কথায় সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের সঙ্গে যে কি সম্পর্ক...সে বুঝিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুই বুঝা গেল না। ওদিকে দেবতারা গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেলেন। তার পর আলো নিবিল। ফুঁ করিয়া একটা বংশীধ্বনি এবং ঘড় ঘড় শব্দে দু'দিক হইতে দু'খানা তক্তা আসিয়া মিশিয়া গেল। আবার আলো জ্বলিল। ব্রজনাথ

চাহিয়া দেখে, পাহাড় আঁকা একটা দৃশ্য—পাহাড়ের রং সাদা, তার গায়ে দু'চারিটা অপরূপ গাছ...সে .গাছের কাণ্ড ভরিয়া হরেক রঙের ছোট-বড় অসম্ভব ফুল! ব্রজনাথ কহিল,—এটা কি?

অবিনাশ প্রোগ্রাম দেখিয়া বলিল,—স্বর্গলোকের পথ...

ব্রজনাথ কহিল,—বটে!

তার পর দৃশ্যের পর আরো দৃশ্য চলিল—এবং একটা অঙ্ক ক্রমে শেষ হইয়া গেল। ব্রজনাথ কহিল,—এ কি হচ্ছে হে! এতে প্রাণের সাড়া পাচ্ছি না যে মোটে!

অবু কহিল,—এ যে দেবতাদের কথা নিয়ে লেখা বই, ভাই! অর্থাৎ ভক্তিমূলক অপেরা কি না!...

হাসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—তা বটে!

চারিদিকে আবার তুমুল কলরব চলিয়াছে। কনসার্টের সেই মরণ-কসরৎ, সঙ্গে সঙ্গে পান-চুরুট-সিগারেট হাঁকা, তর্ক,...এমন কোলাহল যে পাশের লোকের কথা শুনা যায় না! তার উপর গ্যালারিতে বিষম কলহ বাধিয়া গেল—চোপরাও, মুখ সামলে থেকো!...কি, মেরে ঠিক করে দেবো!...বাইরে আয়, দেখে নিচ্ছি!...উঃ, ভারী ভদ্দর লোক এসেচেন! ইত্যাদি। কৌতূহলী অপর দর্শকের দল হাসি-মুখে এই তাণ্ডব রঙ্গাভিনয় দেখিতে লাগিল। দেবলোকে অসুরের উৎপীড়নে পীড়িত দেবতার দল...তাদের বিপদ মুহূর্ত্ত-মধ্যে এরা সব ভুলিয়া গিয়াছে! হঠাৎ আবার এক সময় কনসার্ট থামিয়া পর্দ্দা উঠিল।

অনন্ত-নাগের শয্যায় নারায়ণ পদ্মের পাপড়ির উপর শুইয়া আছেন। পদতলে লক্ষ্মী! দৃশ্যপটের পরিকল্পনা মন্দ নয়! দর্শকের দলে তারিফের

করতালি-ধ্বনি উঠিল। নারায়ণ লক্ষ্মীকে কি বলিতেছিলেন, শুনা গেল না। তারপর এক দণ্ডধারিণী আসিয়া সম্বাদ দিল, দেবতারা আসিয়াছেন। নারায়ণ কহিলেন,—নিয়ে এসো! দেবতারা আসিলেন। নারায়ণকে তাঁরা বিপদের কথা বলিলেন। অগ্নির কি ভীষণ মূর্ত্তি! নারায়ণ তাঁদের আশ্বাস দিয়া লক্ষ্মীকে কহিলেন,—লক্ষ্মী, এ-বিপদে তোমার সাহায্য চাই। দেবতাদের রক্ষা কর। দুজনে মায়া রচনা করি, এসো—

লক্ষ্মী বলিলেন,—তাই হবে, নাথ...

যেমন এই কথা বলা, অমনি ষ্টেজের আলো নিবিয়া গেল এবং একটা প্রচণ্ড শব্দ হইল। তারপর আলো জ্বলিতে দেখা গেল—লক্ষ্মী অন্তর্হিত এবং নারায়ণ উঠিয়া বসিয়াছেন! বসিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে কথা সুরু করিয়াছেন—

এস এস বসন্ত-সুষমা—
ফাগুনের যত মধুরিমা,
এস কাম, এস পুষ্পধনু,
আনো মোহ, কুসুম-সুরভি,
চুম্বনের মদির পরশ,
ভ্রূবিলাস, কাজল-নয়ন...

দীর্ঘ কথা! কথাগুলা শেষ হইলে ষ্টেজের আলো নীল হইল এবং উপর হইতে সাদা জর্জ্জেট কাপড়ে আবৃতদেহা এক তরুণী নারীমূর্ত্তিকে ষ্টেজের মাঝামাঝি ঝুলাইয়া দেওয়া হইল! তার কণ্ঠে গান! অধীর

দুর্দান্ত দর্শকের দলও সে-গানে স্তব্ধ হইয়া গেল। খুলন্ত তরুণী গাহিতেছিল—

আমি স্বপন-বাহিনী, স্বপন-বিহারিণী—
মনের গহনে গোপনে চলি গো,
সব-জন-মন-হারিণী...

গানের কথা যাই হোক, গায়িকার কণ্ঠের সুরে কেমন যেন মোহ ছিল! ব্রজনাথের মনও সে সুরে মুগ্ধ বিহ্বল হইয়া উঠিল। গানের কলির সঙ্গে সঙ্গে গায়িকাও ষ্টেজে একটু একটু করিয়া নামিতেছিল... শেষে একেবারে ষ্টেজে নামিয়া দাঁড়াইল। তার মুখের কমনীয় শ্রী, চোখের দীপ্তি, সুরের লালিত্য...এ-সব দেখিয়া ব্রজনাথের মনে হইল, সে আর নাট্যগৃহে বসিয়া নাই! এ কোন্ স্বপ্নচারিণী সত্যই যেন মন হরণ করিবার মানসে মনের কোন্ গহন গোপন হইতে শরীরিণী-মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূতা হইয়াছে! তরুণী গায়িকা গাহিতেছিল,—

নিরাশে যে-জন বিজনে বসিয়া আছে,
বেদনায় শ্বাসে মরু দ্যাখে আগে-পাছে—
বুকে নিই তারে,—
মায়াময়ী মোহ-কামিনী।

ব্রজনাথ গায়িকার এ-কথায় কোন্ সে ইন্দ্রজালে-ঘেরা মায়া-লোকে উধাও হইয়া গেল! বুক তার এমন দোলায় দুলিয়া উঠিল যে সে ভুলিয়া গেল, এটা থিয়েটার-গৃহ, সে পাঁচ টাকার শীটে বসিয়া একখানা অতি-সাধারণ বইয়ের অভিনয় দেখিতেছে! মনে হইল, ছুটিয়া গিয়া ঐ নায়িকার চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িয়া সে বলে, ওগো,...বিজনে বসিয়া

আমি বেদনায় জ্বলিয়া মরিতেছি! আমি, আমি...আমার আগে-পিছে কেবলি ধূ-ধূ মরু! ওগো মায়াময়ী, তোমার কোমল করের পরশে আমার এ নৈরাশ্য মুছিয়া দাও, মুছিয়া দাও, মুছিয়া দাও...'

তার এ স্বপ্ন আবার নিমেষে তখনি ভাঙ্গিয়া গেল। নায়িকার গান তখন থামিয়া গিয়াছে। নারায়ণের সঙ্গে তার কথা চলিয়াছে। নারায়ণ তাকে বলিতেছেন,—তুমি আমার দেহে বিলীন হয়ে যাও, মোহিনী। তোমার ঐ রূপ-যৌবন, ঐ মোহ-মায়া, সব দিয়ে আমায় সাজিয়ে তোলো! আমি যেন জগতের চিত্ত-জয়ে সক্ষম হই, সে-রূপে বিভ্রম জাগিয়ে...

গায়িকা কহিল,—তাই হোক! তারপর আবার অন্ধকার! আলো জ্বলিলে দেখা গেল—নারায়ণ নাই, সেই গায়িকা অনন্ত-নাগের মাথার উপর দাঁড়াইয়া, শঙ্খ-চক্র পায়ের কাছে পড়িয়া আছে! নেপথ্য-লোক হইতে দৈববাণী হইল,—তুমি মোহিনী, ত্রিদিব-মোহিনী, চতুর্দ্দশ লোক জয় কর!

গায়িকার মুখ উছলিত হইয়া উঠিল। সে কহিল,—আমি মোহিনী! এসো বিশ্ব, আজ আমার সামনে দাঁড়াও! আমার এই রূপের পায়ে তোমায় লুণ্ঠিত করো, মূর্চ্ছিত করো! বলিয়া গায়িকা আবার গান ধরিল।

অবিনাশ ব্রজনাথকে মৃদু ধাক্কা দিয়া কহিল,—কেমন শুনচো?

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ! বলিয়া উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতে লাগিল।

কানের কাছে মৃদু গুঞ্জনে অবিনাশ কহিল,—এর নাম মনিয়া বিবি! কি গানই গায়! সাধে কি আর চারশো টাকা মাইনে ভ্যায়! তাছাড়া ওর টাকার ভাবনা কি, হুঁঃ!

ব্রজনাথ কহিল,—চুপ কর, গানটা শুনতে দাও—

মোহিনী সাজিয়া মনিয়া-বিবি আর-একটা গান গাহিতেছিল।

এ অঙ্কটা বড়,—গানেরও খুব ধূম। মোহিনীর গান ছাড়া একবার দেববালাদের গান; তারপর যত দেবতার মোহিনীর রূপের স্তব! প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্কের পটক্ষেপ হইল।

যেমন পট পড়িল, অবিনাশও অমনি তীরের মত বাহির হইয়া গেল; পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—এসো না ব্রজ। তুমি যে একেবারে গোপালের মত শীট কামড়ে বসে রইলে হে! একটু নড়ো-চড়ো। একবার ওঠো, গোবর্দ্ধন শীল তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে; ওপরের বক্সে আছে। সঙ্গে আছে নিতাই সাধু, ব্যারিষ্টার। তোমার পছন্দ হবে'খন ওদের দলটিকে—

বসিয়া বসিয়া ব্রজনাথের একঘেয়ে লাগিতেছিল, তাই সে উঠিল; উঠিয়া অবিনাশের সঙ্গে উপরের বক্সে আসিল। অবিনাশ আলাপ করাইয়া দিল। গোবর্দ্ধন নাম হইলে কি হয়, তার চেহারা সুশ্রী, হাতের কয় আঙুলে ক'টা আংটি...ঝক্‌ঝক্ করিতেছে! গোবর্দ্ধন বেশ সৌখীন, মিশুকও। গোবর্দ্ধন কহিল,—আপনাকে প্রায়ই বায়োস্কোপে দেখি—না?

ব্রজনাথ কহিল—আমি 'যাই বটে, প্রায়। ছবির সখ খুবই আছে—বলিয়া সে মৃদু হাসিল।

গোবর্দ্ধন কহিল,—আমিও যাই কিনা, তাই দেখেচি আপনাকে। তা আলাপ হলো, ভালোই হলো! আপনি থিয়েটারে তেমন আসেন না—না?

ব্রজনাথ কহিল—না। এই অবুঝ পাল্লায় পড়ে আজ এসেচি।

গোবর্দ্ধন কহিল,—হ্যাঁ, ওকে এই সব থিয়েটারের দালাল বল্‌লেও চলে। ওর হাত দিয়ে কম শীটটা বিক্রী হয়! এই তো আমার যে বক্স নেওয়া, এ তো—ওরই তাগাদায়! না হলে বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকা এ-ভাবে, আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি।

অবিনাশ কহিল—কিন্তু এই যে গান শুনলেন...

গোবর্দ্ধনের এক সঙ্গী কহিল—অনিয়ার গান! ও তো ঘরের লোক হে...

গোবর্দ্ধন কহিল,—যাক্, আলাপ হলো যখন, তখন একটা কথা রাখবেন কি? কাল আমার বার্থ-ডে। সে জন্যে বাগানে একটা ছোটখাট পার্টির বন্দোবস্ত করছি...আপনার পায়ের ধূলো যদি পড়ে—আশা করতে পারি?

ব্রজনাথ কহিল,—বিলক্ষণ! তা যাবো...কোথায়, ঠিকানা বলুন...

গোবর্দ্ধন কহিল,—দমদমায়, অবু জানে। অবু, তুমি নিয়ে যেয়ো ওঁকে...তোমার উপর ভার রইলো...

অবিনাশ কহিল,—বেশ!

গোবর্দ্ধন কহিল,—এমনি করে জীবনটাকে ভোগ করা, বুঝলেন কি না! জীবন ভারী ক্ষণিক—ঐ না সেই গানটা আছে...তা আমারো তাই! কোনো দায়িত্বের গণ্ডীতে ধরা দিইনি—খোলা আছি। কাজেই খাসা আছি! তা আপনি কাল আমাদের পার্টিতে আসচেন তো? এলে ভারী খুশী হবো।...

অবিনাশ কহিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, ওঁকে নিয়ে যাবার ভার আমার... ঐ কনসার্ট থামলো, ব্রজনাথ...

ব্রজনাথ উঠিতে যাইতেছিল। গোবর্দ্ধন পাশের সঙ্গীকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দিয়া কহিল,—এই চেয়ারেই বসুন না, ব্রজবাবু...আবার কেন নীচে নামবেন! একসঙ্গে বসে দেখা যাবে...

ব্রজনাথ এ কথায় না বলিতে পারিল না। ওদিকে ফস্ করিয়া প্রকাণ্ড পর্দ্দাখানাও উঠিয়া গেল। সে বিনা-প্রতিবাদে গোবর্দ্ধনের পাশের শূন্য চেয়ারখানি অধিকার করিয়া বসিল। ষ্টেজের উপর তখন কৈলাস পর্ব্বত দেখা দিয়াছে। সেই পর্ব্বতের উপর বসিয়া মোটা সোটা মহাদেব, তাঁর পাশে দুটা কিম্ভুতকিমাকার জীব—নন্দী আর ভৃঙ্গী, বুঝি! পার্ব্বতী একধারে বসিয়া ধুতুরা ফুলের মালা গাঁথিতেছেন। নেপথ্যে কে গান ধরিয়া দিয়াছে, আর নীচে অধীর চঞ্চল দর্শকের দল হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতে আসিয়া যে যার আসন গ্রহণ করিতেছে।

৬

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। অবিনাশের সঙ্গে ব্রজনাথ আসিয়া গোবর্দ্ধন শীলের বাগানে ঢুকিল। তাদের নামাইয়া দিয়া মোটর চলিয়া গেল। ব্রজনাথ কহিল,—গাড়ী কখন আন্‌তে বলবো হে অকু?

অবিনাশ কহিল,—গাড়ী আর আন্‌তে বলতে হবে না। কখন ফিরবো, তাতো এখন বলা যায় না! তা এখানে গাড়ীর অভাব হবে না হে...

—বেশ। বলিয়া ব্রজনাথ সোফারের দিকে চাহিল; সোফারকে কহিল,—গাড়ী আর আনতে হবে না। অন্য গাড়ীতে আমি ফিরবো।

সোফার সেলাম করিয়া গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

বাগান-বাড়ীটি দোতলা। ফটকের পরেই ছ'পাশে মেহ্‌দীর বেড়ায় ঘেরা পথ, মালার মত গোল হইয়া দুই প্রান্তে মিশিয়াছে। তারি মাঝখানে পুকুর। পুকুরের দুই দিকে দুটী শাণ-বাঁধানো ঘাট। বাড়ীটি উঁচু ফ্লোরের উপর। চওড়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সামনে মস্ত বারান্দা —বারান্দার তিন দিকে ঘর। বারান্দার এককোণে প্রকাণ্ড বারকোশের উপর একরাশ তরকারী কোটা, তারি পাশে খুব বড় একটা ট্রে। সেই ট্রের উপর স্থূল পিণ্ডাকারে পড়িয়া আছে মেষ-মাংস। দেখিলে গা রী-রী করিয়া ওঠে। মাংসর ট্রের কাছে বসিয়া এক ভদ্রলোক পটোলের বীচি ছাড়াইয়া তার মধ্যে পুর পুরিতেছেন। ব্রজনাথকে দেখিয়া ভদ্রলোকটি কহিলেন,—এই যে, আসুন ব্রজবাবু...

মৃদু হাসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—গোবর্দ্ধন বাবু কোথায় ?

ভদ্রলোকটি কহিলেন—পুকুরে সব নাইতে গেছেন।

ব্রজনাথ ডাকিল,—অবু...

কোথায় অবু! নিমেষে সে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! ব্রজনাথ পিছনে ঘাটের দিকে ফিরিয়া চাহিবামাত্র দেখিল, অবু মহা-উৎসাহে জামা খুলিয়া ঘাটের চাতালে-সংলগ্ন রোয়াকের উপর বসিয়া মাথায় তৈল মাখিতেছে। ব্রজনাথ অবাক হইয়া গেল। স্নান করিয়া আসিয়া আবার স্নান করিতে চলিয়াছে! তাও মুহূর্ত্ত স্বর সহিল না! ব্রজনাথ ঘাটের দিকে চলিল।

চাতালে আসিয়া ব্রজনাথ দেখে, জলে ক'টা নরমুণ্ড! গোবর্দ্ধন শীল তাকে দেখিয়া কহিল,—আসুন ব্রজবাবু...নমস্কার। বড্ড দেরী করেচেন মোদ্দা। আমাদের একপর্ব্ব শেষ হয়ে গেলে তবে জলে নেমেচি।

ব্রজনাথ কহিল,—স্নান করে এলুম কিনা!...তারপর অবিনাশের দিকে চাহিয়া সে কহিল,—তুমি না স্নান করে এসেচো! আবার চলেছো এরি মধ্যে স্নান করতে...

অবিনাশ কহিল—Pleasant company দেখে...

তখন ব্রজনাথ জলের দিকে চাহিয়া দেখে এক, দুই, তিন, চার... সবশুদ্ধ সাতজন জলে নামিয়াছে। তার মধ্যে...এ কি, তিন জন নারী...!

ব্রজনাথের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! বাগান-পার্টির সঙ্গে তার কোনো পরিচয় ছিল না—আজ এই প্রথম! তবে সে শুনিয়াছে যে বাগান-পার্টিতে নারী একটি অতি-প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য অঙ্গ..

তা বলিয়া এমন! সে ভাবিত, বাগানে নারীর উপর ভার শুধু গানের সুর আর হাসি-গল্পে গাঁথা মালা বিলাইবার! এমন অন্তরঙ্গভাবে নারীও বাগান-পার্টির আমোদে মাতে, এ জ্ঞান তার ছিল না। থাকিলে...কে জানে, সে এখানে এমন সহসা আসিতে রাজী হইত কি না! তবে আসিয়াই যখন পড়িয়াছে,...তখন হুম্ করিয়া চলিয়া যাওয়াও তো পারে না! খারাপ দেখাইবে।

গোবর্দ্ধন শীল কহিল—আসুন না ব্রজবাবু, পুকুরে স্নান করবেন...

ব্রজনাথ কহিল,—আজ্ঞে, আমি স্নান করে এসেচি!

গোবর্দ্ধন শীল কহিল,—তাহলে আমাদের স্নান করা দেখুন,... একখানা চেয়ার এনে দিক। ঘাটেই বসুন।

অবু জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। গোবর্দ্ধন কহিল,—ওহে অবু, চাকরদের কাউকে ডেকে বলো, একখানা চেয়ার এনে দিক, ব্রজবাবু বসবেন।

অবু ফিরিল, চাতালে উঠিয়া হাঁকিল,—ওরে ভোলা,...

ভোলা গোবর্দ্ধন শীলের খাস্ ভৃত্য। বাগানের কাজে তার দক্ষতা অপরিসীম। কাজেই বাবুদের বাগান-পার্টি হইলে তাকে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাগানে আসিতেই হয়।

কোন্ নেপথ্যান্তরাল হইতে ভোলা কহিল—যাই বাবু।

অবু কহিল—ভেতর থেকে একখানা চেয়ার আন্ রে ঘাটে...

নেপথ্য হইতেই জবাব আসিল—নিয়ে যাচ্ছি।

ব্যস্! অবুর কর্ত্তব্য ফুরাইল। সে তিন-চার ধাপ উপর হইতে ঝাঁপ খাইয়া জলে পড়িল এবং সাঁতরাইয়া জল তোলপাড় করিয়া

একেবারে বহু দূরে ভাসিয়া গেল। নিমেষ-পূর্ব্বে যে জল শান্ত ধীর ছিল, সে জল প্রচণ্ড চাঞ্চল্যে একেবারে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

নারীর দলে একজন কহিল,—দাঁড়াও ভাই অবু বাবু...আমিও সাঁতার কাটবো...

অবু তখনো সাঁতরাইয়া চলিয়াছে। সে কহিল,—এসো...

একজন নারী সাঁতরাইয়া চলিল, অবুর দিকে। গোবর্দ্ধন কহিল,—পারবে, না...কেউ সঙ্গে যাবে?

পার্শ্বচর-দলের মধ্য হইতে মাণিক কহিল,—আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। চলো, মজলিস বিবি...

মজলিস বিবি কহিল,—সেই রকম সার্কাশ করবো কিন্তু ভাই মাণিকবাবু...

মাণিক কহিল,—বহুৎ আচ্ছা!

ব্রজনাথ ভাবিতেছিল, এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম! নারী ও পুরুষের মধ্যে যে শীলতার পর্দ্দা, যে আব্রু থাকা প্রয়োজন, সে পর্দ্দা, সে আব্রু এরা কেহই তো মানিবে না! ইহার পর না জানি... জলের বুকে নর-নারীর আনন্দ-লীলা...বায়োস্কোপের পর্দ্দায় তার ছবি সে দেখিয়াছে...সে কি সুন্দর···আর এ...! আগাগোড়া ব্যাপারটা তার কাছে এমন বিশ্রী, কদর্য্য ঠেকিল! এই সব নারীগুলাকে কি অসীম স্পর্দ্ধা-দানে এ'রা এমন মাথায় তুলিতেছে...

মাথায় সত্যই তুলিল। ও-পারের কাছে গিয়া মাণিক বই লইয়া দাঁড়াইল। আর মজলিস বিবি...তার পরণে সাঁতারের বিলাতী পোষাক, একটা লাল রঙের ফ্রক...সে মাণিকের কোমর বহিয়া মাণিকের

উত্তোলিত দুই হাত ধরিয়া তার কাঁধের উপর দাঁড়াইল—গোবর্দ্ধন তারিফ করিয়া করতালি দিল। পরক্ষণে মজলিস বিবি মাণিকের হাত ছাড়িয়া কাঁধের উপর সোজা দাঁড়াইল এবং পর-মুহূর্ত্তে ঝপ করিয়া জলে ঝাঁপ দিল। তারপরে ডুব-সাঁতার কাটিয়া আসিয়া ভাসিয়া উঠিল ঠিক গোবর্দ্ধনের সামনে। গোবর্দ্ধন আদর করিয়া দুই বাহুর আলিঙ্গনে তাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

ব্রজনাথের অসহ্য ঠেকিল। নারী তার সকল লজ্জা লোকের সামনে এভাবে বিসর্জ্জন দিয়া এমন আমোদও করিতে পারে! তার দুই পা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু কি বলিয়া এখন এখান হইতে উঠিয়া যায়?

অবু ওদিকে ডাকিল,—ওগো কুমুদ বিবি, তুমি সাঁতার কাটবে অমনি...? দুঃখ থাকে কেন!

লক্ষ্মীছাড়া অবুটাও শেষে...এবং তারি সামনে! ব্রজনাথের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি!

কুমুদ বিবি কহিল—হ্যাঁ ভাই, অবু বাবু, লক্ষ্মীটি, তুমি এদিকে এসো। আমি তো ভালো সাঁতার জানি না—আমার ভারী ভয় করে...

অবু কহিল,—কোনো ভয় নেই! আমরা থাকতে তুমি জলতলে মিলিয়ে যাবে, তাও কখনো হয়!

অবু সাঁতার কাটিয়া এ-পারে আসিল; এবং আসিয়া থই-জলে দাঁড়াইল। কুমুদ বিবি তখন মজলিস বিবির অনুকরণে তেমনি করিয়া অবুর কাঁধে উঠিল এবং উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিল। দিবামাত্র নাকে-মুখে

জল খাইয়া কাশিয়া খুন! ব্রজনাথ ভাবিল, বেশ হইয়াছে, যেমন নির্লজ্জ লক্ষ্মীছাড়া নারী!...

অবু তার মাথায় মৃদু চপেটাঘাত করিল। কুমুদ বিবি প্রকৃতিস্থ হইলে অবু কহিল,—সাঁতারটা ভালো করে শিখে নাও...গোবর্দ্ধন শীলের পুকুর তো তোমাদের জন্য জল হয়ে বুক পেতে পড়ে আছে—তোমাদের নিত্য বুকে নিতে পেলে পুকুরও যে ধন্য হয়ে যাবে, বিবি সাহেব!

অবুর কথায় থিয়েটারী ভঙ্গীতে সকলে বিলক্ষণ আমোদ পাইয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কুমুদ বিবি বেশ সপ্রতিভ ভাবে অবুর হাত ধরিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল, কহিল,—শেখাবে সাঁতার?

অবু কহিল,—আলবৎ!

কুমুদ বিবি কহিল,—বেশ, শুভ কাজে তবে বিলম্ব নয়! বলিয়াই অবুকে ঠেলা দিয়া সে তাঁকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

অবু কহিল,—না, না, এ ভাবে কখনো সাঁতার শেখে! তার চেয়ে জলের উপর আমি হাত বিছিয়ে দি, তুমি আমার এই দুই হাতের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়, একেবারে সোজা লম্বালম্বি...জলের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখো না। হাঁ, হয়েচে,—এবার এসো—কোনো ভয় নেই! া, এমনি—পা ছোড়ো, পা ছোড়ো...অত জোরে নয়,—আস্তে আস্তে... মন...?

ভয় পাইয়া কুমুদ বিবি আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, হাসিয়া কহিল,—না ভাই, ভারী ভয় করে।

ব্রজনাথের পক্ষে আর বসিয়া থাকিয়া এ দৃশ্য দেখা সম্ভব হইল না।

সে উঠিল। অমনি জলের মধ্য হইতে বন্ধুর দল প্রশ্ন তুলিল—উঠলেন যে...

ব্রজনাথ কুণ্ঠিতভাবে কহিল—বড্ড রোদ...ঘরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিই গে।

গোবর্দ্ধন কহিল,—বেশ, সোজা দোতলার হল-ঘরে যান। পাখা খুলে দিয়ে আরাম করুন গে। আমরা এখনো ঘণ্টা দুয়েক জলে থাকবো। আপনি কাঁহাতক ওই রোদে বসে কষ্ট পান!

এখনো দুই ঘণ্টা! থাকো তোমরা ঐ জলে পড়িয়া ঐ কদর্য্য সঙ্গিনীগুলাকে লইয়া! আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রজনাথ সে স্থান হইতে উঠিয়া দোতলায় গেল।

মস্ত ঘর। চমৎকার সাজানো। দেওয়ালে বড় বড় অয়েলপেন্টিং। রুপী রূপসীদের নানা ভঙ্গীর দেহ-লীলা! মেঝেয় মস্ত ফরাস পাতা। তুষারের মত শুভ্র শয্যা, সুদীর্ঘ বিছানো। অসংখ্য তাকিয়া। ব্রজনাথ ঘরের মধ্যে গিয়া ফরাসের উপর গা ঢালিয়া শুইয়া পড়িল। ফ্যান খুলিবার প্রয়োজন ছিল না। উত্তর-দক্ষিণে বড় বড় খড়খড়ি খোলা। দিব্য হাওয়া! ব্রজনাথ শুইয়া পড়িয়া ভাবিতেছিল, সারাদিন ইহাদের সঙ্গে সে কি করিয়া কাটাইবে!...সেই গানটা তার মনে পড়িতেছিল—

......অমিয়-সাগরে সিনান্ করিতে
সকলি গরল ভেল!

কিন্তু যাই হোক—অবুটার সম্বন্ধে যে তার এ ধারণা ছিল না! সেও এমন নির্লজ্জভাবে এদের দলে মিশিতে পারে! কিন্তু অবু যাই করুক, এদের দলে এক কথায় সে আসিয়া ভিড়িল কি বলিয়া? কিসের আশায়? কি প্রলোভনে? এই মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়! কিন্তু তাই বা এখন যায় কি করিয়া! গাড়ী? গাড়ী চলিয়া গিয়াছে? তাহাতে কি! না হয় হাঁটিয়া খানিকটা পাড়ি দিয়া যে কোন উপায়ে পথে একখানা গাড়ী সংগ্রহ হইতে পারে! কিন্তু নিমন্ত্রণ লইয়া সহসা পাশ কাটানো, সেও ঠিক ভদ্রতা-সঙ্গত হইবে না! অসহ্য হইলেও এখানে খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই! থাকিতেই হইবে!

বাহিরে পুকুর হইতে হাসির উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল! নারী ও পুরুষের মিলিত কল-হাস্য! নারীর মুখের হাসি...সে যে কত-দুর্লভ, কি স্বর্গের সামগ্রী! তাতেও এমন বিরূপতা ফুটিতে পারে!

পাশে সহসা নারী-কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠিল,—এই দিনে-দুপুরেই কাহিল হয়ে শুয়ে পড়েচো বন্ধু...

কথাটা শুনিয়া ব্রজনাথ ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, বসিয়া চোখ ফিরাইয়া দেখে, এক সুবেশা তরুণী! তরুণী সুরূপা না হোক্, তার ক্ষীণ দেহে, শ্যামল বর্ণে চমৎকার শ্রী! ব্রজনাথকে দেখিয়া তরুণী অপ্রতিভ হইল, কহিল,—মাপ করবেন। আমি ভেবেছিলুম,—চেনা কেউ, বুঝি...

ব্রজনাথ কাঠ হইয়া রহিল। কি যে বলিবে, তা তার কল্পনারো অগোচর!

তরুণীর হাতে একখানা সচিত্র ইংরাজী পত্রিকা। তরুণী বলিল,—কিছু মনে করবেন না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বলে এধারে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম, এখানে যাঁরা এসেচেন, তাঁরা সবাই আমার পরিচিত!

তরুণীর কথাগুলি মিষ্ট। তার মধ্যে অভদ্র বা ইতর সুরের ভেজাল নাই। ব্রজনাথ কহিল,—তা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন,—যদি অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকে!

তরুণী কহিল,—এই বইখানা নিয়ে ছবি দেখছিলুম—ইংরাজী তো জানি না। মাথামুণ্ডু কিসের ছবি, কিছুই তেমন বুঝচি না। তব দেখতে মন্দ লাগছিল না,...দেখছিলুম। তা, এখানা কিসের ছবি,

তাই...এই অবধি বলিয়া তরুণী বহিখানা ব্রজনাথের দিকে আগাইয়া ধরিল।

ব্রজনাথ বহিখানা হাতে লইয়া দেখে, ছবিখানা টলষ্টয়ের রিসারেক্‌শনের ফিল্‌মের একটা দৃশ্য—কাতুশা আর প্রিন্স মিত্রি। কাতুশাকে প্রিন্স দুই বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। দু'জনের মুখে-চোখে কি আবেশ...মৌনতার মধ্যেও চোখের দৃষ্টিতে প্রাণের কি অজস্র ভালোবাসা না উছলিয়া রহিয়াছে! ব্রজনাথ ছবির অর্থ বলিল। অর্থ শুনিয়া তরুণী কিছুক্ষণ শূন্যপানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—তারপর একটা নিশ্বাস তার বুক ঠেলিয়া ঝড়ের বেগে ফুটিয়া উঠিল। ব্রজনাথ কহিল,—কি ভাবচেন?

তরুণী কহিল,—না, এমন কিছু নয়।

ব্রজনাথ বুঝিল, তরুণীর প্রাণের কোন্ নিভৃত কোণে বেদনার তারে এ ছবি আঘাত করিয়াছে...তার কেমন কৌতূহল হইল। সে কহিল,—তবে যে নিশ্বাস ফেললেন...

তরুণী সহসা ব্রজনাথের পানে চাহিল, কহিল,—ভাবছিলুম,—থিয়েটারে রাজসিংহ প্লে হয় না? তাতে আমি মাঝে-মাঝে দরিয়া সাজি! এ ছবিখানা আগে দেখলে মোবারকের সঙ্গে যে-শীনে দরিয়ার দেখা হয়, সে শীনে এই ভঙ্গীটুকু নকল করে ফুটিয়ে তুলতুম! ছবি দেখে আমার সেই শীন্‌টা মনে পড়ে গেল!...

তরুণী তাহা হইলে থিয়েটারের অভিনেত্রী! ব্রজনাথের চিরদিন এই অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে একটা কৌতূহল আছে—প্রচণ্ড কৌতূহল! তারা যে-শ্রেণীর নারী-সমাজভুক্ত, সে শ্রেণীকে ব্রজনাথ চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া

আসিতেছে! অবজ্ঞার সঙ্গে করুণাও একটুও আছে! তব, এরা এই যে ক্ষণে ক্ষণে হর্ষ-বেদনার বিচিত্র দোলায় প্রাণটাকে দুলাইয়া মুখে, চোখে নানা ভাব ফুটাইয়া তোলে, সেগুলা শুধু দর্শকের প্রাণের উপর দিয়া বাতাসের মত চকিত পরশ বুলাইয়াই চলিয়া যায়, না, এক-একটা কঠিন রেখাও পাত করে? তাছাড়া নৈরাশ্য বা বিষাদের করুণ ভূমিকার অভিনয়ে এরা যে হুবহু সে-ভাবে মশগুল হইয়া যায়, সে কি আগাগোড়াই কৃত্রিম, শুধু তোতাপাখীর মত নাটকের বুলি আর শিক্ষকের শিক্ষা মুখস্থ করিয়া, না, প্রাণে তাদের এ নৈরাশ্য, এ বিষাদ কোনো দিন কঠিন আঘাত দিয়া গিয়াছে, তারি স্মৃতি তাদের অতখানি চকিত করিয়া তোলে? ব্রজনাথ কহিল—আপনি কোন্ থিয়েটারে প্লে করেন?

তরুণী কহিল,—মেট্রোপলিটানে।

ব্রজনাথ কহিল,—কত কাল অভিনয় করচেন?

তরুণী হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তা দশ বছর বয়স থেকে!...

ব্রজনাথ তরুণীকে লক্ষ্য করিল। তারপর হাসিয়া কহিল,—আপনি যে বড় সাঁতার কাটতে পুকুরে নামেন নি!

তরুণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—আমার ও-সব ভালো লাগে না।... তারপর কি ভাবিয়া সে বলিল,—আপনিও তো যাননি!

ব্রজনাথ কহিল,—না, আমারো ও-সব বেহায়াপনা ভালো লাগে না.. তাছাড়া...ব্রজনাথ চুপ করিল।

তরুণী কহিল,—তাছাড়া কি?

ব্রজনাথ কহিল,—বাগান-পার্টির সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়

বাগান-পার্টির মানে এই—এ যদি জানতুম, তাহলে হয়তো এখানে আসতুম না।...

তরুণী কহিল,—এসে তাহলে তো বিপদে পড়েচেন!

ব্রজনাথ কহিল,—তা, পড়েচি বৈ কি!...কিন্তু আমি যেন জানতুম না, তাই এসেচি। আপনি তো জানেন! তবু এসেচেন যে...?

তরুণী কহিল,—কি করবো, বলুন! পেটের দায়ে! দু'পয়সা পাবো, তাই!

ব্রজনাথ কহিল,—প্রাণ যা চায় না, তা করতে হবে পয়সার দায়ে, এ কেমন কথা?

তরুণী কহিল,—উপায় নেই। পয়সা নাহলে বাস করবো কি রকম করে! আর সে পয়সা ঐ থিয়েটারে কাজ করে, আর এমনি পাঁচ রকম করেই তো রোজগার করতে হবে! যতদিন সুযোগ আছে, ততদিন রোজগার—এর পর অসুখে শয্যা নিলে চলবে কি করে? বন্ধুর দল তো ফিরেও চাইবেন না! কাজেই...

কি দুর্ভাগ্য! ব্রজনাথের মন বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তরুণীর পানে সে চাহিয়া রহিল,—যেন তার অন্তরের মানুষটীর সঠিক পরিচয় পাইবে, তাহারি প্রত্যাশায়!

তরুণী কহিল,—আপনাকে তো কখনো এদের দলে আগে দেখিনি...

ব্রজনাথের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এ-দলের সঙ্গে মিশিতে তারো কতখানি বিমুখতা ছিল...সেই কথাটাই কাঁটার মত তার বুকে বিঁধিল!...কিন্তু এই অপ্রতিভ ভাব সামলাইয়া লইয়া পরক্ষণেই ব্রজনাথ কহিল,—না, বললুম তো, আমি বাগান-পার্টিতে কখনো আসিনি এর

আগে। কাল থিয়েটারে গেছলুম, গোবর্দ্ধন বাবুর সঙ্গে সেখানে আলাপ হলো; তিনি নিমন্ত্রণ করলেন, তাই...

—বটে! বলিয়া তরুণী একবার ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইল; পরক্ষণে কহিল,—কাল তাহলে আপনিও মোহিনী দেখতে গেছলেন!

ব্রজনাথ কহিল,—গেছলুম।

তরুণী কহিল,—কেমন দেখলেন?

ব্রজনাথ কহিল,—মন্দ নয়।...তারপর তরুণীর পানে চাহিয়া কহিল,—আপনি কি ঐ থিয়েটারেই কাজ করেন?

তরুণী কহিল,—হ্যাঁ। আমিই কাল মোহিনী সেজেছিলুম...

ব্রজনাথ কহিল,—আপনার গান আমার বেশ ভালো লেগেছিল। মানে, আমি বাংলা থিয়েটার দেখা ছেড়েই দেয়েছিলুম। যত লক্ষ্মীছাড়া বই প্লে হয়, আর তেমনি কদর্য্য তার অভিনয়! অর্থাৎ অভিনয় কাকে বলে, তা না জেনে সব বড়-বড় এ্যাক্টর এ্যাক্ট্রেশ হয়েচেন! শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়া আর নাটকের বুলি আওড়ে যাওয়া...এর মানে তো অভিনয় নয়!

তরুণী হাসিল, হাসিয়া কহিল—কিন্তু কাল কি তাই দেখলেন?

ব্রজনাথ কহিল,—না, সকলের তা নয়...দু-একজনের অভিনয়ের দিকে চেষ্টা আছে, দেখলুম। বিশেষ, আপনার অভিনয়টুকু চমৎকার হয়েছিল...এই অবধি বলিয়া ব্রজনাথ কহিল—অভিনয় করতে গেলে অনেকখানি শিক্ষার দরকার। আপনার লেখাপড়াও বেশ জানা আছে, বুঝলুম...উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট...অবস্থা বুঝে মুখে-চোখে ভাব-ভঙ্গীও তেমনি ফুটিয়ে তুলছিলেন...

তরুণী কহিল,—চেষ্টা তো করি। আপনাদের ভালো লাগলেই সে চেষ্টা সফল! লেখাপড়ার কথা বলছিলেন না? লেখাপড়া ছাই জানি—তবে পড়াশুনার ঝোঁক একটু আছে,—আর ইচ্ছাও আছে, এ ঝোঁক চিরদিন রাখবো!

ব্রজনাথ কহিল,—বুঝেচি। তাই, আপনি ওদের সঙ্গে পুকুরেও স্নানে নামেননি! তবু বাগানে আপনার আসা কি ঠিক?

তরুণী কহিল,—বলেচি তো, অভিনয় করি আর যা করি...পোড়া পেটটাকে তো অবহেলা করতে পারি না...

সে কথাও ঠিক!...কিন্তু...পেটটাকে ভরাইতে কত দরদার বা প্রয়োজন!...কিন্তু এ হইল মনের গোপন কথা...এ লইয়া একজন নারীর সঙ্গে তর্ক করা চলে না! অন্য কথাবার্ত্তা চলিল...থিয়েটারের কথা, নাটকের কথা, অভিনয়ের কথা!...

এমনি কথায় কথায় দু'জনে আলাপটুকু জমিয়া উঠিতেছিল। অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে ব্রজনাথের যে ভুল ধারণা ছিল, তরুণীর সঙ্গে কথায়-বার্ত্তায় তাহা বিলুপ্ত হইয়া মনে তার সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার উদয় হইতেছিল।...

সহসা তরুণী কহিল,—এই বিলাতী কাগজগুলো আমার ভারী ভালো লাগে। এ কাগজ পেলেই আমি অভিনয়ের ছবি দেখি। ইংরাজী লেখা বুঝি না, তবু ছবির ভঙ্গী দেখে মনে মনে কত জিনিষই যে গড়ে তুলি! ইংরাজী-জানা কাকেও পেলে কত মিনতি করি বুঝিয়ে দেবার জন্য...তবে যাদের কাছে বুঝতে যাই, তাদের পাণ্ডিত্য আমার চেয়ে খুব বেশীও নয়! কথাটা বলিয়া তরুণী হাসিল।

ব্রজনাথের বেশ লাগিল। এই যে ছবি দেখিয়া তার ভিতরকার রহস্য জানিবার ইচ্ছা,—ইহাতে বুঝা যায়, তরুণীর মন সাধারণের মত নয়; সে মন সজীব এবং আপনার প্রসার বাড়াইবার জন্ত চেষ্টাও তার অহরহ চলিতেছে! সে বলিল,—আচ্ছা, আপনার বই আমায় দিন। এর যতটুকু আমি বোঝাতে পারি, চেষ্টা করে দেখি।...

এই ছবির কেতাবখানির আড়ালে দাঁড়াইয়া দুজনের মধ্যে বেশ একটু পরিচয় জমিয়া উঠিতেছিল...তরুণ বয়সের নারী...কেমন তার মন, সে পরিচয় ইতিপূর্ব্বে ব্রজনাথ যা পাইয়াছে, সে তার নিজের ঘরে। সম্পর্কীয়া ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গেই তার যা-কিছু আলাপ! অত্যন্ত ঘরোয়া রকমের সংসারের দুই-চারিটা ব্যাপার লইয়াই সে আলাপ সারা হয় এবং মন্থর গতিতে খানিকটা অগ্রসর হইয়াই সে আলাপ থামিয়া পড়ে! তার মধ্যে নূতনত্বের আভাষ থাকে না, কাজেই মন তাহাতে মোটে দোল খায় না! আর আজিকার এ আলাপ? যার সম্বন্ধে কিছু জানে না, কোনো পরিচয় কোনো কালে ছিল না, আগাগোড়া রহস্যের অন্তরালে যার হাসি-খুশী, গল্প, গান, বেদনা-আনন্দ...কোথায় কি ভাবে তার শৈশব কাটিয়াছিল, মনের দ্বারে কোন্ অতিথিরা কিসের বার্ত্তা নিত্য বহিয়া আনে!

না-জানার এই যে গভীর মোহ, সেই মোহ ব্রজনাথের চিত্তে এমন কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল! এই না-জানার মধ্যে কি রোমান্সের আবেশ...তার কেবলি মনে হইতেছিল, এই যে তরুণী তার তারুণ্যের সমস্ত আভাটুকু লইয়া উজ্জ্বল রশ্মি ফুটাইয়া তার সামনে এমন অতর্কিতে আলোর উচ্ছ্বাসের মত উদিত হইয়াছে, না-জানা রহস্যের অন্তরাল হইতে এই একটু মাত্র যার প্রকাশ...অপ্রকাশের নেপথ্য অন্তরালে তার কতখানি

কি পরিচয় না জানি প্রচ্ছন্ন আছে! তার হাসি, তার অশ্রু, তাও কি অসীম রহস্যে ঘেরা...ব্রজনাথের বুকের মধ্যটা থাকিয়া থাকিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল! রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশীর কথা তার মনে পড়িতেছিল,—

কোনো কালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশি!......

এই তরুণী...শৈশবে এও না জানি ঐ উর্ব্বশীর মত কোন্ আঁধার পাথার-তলে কার আছে বসিয়া কি মণি-মুক্তা লইয়া খেলা করিয়াছিল, না-জানি কি স্বপ্নই এ তখন দেখিত...আজ ব্রজনাথের চোখের সামনে সে আসিয়া দাঁড়াইল ঠিক ঐ উর্ব্বশীরই মত...

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'......
.................যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা!

ব্রজনাথ ছবির অর্থ বুঝাইতেছিল—আর হাস্যে-গল্পে উচ্ছ্বসিত হইয়া তরুণী সে অর্থ বুঝিতেছিল। ব্রজনাথের কাছ ঘেঁসিয়াই সে বসিয়াছিল! বাতাসে তার আঁচল উড়িয়া ব্রজনাথের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছিল, ব্রজনাথের মন সে আঁচলের স্পর্শে তালে তালে নাচিতেছিল! তরুণীর কেশের মিষ্ট গন্ধ, তার নম্র মৃদু-মর্ম্মর বাণী ব্রজনাথের নিঃসঙ্গ চিত্তে অনেকখানি মোহ অনেকখানি বিভ্রম জাগাইয়া তুলিতেছিল...তার মন তখন মর্ত্ত্যলোকে ছিল না! কোন্ নন্দনে সেই উর্ব্বশীর পিছনে চলিয়াছিল।

সহসা কর্কশ কণ্ঠে অবুর স্বর তার মনটাকে কঠিন মর্ত্ত্যভূমে আছড়াইয়া আনিয়া ফেলিল। অবু কহিল,—একলাটি তোমার ভারী..

এই অবধি বলিয়াই সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, কহিল,—বাঃ, in pleasant company...! বহুৎ আচ্ছা, মনিয়া বিবি...তাই তো বলি, জলের ধারে দেখতে পেলুম না—শুনলুম, এখানে শুভাগমনও হয়েচে, তাহলে গেলেন কোথায়! তা আমাদের বন্ধুকে সঙ্গদান করে আপ্যায়িত করচেন! সাধু! সাধু!

তুচ্ছ কথা! তবু এ কথায় ব্রজনাথ কেমন শিহরিয়া উঠিল। তাই তো,...তরুণী...এ তো দেবলোকের সে চিরযৌবনা উর্ব্বশী নয়, নন্দনের কুসুম-শয়ন-লীনা অপ্সরীও নয়,—এই মাটীর সহরের বুকে তার চেয়েও নোংরা ধুলা-মাটীতে রচা বাংলা থিয়েটারের একজন অভিনেত্রী, অর্থাৎ...

যে-নারী নিজের দেহকে পণ্য করিয়া ভাড়ায় খাটায়! তার মনের মধ্যে আজন্মের সংস্কার মুহূর্ত্তে অমনি বিরূপতার ঢেউ তুলিল,...কিন্তু উপায় কি? বেচারীর কি দোষ! তার সঙ্গে কোনো অভদ্রতা করে নাই...বরং তার খানিকটা অবসর এমন মায়া-বিভ্রমে ভরিয়া তুলিতেছিল যে, সে ইহারি সঙ্গে কথায়-কথায় নিজের বেদনা ভুলিয়া, আরাম...হাঁ, আরামও একটু পাইয়াছিল বৈ কি! ইহার প্রতি বিরূপ হওয়া তার সাজে না, বেচারীর প্রতি অবিচার করা হইবে!

অবু কহিল,—কিছু খাবে না, ব্রজবাবু? বেলা নেহাৎ অল্প হয়নি। এঁরা সকলেও আসচেন। গোবর্দ্ধন আমায় তাড়া দিয়ে আগেই জল থেকে তুলে দিলে, বললে, ভদ্দর লোক একলা আছেন, তুমি যাও...তা, আমি কি জানতুম, যে মনিয়া বিবি তোমার অভ্যর্থনার ভার নিয়েচেন! ইনিই সেই কালকের রাত্রের মোহিনী।" তারপর মনিয়ার দিকে ফিরিয়া

অবু সুর করিয়া কহিল—কি বল গো মনিয়া বিবি, মোহিনীর সেই ছড়াটা কি, ..

রাতকা মোহিনী, দিন্‌কা বাঘিনী,

পলক্ পলক্ লহু চোষে!

মনিয়া বিরক্ত-ভাবে কহিল,—যাও অবু বাবু, ইয়ার্কি করো না... ভালো হবে না, বলচি!

অবু কহিল,—তোমরা কার কবে ভালো হওয়াও, বিবি...

মনিয়া কহিল,—আবার!...দেখবে তবে?

অবু কহিল,—না, না, মনিয়া বিবি, মেজাজ খোশ-খেয়ালে রাখো! কত কষ্টের কত সাধনার বাগান, নিত্য তো পাই না। তোমায় চটিয়ে কি শেষে...তারপর, আমাদের নতুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হলো কেমন? বল...

মনিয়া কহিল,—ইতরোমি ছাড়ো দিকিন্...কার সঙ্গে কি কথা কইতে হয়, জানো না—জানবার চেষ্টাও করলে না কখনো! ওঁকে ধরে কেমন এই সব ছবির মানে বুঝছিলুম...এমন বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন...

অবু কহিল,—যে তোমার ভাব লেগে যাচ্ছিল!

অবুর কথার মধ্য হইতে একটা অভদ্র ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল! ব্রজনাথ কহিল,—চুপ করে বসো দিকি, অবু...একজন স্ত্রীলোকের সামনে নিজের সম্ভ্রম বাঁচিয়েও কথা কইতে পারো না!

এ কথায় অবু স্থির হইল। ব্রজনাথের স্বরে ঝাঁজ ছিল! অবু ভড়কাইয়া গেল, ভাবিল, ঠিক, হুঁশিয়ার! নহিলে যা ভাবিয়া রাখিয়াছে, তা হয়তো প্রথম মুখেই ফাঁশিয়া যাইতে পারে! প্রসঙ্গটা

বদলাইবার অভিপ্রায়ে তাই সে কহিল,—না সত্যি, ইয়ার্কি নয়—গরম গরম কাটলেট, চপ...আনতে বলেচি। তৈরী। কিছু খাও...চা আনতে বলবো এই সঙ্গে?

ব্রজনাথ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মনিয়া কহিল,—এই দুপুর রোদে আর চা আনায় না! বরং বরফ-লেমলেড আনাও...

অবু ব্রজনাথের পানে চাহিল, কহিল,—তাই আনাই?

ব্রজনাথ কহিল,—আনাও...

তারপর কাটলেট আসার সঙ্গে সঙ্গে সদলে গোবর্দ্ধন শীলও আসিয়া উপস্থিত হইল। কোলাহলের মধ্যে জলযোগ চুকিল। তারপর গান। ফরমাশের ধূমে মনিয়াকে গাহিতে হইল। একটার পর একটা...মনিয়া গাহিল, অপর নারীরাও গানের সুর বিলাইতে কার্পণ্য করিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমোদ সুরু হইল। বোতল আসিল, কাঁচের গেলাস আসিল, সোডা আসিল...এবং গোবর্দ্ধনের সাঙ্গোপাঙ্গ আমোদের স্রোতে যখন গড়াগড়ি দিতেছে, তখন দিবসের সূর্য্য লজ্জায় রাঙা হইয়া পশ্চিম-আকাশে বড় বড় গাছগুলার আড়ালে কোনমতে পলাইয়া সেদিনকার মত আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিল!

৮

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া সারাদিনকার কাণ্ড-কারখানা ভাবিয়া ব্রজনাথের মন অনুশোচনায় হাহাকার করিয়া উঠিল। কি আনন্দ পাইবার লোভে সে কোথায় গিয়া আকুল প্রাণে দাঁড়াইয়াছিল! হায় রে, এত বড় মতিভ্রম তার কি করিয়া হইল! এরি নাম পাষাণী স্ত্রীর বিমুখতার শাস্তি দেওয়া? এর চেয়ে সে-স্ত্রীকে খুন করিয়া তার রক্ত মাখিয়া নৃত্য করাও যে ঢের ভালো ছিল! নিজেকে এ-ভাবে পশুর দলে মিশাইয়া দেওয়া! ধিক্কারের আগুনে তার মন পুড়িয়া যাইতেছিল!...অবুর উপর রাগ হইল—পাজী, শয়তান! ঐ গোবর্দ্ধন শীল লোকটাও...এত বড় বেকুব! পয়সা খরচ করিয়া কতকগুলা অকালকুষ্মাণ্ড মোসাহেবকে এমনি বানরের মত নাচাইয়া আমোদে আত্মহারা হইতেছে!......

সে ভাবিল, না, এদের দলে আর নয়! আমোদ! আমোদের কি জানে উহারা! যে আমোদ কল্প-লোকের দ্বারে, সে আমোদ...

অবু আসিয়া কহিল,—কখন ঘুম থেকে উঠলে?

ব্রজনাথ কহিল,—যেমন উঠে থাকি...

অবু কহিল,—আমায় তো মুস্কিলে ফেলেচে! আজ সকালে বোনের বিয়ের ফর্দ্দ তারা করতে এসেছিল—পাঁচ হাজার টাকার এক ফর্দ্দ দাখিল করে গেছে।

ব্রজনাথ কহিল,—তারপর ?

অবু কহিল,—বলে, এক হাজারের সংস্থান নেই, তা পাঁচ হাজার! মহা ভাবনায় পড়েচি...

অবুকে একটা আঘাত দিবার লোভ ব্রজনাথের মনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এ লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। ব্রজনাথ কহিল,—কাল যখন মুনিয়া বিবির আঁচল ধরে নাচছিলে, তখন তোমায় দেখে মনেও হয় নি যে, তোমার একটা সংসার আছে, সে-সংসারের এক ধারে আইবুড়ো বোন আছে, আর সে বোনের বিয়ে দেবার কথা কখনো তোমার মনে জাগতে পারে...!

অবু এ কথায় অপ্রতিভ হইয়া মাথা নামাইল। ব্রজনাথ কহিল—এ ভাবনা নিয়ে অত আমোদ করো কি করে, তাই ভাবচি!

অবু কহিল,—পয়সার দুঃখে মরে আছি, ভাই,...তা বলে বিনামূল্যে যেটুকু আমোদ পাবো, তা থেকেও বঞ্চিত থাকবো! ঐ সব করেই তো কোনমতে দেহখানাকে খাড়া রেখেচি...

ব্রজনাথ কহিল,—বুঝি না, ঐ-সব থেকে কি শান্তি তুমি পাও!

অবু কহিল,—তোমার কালকের পার্টি ভালো লাগে নি?

ব্রজনাথ কহিল,—রামচন্দ্র! কতকগুলো ভাড়াটে স্ত্রীলোক এনে... তাদের লজ্জা, তাদের নারীত্বকে দু' পায়ে মাড়িয়ে—একে বলো আমোদ করা! আর ঐ স্ত্রীলোকগুলো—বেচারী সব! দুটো পয়সার জন্য এমন নির্লজ্জও হতে পারে!...ব্রজনাথ চুপ করিল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—ঘৃণা হলেও ওদের কথা ভেবে দুঃখে-ক্ষোভে আমার বুকখানা যেন ফেটে যাচ্ছিল!

অবু কহিল,—ওরা কি করবে, বল! দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁই, ভাই... লজ্জা রাখতে গেলে অন্নাভাবে মরতে হয় এদিকে...

ব্রজনাথ কহিল,—মরুক...ও-ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে সে মরণেও তবু প্রাণের সাড়া পাওয়া যাবে!

অবু কহিল—অগাধ পয়সার গদিতে বসে এ ফিলজফির ব্যাখ্যা বেশ চলতে পারে! কিন্তু প্রাণটাকে তো ফিলজফিতে বাঁচানো যাবে না! এই যে আমার কথা বললে...পয়সার অভাবেই না বানিয়ে-সেজে বড়লোকের দোরে দোরে ফিরি—দু'পয়সা পাইও তাতে!...লোকে বলে, মোসাহেব...কিন্তু সাধে কি মোসাহেবি করতে হয়! রোজগার যা করি গতর খাটিয়ে, সে-রোজগারে সংসার চলে না। সংসারের বিরাট জঠর,—অভাব তার চতুর্দ্দিকে! অথচ জন-মজুরের মত থাকার অভ্যাস কখনো করিনি—ফরসা ধুতি, গাঁয়ে জামা আর উড়ানি দিয়ে ভদ্র সেজে বেড়াতে হবে; অথচ রোজগারের পয়সা থেকে তার খরচ জুগিয়ে ওঠে না! ভিক্ষা করা চলে না—ভিক্ষা কেউ দেবে না। ভদ্র ভিখারীর মত হতভাগাকে দুনিয়ায় কেউ দয়া করে না! কাজেই বড়লোকের দোরে মাথা গলিয়ে তাদের মন জুগিয়ে আরো কিছু সংস্থান করতে হয়...এইটেই ভাই, আসল কথা! বড়লোকে ঘৃণা করে, জানি, তবু দু'পয়সা চাইলে যে ফেরায় না, তার কারণ, বড়লোকের মন-জোগানো কথা তারিফ করে ঠিক সময়ে বলতে পারি...বুঝি সব, ভাই, কিন্তু অতি-নিরুপায়!...এই যে বোনের বিয়ে...পাঁচ-সাতশো যদি খরচ হয়, পাঁচ দোরে দাঁড়ালে হয়তো মিলে যাবে...

একটু চিন্তিতভাবে ব্রজনাথ কহিল,—সমস্যার কথা, অবু...

অবু জবাব দিল,—তুমিই মীমাংসা করে দাও...

ব্রজনাথ কহিল,—আমি মীমাংসা করবো! নিজের সমস্যা নিয়ে তারি চিন্তায় আমি এমন বিভোর যে দেশের ও-সব বড় বড় সমস্যার ধেঁষ সওয়া আমার কর্ম্ম নয়! তবে, একটা কথা মনে হয় এই যে, ইতরুমি করে পয়সা উপায় করার চেয়ে জন-মজুরী করাও ঢের ভালো! মনটা তাতে ময়লা হয় না!

অবু কহিল—ও-সব তোমাদের বইয়ের কথা!...

ব্রজনাথ কি ভাবিতেছিল; আত্মগতভাবে সে কহিল,—হবে! কিন্তু বইয়ের মধ্যে আমি এমন মশগুল থাকি...তাছাড়া ওগুলো আমার চোখে বড় বিশ্রী ঠেকে। সংস্কার বলতে পারো...হয়তো এককালে তোমাদের মনও আমার মনের মত বিমুখ হতো, অভ্যাসের ফলে এখন হয়ে গেছে, এমন নির্ব্বিকার হয়েচো! ওর মধ্যে লাভ আর আমোদটুকুই দেখচো...কদর্য্যতাটুকু চোখে পড়ে না!...আমার কিন্তু বিশ্রী ঠেকে!

অবু কহিল,—কিন্তু তুমি তো মনিয়া বিবির সঙ্গে বেশ আলাপ করছিলে...

ব্রজনাথ কহিল,—তা করছিলুম...কিন্তু কেন করছিলুম, তা তোমায় বোঝাতে পারবো না! বোঝাবো কি, তুমি তা বুঝবে না......

দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ। তারপর ব্রজনাথ কথা কহিল। সে প্রশ্ন করিল,—যাক ও সব কথা...এখন কি বলতে চাও...?

অবু কহিল,—বোনের বিয়েয় তোমরা ভাই কিছু সাহায্য করো... আমায় পাঁচ হাজার দর দেছে যারা, তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না...দুঃখ হয় শুধু এই ভেবে যে, বোনটা আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার বোন

হলে কি হবে, তার শিক্ষা-দীক্ষা ভালোই। আর চেহারা...সত্যি, আমার বোন বলে বলচি না, সে একজন সুন্দরী! তার কি কোনো দাম নেই? এঁরা প্রথমে বলেছিলেন, মেয়েটী সুশ্রী হলে পয়সায় আট্‌কাবে না! মেয়ে দেখে পছন্দও হলো...তবু এই পাঁচ হাজার টাকার ফর্দ্দ! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেছে!...হাত্তোর সমাজ!...

ব্রজনাথ হাসিল; হাসিয়া কহিল,—এখন সমাজের গোঁজ হয়েচে! তবু ভালো!

এ কথার অর্থ অবু ভালো বুঝিল না। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—গোবর্দ্ধন বলছিল তার এক মাষ্টার মশায় ছিলেন, তাঁর এক ছেলে আছে, রেলে চাকরি করচে, ত্রিশ টাকা মাইনে পায়। তার সঙ্গে গোবর্দ্ধন বিয়ের কথা কয়ে দেখবে। তা ভালো কথা, হ্যাঁ, তোমার কাছে আসার মানে,—তোমার মোটরখানা যদি আজ ওবেলায় একবার দাও ভাই, ..মা বলছিলেন, একবার কালীঘাটে যাবেন...ওঁর গুরুদেব আছেন...তিনি বোনটাকে কাদের দেখাতে চান্ কালীঘাটের মন্দিরে...

ব্রজনাথ কহিল,—মেয়ে বয়ে নিয়ে যাবে সেখানে...তাদের দেখাবার জন্য?

অবু কহিল,—উপায় কি, বল?

ব্রজনাথ কহিল,—এটা ভারী বর্ব্বরতা, তা যাই বলো! এমন কথা যে বরকর্ত্তা বলতে পারে, তার স্পর্দ্ধাও অসীম, আর তার ভদ্রতার আমি কস্মিন কালে অনুমোদন করতে পারি না! বাড়ীর বৌ করবে যাকে, তাকে এমনভাবে টেনে নিয়ে গিয়ে দেখা...কেন, নিজে আসতে পারো না? এ যেন ঘোড়া-গাড়ী বেচবার মতই মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাওয়া...

অবশ্য, আমার গাড়ী নিয়ে যাবে, নিয়ে যাও...সেজন্য বলচি না। কিন্তু এ বে-আক্কেলে প্রথা অত্যন্ত গর্হিত !...

অবু এ কথার কোনো জবাব দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ব্রজনাথ কহিল,—কখন গাড়ী চাই ?

অবু কহিল,—সেই বেলা সাড়ে পাঁচটার পর। অর্থাৎ আমার আপিস আছে। এখন আপিস যাবো—ফিরবো সেই পাঁচটায়। ফেরার পর...

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ, এসে গাড়ী নিয়ে যেয়ো...

অবু কহিল,—তোমার অসুবিধা হবে না, বেড়াতে যাবার ?

ব্রজনাথ কহিল,—তাতে কিছু এসে যাবে না। আমি নয় তোমরা ফিরলেই যাবো...

অবু কহিল,—আর একটা কথা ছিল, ভাই...

ব্রজনাথ কহিল,—কি ?

অবু কহিল,—মানে, আমার পরিবারের তো ভালো শাড়ী-টাড়ী নেই, তা তোমার বাড়ী থেকে...

অবুর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্রজনাথ কহিল,—কিন্তু আমার স্ত্রী তো এখানে নেই...

একটু কুণ্ঠিত ভাবেই অবু কহিল,—তিনি না থাকলেও, তাঁর একখানা শাড়ী...

ব্রজনাথ কহিল,—তাঁর আলমারির চাবি তো আমার কাছে নেই, ভাই। নাহলে কোনো আপত্তি এতে থাকতে পারে না...

অবু কহিল,—তা যাক্‌গে...এমনি সাদাসিধে কিছু পরেই যাবে'খন। গোবর্দ্ধনের কাছে যেতে পারতুম...কিন্তু, অর্থাৎ বুঝলে কি না, তার

কাছে এতখানি দৈন্য নাই-বা প্রকাশ করলুম! তুমি যতটা জানো, আমায়...অবশ্য...

ব্রজনাথ কহিল,—ও-সব কথা থাক্!...এখন, যে-ছেলেটির সঙ্গে কথা হচ্ছে, এ ছেলেটি কি করে?

অবু কহিল,—ছেলের বাপের মস্ত কাঠের কারবার আছে চেৎলায়...

ব্রজনাথ কহিল,—এরা কত চায়?

অবু কহিল,—মার গুরুদেব আছেন মাঝখানে...বেশী চাইতে পারবে কি!

ব্রজনাথ হাসিয়া কহিল—ছেলের বিয়ে যে এক মস্ত দাঁও! এমন দাঁও তারা ছাড়বে? কি যে বলো পাগলের মত! হুঁঃ, তবু ছাখো...

অবু কহিল,—ভাগ্যে তোমার গাড়ী পেলুম, নাহলে বোনটাকে কালিঘাটে পাঠাবার জন্য গাড়ী ভাড়া করতে হতো তো! সেও অল্প খরচ নয়। তোমাদের পাঁচজনের কাছে এসে দাঁড়াই, তোমরা ভালোবাসো, তাই...

ব্রজনাথ কহিল,—ও-সব কি বাজে কথা বকচো! এখন যাও, আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে,—আর বসে না!

অবু কহিল,—হ্যাঁ, যাই এই।

অবু চলিয়া গেল। ব্রজনাথ আবার ভাবিতে বসিল—দুনিয়ায় এই এক সুর চলিয়াছে! বেচারা আর্ত্ত-দরিদ্রের এই করুণ গান! কিন্তু অবু পুরুষ-মানুষ—পাঁচ দোরে হাত পাতিলে উপায়ও তার কোনোমতে জুটিয়া যায়! কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকগুলা...? কি চড়া দামেই না তাদের অন্ন সংগ্রহ করিতে হয়! কিন্তু সত্যই কি অন্ন এমন দুর্লভ! তাও

তো নয়...এর পিছনে আছে মানুষের তরল আমোদ-স্পৃহা! হাসি-খুশীর জন্য অধীর পিপাসা!...এরা তারি সুযোগ পাইয়া রূপ আর দেহ লইয়া বেসাতি করিয়া ফিরে!...

কিন্তু তারো তো ঐ কামনা! সে'ও তো জীবনে আমোদ চায়!...তা বলিয়া অমনি করিয়া? নিজেকে মারিয়া ছেঁচিয়া নিজের বুকে আগুন জ্বালিয়া দীপের মালা সাজাইবে, আর নিজের মনুষ্যত্ব জ্বলিতে দেখিয়া খুশী হইবে, আমোদ পাইবে! মন সগর্জ্জনে কহিল, না, না!...

ঠিক তো! শুধু অন্ন পাইলেও তো সব পাওয়া হয় না! অন্নে দেহের পুষ্টি হয় শুধু! আর হাসি-খুশী-আনন্দ...সে যে মনের খোরাক! মনকে উপবাসী রাখিয়া শুধু দেহকেই যে পুষ্টি জোগায়, সে তো পশু! মানুষের মন জিনিষটার সৃষ্টি হইয়াছিল কেন? এইখানেই তার প্রভেদ পশুর সঙ্গে! পশু যা পায়, তা গিলিয়াই তার তৃপ্তি হয়! তার মন নাই, তাই মনের কোনো বালাইও তার নাই! কাজেই......

বেচারা অবু যদি তার দারিদ্র্য ভুলিবার জন্য একটু আমোদের চেষ্টায় ছোটে, তাহাতে কি তার অপরাধ! সংসারে দারিদ্র্যের ভারে বুক পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, তাই না সে-দারিদ্র্যের পাথরখানাকে সরাইয়া একটু আমোদের ঝলক পাইবার জন্য অমন লোলুপ হইয়া সে এখানে-সেখানে ছোটে! তবে তার মন ছোট, যা-তা দিয়াই মনকে সে খুশী করিতে চায়!...

ঐ যে মনিয়া!...সে তো স্পষ্ট বলিল, পেটের দায়ে থিয়েটারে চাকরি লইয়াছে। বয়স থাকিতে রূপ থাকিতে, সেই বয়স আর সেই রূপ পাঁচজনের সামনে ধরিয়া দেখাইয়া আরো দু'পয়সা রোজগার করিলে

স্বাচ্ছন্দ্য পাইবে, কাজেই...তাছাড়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও তার চাই! এমনি তো মানুষ মানুষকে দয়া করিয়া তার কষ্ট ঘুচাইতে বা তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পয়সা দিবে না! দাম দাও, জিনিষ নাও! এই দেনা-পাওনার কারবার যে সর্ব্বত্র! স্ত্রী-পুত্রের মমতা,—তাও কি দামের বিনিময়ে পাওয়া নয়? রুক্ষ কঠিন স্বামী যদি স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য বিধান না করে, তাহা হইলে সে স্ত্রীই কি স্বামীর মুখ চাহিয়া তাকে আদর করে, না, প্রাণের মধ্যে পুঞ্জিত মমতার নির্ঝর সে উৎসারিত করিয়া দেয়! তবে ...মনিয়ার কি দোষ? পুরুষ তার হাসি চায়, তার দেহ চায়, তার রূপে মাতিতে চায়, মজিতে চায়, মনিয়া তা দেয়, দিয়া দাম লয়! ঐ দেনা-পাওনার কারবার শুধু!...কিন্তু...

পরক্ষণেই তার মনে হইল, হোক দেনা-পাওনার কারবার,—তা বলিয়া নিজেকে জ্বালাইয়া পুঁড়াইয়া দাম লওয়া চলে না! ...বেশ্যা, ছি!

ব্রজনাথ আবার ভাবিল, কিন্তু কি হইবে মিছা এ-সব ভাবিয়া! সে চায়, জীবনকে উপভোগ করিতে। তবে, ও-দলে মিশিয়া...? অসম্ভব! অবু ভুল পথ বাৎলাইয়াছে...কাদা মাখিয়া নীচ ইতর পশু আনন্দ পায়—মানুষ তা বলিয়া আমোদের জন্য ঐ পশুর মতই কাদা মাখিতে পারে না!

তা হইলে উপায় কি? বাহিরে পথে দলে দলে লোক চলিয়াছিল... জানলা খোলা...ব্রজনাথ শূন্য উদাস মনে পথের পানে চাহিয়া রহিল।

৯

কে না কোথায় কবে সেই বলিয়াছিল, মানুষ ঘটনার দাস.. অর্থাৎ ঘটনাচক্র তাকে যে পথে চালায়, সেই পথের পথিক হওয়া ছাড়া তার অন্য উপায় নাই! মনে সংশয় জাগিত, সত্যই কি তাই? তবে যে ওই মানুষের নিজের ইচ্ছা, জিদ বলিয়া একটা কথা শুনা যায়, তার অর্থ কি?...

এক মূর্খ চাষার ছেলে ক্ষেতের ধারে গরু চরাইতেছিল। এমনিতেই রোগে ভুগিয়া দেহ তার শক্তিহীন, তার উপর ভীরুতায় মনও তার পূর্ণ ছিল। ক্ষেতে সহসা একদিন তার সামনে কোথা হইতে একটা বাঘ আসিয়া উপস্থিত। নিরুপায় হতাশ তার দেহে-মনে কোথা হইতে অমনি কি শক্তি যে আসিল—সে হাতের লাঠি সবলে চালাইয়া বাঘের পিঠে আঘাত করে, বাঘ ভয়ে পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়!...ভীরু শক্তিহীন চাষার ছেলে...এ ঘটনার পর তার সাহস আর শক্তির কথা লইয়া সারা দেশে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।...তবে? মানুষকে ঘটনার দাস বলিলে সে জন্য সংশয় উঠিবারো তো কোনো হেতু দেখি না!

ঠিক এমনিভাবেই এক অসম্ভব ব্যাপার ব্রজনাথের জীবনে ঘটিতে চলিল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরক্ষণে অনু ফিরিল মোটরে চড়িয়া। ব্রজনাথ বাহিরের ঘরে অগ্নির সামনে বসিয়া তার বুকে ঘা মারিয়া কি একটা

রাগিণী জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার নিবিড়তার মাঝখানে সে রাগিণী এমন এক করুণ আব-হাওয়ার সঞ্চার করিয়া তুলিল...! অবুকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া সে বাজনা থামাইয়া প্রশ্ন করিল—কি হে, অবু যে! এরি মধ্যে কাজ চুকে গেল?

অবু কহিল,—হ্যাঁ।

ব্রজনাথ কহিল,—তার পর...? অনেকখানি বিবরণ শুনিবার প্রত্যাশায় ব্রজনাথ উদ্গ্রীব হইয়া রহিল।

অবু কহিল,—তারপর আর কি,—মেয়ে তাদের খুব পছন্দ হয়েচে! তবে গোড়ায় গলদ...

ব্রজনাথ কহিল,—তার মানে?

অবু কহিল—তাদের স্পষ্টই প্রশ্ন করা হলো, টাকাকড়ি কি চায়? তা, তারাও কোনো সঙ্কোচ না রেখে বললে, গুরুদেব যখন মাঝে আছেন, তখন নগদটা তারা নেবে না বটে, তবু মেয়ের মোটামুটি গা-সাজানো গহনা, সে প্রায় আড়াই হাজার টাকার...আর বরের জন্য ঘড়ি চেন আংটি, বেনারসীর জোড়, রূপার দান, কাঁশা-পিতল, খাট-বিছানা, এ সবও বেশ ভারী রকমের দিতে হবে...অর্থাৎ এরা অভদ্রের মত হুঙ্কার তুলে ফর্দ্দ দিলে না—বেশ ভদ্র-ভাবে হাসি-মুখে পিঠে সুড়সুড়ি দেবার ভঙ্গীতে প্রায় সেই পাঁচ হাজারের কাছাকাছি ফর্দ্দ দিয়েচে।

ব্রজনাথ কহিল,—তোমাদের গুরুদেব ছিলেন না? তাঁর সামনেই ফর্দ্দ হলো?

অবু কহিল,—তা হলো বৈ কি!

ব্রজনাথ কহিল,—তিনি কি বললেন ?

অবু কহিল,—তিনি বললেন, এর কমে বিয়ে একটা হয়ও না, সত্যি ! তা চেষ্টা-বেষ্টা করে টাকাটার জোগাড় করে ফেলো হে ! কি বলবো, মার সামনে বলে চুপ করে রইলুম, না হলে গুরুদেবের দালালী ছরকুটে দিতুম!...কি যে করি ! আমি তো এই লক্ষ্মীছাড়া, কিন্তু বোনটার জন্য দরদ হয়, সত্যি,—বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ভাই !...

ব্রজনাথ কহিল,—একটু ত্যাখো-শোনো,—যত কমে-শমে হয় ! তারপর আমরা পাঁচজন আছি...কোথাও সামান্যর জন্য বাধে তো দেখা যাবে, কতদূর কি করে উঠতে পারি...

অবু কোনো জবাব দিল না। সে কি ভাবিতেছিল...নিজের নিরুপায়তা, না, বোনটির প্রতি মমতা...কে জানে !

ব্রজনাথ কহিল,—তা হলে চুপচাপ আর এখন বসে থেকে কি করবে ? চলো, খানিক বেড়িয়ে আসা যাক !

অবুর মুখে একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—একটা কথা বলবো ?

ব্রজনাথ কহিল,—কি ?

অবু কহিল,—যদি অভয় দাও তো বলি...

ব্রজনাথ কহিল,—ভূমিকা রেখে বলেই ফ্যালো না...

অবু কহিল,—মানে, মনিয়া বিবির ওখানে যাবে ? বেচারী আমায় অনেক করে বলেছিল...

কথাটা কাণে তেমন সুরের সৃষ্টি করিল না, তবু প্রাণের কোন্‌খানে শূন্যতার মাঝখানে অনেকখানি হিল্লোল তুলিল ! স্থির জলে ঢিল পড়িলে

যেমন খানিক তরঙ্গের চক্র ফোটে, তেমনি...! বিশেষ করিয়া ঐ বেচারী কথাটা...

ব্রজনাথ কহিল—কি বলেছিল ?

অবু কহিল,—তোমার উপর তার ভারী শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম...তাই বলেছিল,—ভদ্দর লোক চমৎকার মানুষ...হল্লার মধ্যে ভালো আলাপ হলো না, একদিন খাতির করে আমার ওখানে এনো না।

ব্রজনাথ কি ভাবিতেছিল...প্রাণের নিভৃত কোণে যৌবনের ... আকুল রাগিণী অহরহ বাজিতেছে...তরুণীর সাদর আহ্বান...সঙ্গে সঙ্গে মনিয়ার সেই সহজ মুক্ত অবাধ ভঙ্গী, সেই কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া কল্প-লোকের সম্বন্ধে কতই না সরল প্রশ্ন...মন তার সরস হইয়া উঠিল...তার সান্নিধ্য পাইবার জন্য নিঃসঙ্গ মন মুহূর্ত্তে উদগ্র হইল !...

অবুর কথায় সে কি জবাব দিতে যাইতেছিল...সহসা কথা তার বাধিয়া গেল ! সেই তো মনিয়া...পয়সা রোজগারের চেষ্টা যার সর্ব্বক্ষণ মনে জাগিতেছে...কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য তার সেই ব্যাকুলতা !...তাকেও তার সেই জন্যই প্রয়োজন ? রূপের ও বয়সের তূণ আছে—তারি একটা নিক্ষেপ করিয়া ব্রজনাথকে সে মৃগয়া করিতে চায় ?...মন পরক্ষণেই মুখ বাঁকাইয়া তিক্ত স্বরে কহিল, বটে !

ব্রজনাথ কহিল,—মাপ করো ভাই ! তার প্রতি আমার সম্ভ্রম প্রথমটা বেশই ছিল...কিন্তু যে-ভাবে সে নাচ-গান সুরু করেছিল,...ভারী বিশ্রী ! তার ঐ শ্রীর সঙ্গে মোটেই তা খাপ খায় নি...

অবু কহিল—মোদ্দা গান গায় খাসা ! শুধু একটা গান নয় শুনে আসা যেতো...

বেচারী সরল ঈভ...কোন্ সনাতন যুগে শয়তানের প্ররোচনায় শত নিষেধ সত্ত্বেও জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়া বিশ্বে মৃত্যু আনিয়াছিল! এ পুরাণের কথা। কিন্তু সে পুরাণের খেলা আজো এই বিশ্বে চলিয়াছে। কি বিরাম-বিহীন সে খেলার লীলা! জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইবার জন্য ব্রজনাথেরও ক্ষুধা ছিল বিলক্ষণ...শুধু সংস্কারের ছোট একটী নিষেধ বাধা তুলিয়াছিল! সে বাধা কত ক্ষীণ, কি ভঙ্গুর...প্রাণের সে দুর্ব্বার ক্ষুধার সামনে! ওদিকে মনিয়ার দুই চোখে সেই কি দৃষ্টির ভঙ্গিমা!...

ব্রজনাথ কহিল,—চলো, মোদ্দা দু'এক্ ঘণ্টার বেশী থাকা হবে না।

অবু কহিল,—তাই, তাই...

ব্রজনাথ উঠিল। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া অবুর সামনে সিগারেটের টিন ধরিয়া দিয়া কহিল,—নাও...

টিন হইতে সিগারেট লইয়া জ্বালিয়া অবু মুখে দিল, তারপর কহিল,—এসো...

দুইজনে নীচে নামিয়া গাড়ীতে উঠিল।...সোজা রাস্তা...বহুদূর গিয়া বীডন ষ্ট্রীটের সামনে আসিয়া গাড়ী পৌঁছিলে অবু সোফারকে কহিল,—

গাড়ী ডাহিনে বেঁকিল...সেণ্ট্রাল এভেনিউর মোড়...আরো আগে গাড়ী সমান চলিল...বাঁয়ে থিয়েটার...আরো আগে...একটু গিয়া অবু সোফারকে কহিল—ডাহিনা...

ছোট গলি। গাড়ী গলির মধ্যে ঢুকিল। ব্রজনাথ মৃদু স্বরে কহিল,—ড্রাইভার কি ভাবচে! না অবু, থাক—

হাসিয়া অবু কহিল—পাগল! ড্রাইভারকে সঙ্কোচ...

এ সঙ্কোচ হয়। অবু তার কি বুঝিবে! মনে তার কড়া পড়িয়া গিয়াছে...ব্রজনাথ চুপ করিয়া রহিল। গাড়ী আসিয়া অবুর নির্দ্দেশে আরো কয়টা ছোট গলি পার হইয়া একখানি দোতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। অবু কহিল—থামো...

যন্ত্র-চালিতের মত অবুর নির্দ্দেশে ব্রজনাথ নামিল। ড্রাইভারের পানে সে চাহিতে পারিল না...পথে লোক চলিয়াছিল। সে কাহারো পানে চাহিতে পারিল না। তার মনে হইতেছিল, পথের ও লোকগুলা দুষ্ট চোখে রাজ্যের কৌতুক ভরিয়া কি পরিহাস-ভরেই না তার এই নির্লজ্জ অভিসার-যাত্রা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিয়া সারা হইতেছে!...

দোতলায় সজ্জিত ঘর...কোমল শয্যায় গা ঢালিয়া শুইয়া মনিয়া কি একখানা বাংলা বই পড়িতেছিল। অবু কহিল—বিবি সাহেব সেলাম... গা তুলে উঠুন, দেখুন, কে এসেচে...

মনিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল; বসিতেই ব্রজনাথের সঙ্গে চোখো-চোখি হইল। হাসিয়া মনিয়া কহিল,—আপনি! ইস্, কি ভাগ্যি আমার!

অবু কহিল,—কত তপস্যা করেছিলে, তারি ফল...বুঝলে বিবি সাহেব! আসতে কি উনি চান? কত মিনতি করে বললুম...পায়ের ধুলো দেবার জন্য...

মনিয়া কহিল,—আসুন, বসুন অনুগ্রহ করে...

ব্রজনাথের মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল,—পা টলিতেছিল!... পাশের বাড়ীতে রমণী-কণ্ঠে গান হইতেছিল,—তারে কি যায় গো ভোলা!...

ব্রজনাথের বুকের মধ্যে কে যেন সেই গানের সুরে যোগ দিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে কহিল,—সত্যই, তাহা হইলে তাকে ভোলা যায় না... ভুলিতে পারো নাই !...

অপ্রতিভ ভঙ্গী-সহকারে ব্রজনাথ শয্যার একপ্রান্তে বসিল। মনিয়া কহিল, - ভালো হয়ে বসুন...

অবু কহিল—Quite at home হও হে...অমন জড়োসড়ো কেন ?

ব্রজনাথ উঠিয়া বসিল। বসিয়া সে মুখ নত করিয়া রহিল। মুখ তুলিবার শক্তি যেন তার ছিল না ! এ কি আব-হাওয়ার মধ্যে অকস্মাৎ সে আসিয়া পড়িল...

অবু কহিল,—তোমার গান শুনিয়ে দাও, বিবি...

মনিয়া কহিল,—বেল্লিকের মত বকো না, অবু বাবু...চুপ করে বসো।

তারপর মনিয়া হাঁকিল,—বিশুয়া...

একজন ভৃত্য আসিল। মনিয়া কহিল—চার আনার মিঠে পান আন্ শীগগির...

অবু কহিল—থিয়েটারে যাওনি আজ ?

মনিয়া কহিল—না, আজ ছুটি নিচ্ছি ! তারপর ব্রজবাবু...অমন কুণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন যে...এ নরক-পুরীতে এসেচেন বলে বুঝি ?

সত্যই তাই ! কিন্তু মুখে সে কথা বলা চলে না !...

অবু কহিল—ভূমিকা বা আলাপ পরে হবে...এখন গান ধরে দাও বিনা-ভূমিকায়...

—আবার ! মনিয়া সরোষ ভঙ্গিমায় অবুকে ভৎসনা করিল। তারপর আসিয়া ব্রজনাথের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল

ব্রজনাথ কহিল—না, কুণ্ঠা কিসের...আপনার গান শোনবার জন্ম... অবু বললে...

মনিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আমি হুকুমের দাসী...বেশ, এখনি গাইচি ...

পাশে কোণে একটা শেল্‌ফের নীচে বক্স হার্ম্মোনিয়ম ছিল। সেটাকে টানিয়া লইয়া মনিয়া সুর দিল...তারপর কখন গান ধরিয়া দিল...

মনেরে না বুঝাইয়ে নয়নেরে দোষো কেন!
আরে, আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মন-মিলন!...

বহুকালের পুরানো গান! কিন্তু গায়িকার সুরে ও গাহিবার ভঙ্গিমায় এ গান যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিল! ব্রজনাথের বুকটা কি রকম যে কাঁপিতেছিল...এ যেন তারি মনের অতি-গোপন কথা কখন্ তার অলক্ষ্যে মনিয়ার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে! শুধু কি চোখের নেশায় মজিয়া ব্রজনাথ এখানে আসিয়াছে! মনিয়াকে দেখার জন্য এমনি একটা বাসনাই না তার মনে জাগিতেছিল!...তার কথা সারাদিনই যে থাকিয়া থাকিয়া মনে উদয় হইতেছিল! কেন? কেন এমন উদয় হইতেছিল? চোখে তো কত লোককে অমন দেখা যায়—তাদের সকলের কথা এমন ক্ষণে ক্ষণে চপলার চকিত উচ্ছ্বাসের মত মনে কৈ জাগে না তো! তাদের কাছে যাইবার জন্য প্রাণ এমন অধীর হইয়াও ছোটে না তো! এ গান যে লিখিয়াছে, সে কি মিছা কথা লিখিয়াছে? আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মন-মিলন...কিন্তু মনিয়া এ গোপন কথা জানিল কি করিয়া? ব্রজনাথের হাবে-ভাবে এমন পরিচয় তো নিমেষের দুর্ব্বলতার ফাঁকেও এতটুকু ঝরিয়া পড়ে নাই!...

ব্রজনাথের মনে চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছিল! মনিয়া গানের পর গান গাহিয়া চলিল।...ব্রজনাথের চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কোন্ সুরে-রচা পুরীর মধ্যে সে যেন আসিয়া পড়িয়াছে! যখন তার চেতনা ফিরিল, মনিয়া তখন গাহিতেছে,—

নিলাজ নয়নে করি এত লো মানা,—
সে তা শোনে না, সখি, শোনে না...

ব্রজনাথ ভাবিল, না, এ কি মোহ!...এ কি অলস উন্মাদনা...

গানের পর গান চলিল...মনিয়া নিতান্ত অনুগতের মত ব্রজনাথের পায়ের কাছটিতে বসিয়া কত কথা কহিল! তার কতক ভারী সত্য, আবার কতক যেন কেবলি মায়া...বিভ্রম।

রাত্রি বাড়িয়া উঠিতেছিল...সহসা ঘড়ির পানে চাহিয়া ব্রজনাথ কহিল—আজ আসি। অনেক রাত হয়েচে...বারোটা বাজে...

মনিয়া কহিল—আর একদিন দয়া করে আসবেন...কোনো কথা আজ হলো না!

ব্রজনাথ একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আসবো'খন!

অবু কহিল,—সেলাম বিবি সাহেব...

ব্রজনাথ মৃদুস্বরে অবুকে কহিল—কিছু টাকা দাও ওঁকে...এত গান গাইলেন...এই পেশা তো...

অবু কহিল,—না, না, টাকা দিতে গেলে ও আমাকে মারতে আসবে!

—তাও হয় কখনো!...ব্রজনাথ দু'খানা নোট লইয়া অবুর হাতে দিল।

অবু কহিল,—এই নাও বিবিসাহেব, নজরানা !

মনিয়া নোট দু'খানার দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—এ কি অবু বাবু ..না, না, এ যে ভারী অন্যায় হচ্ছে !...

ব্রজনাথ কহিল—না, না, রাখুন। নাহলে...

মনিয়া কহিল—আপনার কথা ঠেলতে পারি না...তবে, ভারী বেদনা দিলেন !...আমি তো আপনার কাছে টাকার প্রত্যাশী নই। দুটো গান শুনিয়ে একটু আনন্দ দেওয়া...এর জন্য...তবে আপনি বলচেন, কাজেই...

অবু কহিল,—রেখে দাও বিবি সাহেব—নাহলে ব্রজবাবু দুঃখিত হবেন।

—অগত্যা। বলিয়া মনিয়া নোট দুখানা হাতে রাখিল।

তারপর নীচে নামিয়া মোটরে চড়িয়া ব্রজনাথ কহিল—বাচলুম।

অবু কহিল—কেন, ভালো লাগলো না ?

ব্রজনাথ কহিল—না, ভাই। অর্থাৎ গান বেশ, তবে বুক এমন কাঁপছিল সারাক্ষণ...

অবু কহিল,—Coward !

ব্রজনাথ কহিল,—মানি। কি করবো ?...কেবলি মনে বাজছিল, what she is...

অবু চুপ করিয়া রহিল। ব্রজনাথ কহিল,—তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাই...কি বল ? অনেক রাত হয়ে গেছে।

অবু কহিল—বেশ।

শ্যামবাজারের মোড়ের কাছে অবুর বাড়ী। গাড়ী আসিয়া অবুর বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। দ্বার বন্ধ ছিল। অবু নামিয়া কড়া নাড়িতেই

কে আসিয়া দ্বার খুলিল। ব্রজনাথের গাড়ীতে ড্রাইভার ষ্টার্ট দিতেছিল; ষ্টার্ট হইল না। কোথায় বুঝি কোন্ যন্ত্রটা বিগড়াইয়া বসিয়াছিল! ব্রজনাথ কহিল,—কাল সকালে যেয়ো...ঐখানেই চা খাবে...

এমন সময় ওদিকে দ্বার খুলিতেই সামনে এক কিশোরীর আবির্ভাব! হাতে তার হারিকেন লণ্ঠন! সেই আলোয় কিশোরীর রূপের ছটা... পূর্ণিমার মতই চারিদিক যেন আলো করিয়া তুলিয়াছে! যেমন রূপ, তেমনি শ্রী, তেমনি দেহের গঠন...ব্রজনাথ অবাক্ হইয়া গেল। সে ডাকিল—অবু...

অবু ফিরিল। ব্রজনাথ কহিল—এটিই তোমার বোন?

অবু কহিল,—হ্যাঁ ভাই।

কিশোরী চোখ তুলিয়া চাহিল, চকিতের জন্য! চাহিবামাত্র ব্রজনাথের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিল। সে চলিয়া যাইতেছিল। অবু তাকে ডাকিল,—নীলু...এদিকে আয় তো...

কিশোরীর নাম নীলিমা। নীলিমা মুখ নত করিয়া দাঁড়াইল। অবু তার চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া কহিল,—ছাখো তো ভাই, আমার বোন সুন্দরী নয়? তবু কোনো ছুঁচো পছন্দ করেও অমনি নিতে চায় না,...চার-পাঁচ হাজার টাকা হাঁকে! বিশেষ ঐ যাঁরা স্বদেশীর পাণ্ডা— খদ্দর ছাড়া পরেন না! সেই খদ্দর-পরা ভদ্দররাও সরে পালান্...পল্লী-সংস্কার করবেন! চাঁদা কুড়িয়ে বেড়ানোই সার বুঝেচেন! ভণ্ড!... বলো তো, ভাই, দারিদ্র্যের মধ্যে অভাবের মধ্যেও এই যে শ্রী, এর কি কোনো দাম নেই?

'আছে, আছে, আছে!...ব্রজনাথের সমস্ত অন্তরাত্মা প্রবল স্পন্দনে

জাগিয়া উঠিয়া কহিল, আছে, আছে, এ রূপের দাম আছে! মুখে তার কোনো কথা ফুটিল না। এই রূপ দেখিয়া সে একেবারে মুগ্ধ তন্ময় নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল!...কি এ মাধুরী...নিমেষ-পূর্ব্বে যে দুষ্ট আব-হাওয়ার কালি তার সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া গিয়াছিল...এ রূপের জ্যোৎস্না-ধারায় সে কালি চকিতে মুছিয়া গেল!...

গাড়ীর যন্ত্রগুলা চঞ্চল হইয়া সশব্দে জানাইল, আরো সিধা হইয়াছে! ড্রাইভার ষ্টীয়ারিং ঘুরাইল—গাড়ী চলিয়া গেল। ব্রজনাথ ফিরিয়া দেখে,—বাড়ীর দ্বার-প্রান্ত হইতে কিশোরীর রূপের আলো অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! তা গেলেও তার রেশ...বাকী পথটুকু ব্রজনাথের শিরায় শিরায় সে রেশ কি আনন্দের মূর্চ্ছনাই না জাগাইয়া তুলিল!

তারপর সে-রাত্রিটা কি আবেশেই যে ব্রজনাথকে বিবশ-বিহ্বল করিয়া রাখিল! লণ্ঠনের সেই স্তিমিত আলোর আড়ালে রূপের সেই চকিত আভাষ—কালো চুলের রাশির মাঝখানে ঢল-ঢল সেই মুখখানি...সে মুখে আনন্দের খুব একটা প্রদীপ্ত ছটা নাই, গভীর বিষাদের ছায়ায় সকরুণ, ম্লান...সে মুখ যে-কোনো মনের দর্পণে নিমেষে বিম্বিত হইয়া ওঠে এবং বিম্বিত হইয়া চকিতে সরিয়া অদৃশ্য হয় না, বেশ সুগভীর রেখায় অঙ্কিত রহিয়া যায়! লক্ষ্মীছাড়া অভাব-পীড়িত অবুর ঘরেও এমন রূপের শ্রী বিরাজ করিতেছে!

আর ঐ রূপ, ঐ শ্রী দেখিয়াও পাষণ্ড বরের দল টাকার ফর্দ্দ দিতে কুণ্ঠিত হয় না! এমন বর্ব্বর, এমন ইতরও মানুষ হইতে পারে!...ছি!...

আকাশে ছোট এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছিল—মৃদু অস্পষ্ট তার জ্যোৎস্নার আলোয় চারিধারে এক স্বপ্নময় ভাব ফুটিয়াছিল! আলো-ছায়ায়

লেখা অপরূপ ছবি...ঘুমে-জাগরণে মেশা স্বপ্নের আবেশের মত! পথের ধারের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ব্রজনাথ আকুল নেত্রে এই আলো-ছায়ায় ঘেরা বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। দূরে এত রাত্রেও কে গান গাহিতেছিল,—

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে!

ব্রজনাথের বুক দুলিয়া উঠিল। কৈ, আকাশের কোথাও তো মেঘ নাই, তবু 'সেই সজল কাজল আঁখি' মনের আশে-পাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছে!...নিজেকে আজ এমন নিঃসঙ্গ একা মনে হইতেছিল যে, সে নিঃসঙ্গতার চাপে নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে! এমন একলা, এমন নিঃসঙ্গ মানুষ থাকিতে পারে কখনো? এ-ভাবে আর খানিকক্ষণ থাকিলে বুঝি সে পাগল হইয়া যাইবে,...না হয়...এই দুর্ব্বার মত্ততার ঘোরে তার মাথায় খুন চাপিয়া যাইবে! বিরাট দাবানলের মত জ্বলিয়া সে এ নীরবতা, এই নিঃসঙ্গতাকে দুই পায়ে মাড়াইয়া হত্যা করিবে! তার মাথা ঝন্ ঝন্ করিতেছিল...ওদিকে গায়ক তখন গাহিতেছিল,—

অধর করুণামাখা
মিনতি-বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়-খনে...

ঠিক, ঠিক! আকাশে-বাতাসে এ যেন তারি প্রাণের বেদনা হা-হা স্বরে কাঁদিয়া ফিরিতেছে! সেই মুখখানি...সেও যে কি মিনতি-

বেদনা-আঁকা, সে অধর কি করুণা-মাখা, আর সেই নীরবে চাহিয়া থাকা...ব্রজনাথের সারা চিত্ত আকুল উন্মাদ হইয়া উঠিল। তার মনে হইল, প্রাণের অশ্রু উজাড় করিয়া উহারি পায়ে সে ঢালিয়া দিবে! দিয়া বলিবে, ওগো রূপসী করুণাময়ী, এ দারুণ নিঃসঙ্গতার হাত হইতে আমায় পরিত্রাণ কর! বাঁচাও, বাঁচাও আমায়—নহিলে আমি পাগল হইয়া যাইব,—আর পাগল হইয়া কি যে করিব, তার কিছুই বুঝিতেছি না...

পথ দিয়া একখানা ছ্যাকরা গাড়ী ঝড়্ ঝড়্ শব্দে ছুটিয়া গেল। তার ঘোড়া দুটার পিঠে শপাশপ চাবুক চালাইয়া গাড়োয়ান ঘোড়ার পায়ের বল যেন চতুর্গুণ বাড়াইয়া দিয়াছে! এই বিশ্রী এলোমেলো শব্দে ব্রজনাথের বিভ্রম ফ্যাঁশ করিয়া ফাঁশিয়া গেল! সে আসিয়া শয্যায় বসিল; বসিয়া ভাবিল, পাগলামি করিয়া কোনো লাভ হইবে না, তার চেয়ে ধীরভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে...

তাই হইল। ব্রজনাথ কল্পনা করিতে লাগিল, এই রাতটিতে চারিদিক হইতে এই যে আবেশ-বিহ্বলতা আসিয়া তাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, ইহার মধ্যে সেই কিশোরীকে যদি তার একান্ত কাছে আজ সে পাইত!...কল্পনার রঙীন তুলি বুকের মধ্যে ছবির পর ছবি ফুটাইয়া চলিল, আর সে ছবির আভাষ পাইয়া ব্রজনাথের মন লোলুপ হইয়া উঠিল.. অবুর কাছে কাল প্রাণের মিনতি জানাইয়া সে ভিক্ষা চাহিবে...তারো তো এত বড় দায়, অতখানি দুর্ভাবনা...এ বাসনা পূর্ণ করা কি এমনি অসম্ভব!

পরদিন অবু আসিল, প্রত্যূষেই। ব্রজনাথ তাকে অতিরিক্ত আদরে অভ্যর্থনা করিল। চায়ের পেয়ালা আসিল...এবং এ কথা, সে কথা

পাড়িবার পর ব্রজনাথ একেবারে সকল দ্বিধা, সব সঙ্কোচ ঠেলিয়া আসল কথাই পাড়িয়া বসিল।...

ব্রজনাথ কহিল,—আমার পক্ষে এ-ভাবে আর একলা পড়ে থাকা দায় হয়ে উঠেচে, অবু! শেষে কি পাগল হয়ে যাবো?...

বিস্ময়ে অবুর দুই চোখ ভরিয়া গেল। বিস্ময়পূর্ণ দুই চোখের দৃষ্টি ব্রজনাথের মুখে নিবদ্ধ করিয়া সে অবাক হইয়া রহিল।

ব্রজনাথ কহিল,—মানে, আমি আবার বিবাহ করতে চাই! এ বাড়ী যেন শ্মশান হয়ে আছে...দেখবার-শোনবারো কেউ নেই...

অবু এ কথার অর্থ সহসা বুঝিল না—তেমনি নির্ব্বাক বিস্ময়ের ভঙ্গীতে ব্রজনাথের পানে চাহিয়া রহিল।

ব্রজনাথ কহিল,—তোমার বোনের বিয়ের জন্য তুমি ভেবে আকুল হয়ে রয়েচো, দুর্ভাবনার তোমার অন্ত নেই...তা, আমার হাতে ..

অবু যেন আকাশ হইতে পড়িল! সে কহিল,—তুমি...মানে...?

ব্রজনাথ কহিল,—এর ভূমিকার প্রয়োজন নেই,...বন্ধুর কাজ কর ভাই, অবু...আমার হাতে তোমার বোনটিকে দিতে পারো...? মানে, আমি তাকে রাজরাণী করে রাখবো...

ঘন কালো মেঘে আকাশ হইতে পৃথিবীর তটভূমি পর্য্যন্ত যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন সহসা বিদ্যুৎ চমকিলে চারিদিক যেমন আলোয় ভরিয়া ওঠে, এবং সে আলোয় সারা জল-স্থল যেমন সুপ্রকাশ হইয়া পড়ে, অবুর মনের আঁধার ঠেলিয়া এ কথায় আলোর তেমনি বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল...নিমেষের আলো! আর সে আলোর রশ্মিতে ভবিষ্যতের এক সমুজ্জ্বল দৃশ্য অবুর চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল। ব্রজনাথের গৃহে

গৃহিণী, তার বোন, নীলিমা,...ওই অগাধ ঐশ্বর্য্য মণিমুক্তা হীরা-জহরতে-রচা সিংহাসন—সেই সিংহাসনে রাজেন্দ্রাণী হইয়া বসিয়াছে তারি বোন, নীলিমা! আর সে...? অভাবের দায়ে পাঁচজনের দ্বারে তার ছুটাছুটির বিরাম হইয়াছে, যত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনার হাত হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে! বন্ধু ব্রজনাথ...সে হইয়াছে তার পরমাত্মীয় প্রাণের জন! এ যে আলোর রাশি...কিন্তু...ব্রজনাথের সেই স্ত্রী? সে আসিয়া আবার যখন পাটরাণীর আসনখানি অধিকার করিয়া বসিবে...?

ব্রজনাথ কহিল—কি বল ভাই?...আমি কি এমনি অযোগ্য...তার স্বরে রাজ্যের করুণ মিনতি যেন ঝরিয়া পড়িল!

অবু কহিল,—বুঝি ভাই, সব। এ তার পক্ষে মস্ত সৌভাগ্যের কথা, মানি। তার অতি বড় তপস্যার ফল, এ! কিন্তু...

ব্রজনাথ কহিল,—বুঝেচি, তোমার কোথায় বাধচে! আমার সেই স্ত্রী? কিন্তু তাকে তো আমি ত্যাগ করেচি! সে কি স্ত্রী? জীবনে কখনো তার কাছ থেকে এতটুকু দরদ, এতটুকু মমতা পাইনি! আমার জীবনে সে প্রচণ্ড অভিশাপ!...দরদ, সহানুভূতি, সান্ত্বনা...এ তো দূরের কথা! চিরদিন দীপ্ত দাহে সে আমার মনে বেদনাই দেছে! তার সঙ্গে কোনো কালেও আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না, হবেও না,—নিশ্চয়! এই অবধি বলিয়া সে স্থির হইয়া অবুর পানে চাহিয়া রহিল। অবুও নির্ব্বাক্। ব্রজনাথ আবার কহিল,—আমার এ কথা বিশ্বাস হয় না?

অবু কহিল,—মাকে বলি...

ব্রজনাথ কহিল,—যেমন-তেমন বলা নয়...আমার প্রাণের বেদনা

অনুভব করে যথার্থ অকপট বন্ধু হয়ে ব্যথা বুঝে দরদ করো। আমার মিনতি তাঁকে জানিয়ো, ভাই! কাল তোমার বোনকে দেখে অবধি আমি যে কি অধীর, কি ব্যাকুল হয়েচি! আমার এত-বড় বাড়ী খালি পড়ে আছে...তোমার ভগ্নীকে আমার হাতে দাও...তার কল্যাণ-হাতের স্পর্শে প্রাণ জেগে উঠুক!...নাহলে আমার সব ছারখার হয়ে যায় একটা জীবন...আমার এ জীবনটাকে এমনি হেলায় নষ্ট করবো! তুমি আমার এ জীবনকে বাঁচিয়ে তুলবে না—অবু? উচ্ছ্বসিত আবেগে ব্রজনাথ অবুর দুই হাত সস্নেহে চাপিয়া ধরিল।

অবু কহিল,—আচ্ছা, যাতে এ বিবাহ ঘটে, আমি তা করবো.. এ তো তোমাকেই শুধু সুখী করা হবে না, ভাই—আমাদের বিপন্ন পরিবারকেও তুমি যে এই দয়ায় কিনে রাখবে।

"নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর !............"

—রবীন্দ্রনাথ।

৬

সেই ঘর। আজ আর নিঃসঙ্গতার জমাট বাষ্পে, বিষাদের করুণ ম্লানিমায় তার ক্ষুদ্র কোণটুকুও আচ্ছন্ন নাই! চারিদিকে হর্ষ-আনন্দের এক উত্তাল তরঙ্গ! পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে এ ঘর আজ সজীব, চঞ্চল! আকাশে সেই চাঁদ,—আজ তার দীন পাণ্ডু ছিন্ন অংশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং জ্যোৎস্নার ধারায় সারা বিশ্ব আজ কাণায় কাণায় ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে!

ঘরের মধ্যে সেই শয্যা...শয্যার উপর বসিয়া কিশোরী নীলিমা। রাজেন্দ্রাণীর মূর্ত্তি! আর তার পাশে বসিয়া ব্রজনাথ। ব্রজনাথ বলিল—কথা কও, নীলিমা, তোমার মুখের একটী কথা শোনবার জন্য আমি যে কত আকুল...

নীলিমা তার ডাগর ছুটী চোখ তুলিয়া ব্রজনাথের পানে চাহিল। এ চোখের দৃষ্টিতে সে করুণ মায়া আজো তেমনি আছে! ব্রজনাথ সেই চোখ ছুটীর পানে চাহিয়া চাহিয়া কেমন বিহ্বল হইয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের কোথায় আঘাতও একটু লাগিল! সে কহিল, তোমায় তোমার গৃহকোণ থেকে টেনে এনে তাহলে কি বেদনাই দিলুম, নীলিমা? শুধু অপরাধই করলুম...তোমার কোনো বেদনা কি একটুও লাঘব করতে পারলুম না?

ব্রজনাথের সমস্ত অন্তর অশ্রুর তরঙ্গে উছলিয়া উঠিল। নীলিমার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে সাগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া আবেগোচ্ছ্বসিত স্বরে সে কহিল,—বল নীলিমা, কি করলে তুমি সুখী হবে! তোমার নিজের বাড়ীতে যদি তোমায় রেখে আসি? বল...বল...তার স্বরে এমন আকুলতা...যে, নীলিমারও দুই চোখের কোণে অশ্রু ঠেলিয়া আসিল। সে কহিল,—না।

ব্রজনাথ কহিল,—কি না নীলিমা? তোমার বাড়ীতে তুমি যাবে না?

নীলিমা কহিল,—না।

ছোট্ট মৃদু স্বরটুকু! নীলিমা মুখ নামাইল।

ব্রজনাথ কহিল,—আমি তোমায় বিবাহ করেচি বলে তুমি সুখী হওনি? তোমায় দুঃখ দিছি বিবাহ করে...? আকুল আগ্রহে ব্রজনাথের সারা চিত্ত ছোট একটু উত্তরের প্রতীক্ষায় উন্মাদ হইয়া উঠিল!

নীলিমা কহিল,—না।

আবার সেই না! ব্রজনাথের মন আকুল হইয়া উঠিল,—ওগো, কথা কও, তুমি কথা কও...কথা কহিয়া ব্রজনাথের পুঞ্জিত বেদনা-ব্যথা মুছিয়া দাও...

ব্রজনাথ কহিল,—তা, দুঃখ যদি পাওনি, তবে কথা কইচো না কেন?

নীলিমা চকিতের জন্য ব্রজনাথের পানে ফিরিয়া চাহিল, তারপর কহিল— ভয় করে!

ভয়! ওগো বরাভয়প্রদা, ওগো অভয়া, তোমার ভয়! ব্রজনাথকে?

ব্রজনাথ কহিল,— কাকে ভয় করে? আমায়?

নীলিমা কহিল,—না।

আবার সেই না! ভগবান, এমন সুন্দর মুখে আর কি কোনো কথা দাও নাই! এমন পাষাণ তুমি!...রূপের এই স্থির বিদ্যুল্লতা...

ব্রজনাথ বিহ্বল হইয়া উঠিল। সবলে দুই বাহু দিয়া নীলিমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া তার অধরে চুম্বনের পর চুম্বন বর্ষণ করিয়া ব্রজনাথ কহিল,—কোনো ভয় নেই, নীলিমা...শ্রীহীন শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডটাকে তোমার আদরে স্নেহে দরদে মমতায় আবার ফলে-ফুলে ভূষিত করে তোলো! বজ্রদগ্ধ হলেও এ বৃক্ষের সরসতা এখনো নষ্ট হয়নি...তোমার রূপের জ্যোৎস্না-ধারায় তার বুকের এ দাহের ক্ষত আরোগ্য হবে, তোমার প্রেমে, তোমার মমতায় তার সব দুঃখ দূর হবে!...

নীলিমা কোন জবাব দিল না, শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

ব্রজনাথ কহিল,—এই ঘর, এ ঘরের সকল ঐশ্বর্য্য, এ ঘরের সমস্তর মালিক আমি...সে-সব তোমার পায়ে নিবেদন করে দিলুম...বলিতে বলিতে ব্রজনাথ শয্যাতলে নীলিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

নীলিমা ধড়মড়িয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া ব্রজনাথের হাত ধরিয়া সরাইয়া নিজেও একটু সরিয়া গিয়া কহিল,—ছি, ও কথা বলতে নেই...স্বামী গুরুজন...

ব্রজনাথ বলিল,—গুরুজন! না নীলিমা, আমি গুরুজন নই, কোনোদিন তোমার গুরুজন হতেও চাই না। আমি তোমার প্রাণের দ্বারে অতিথি,—তোমার স্নেহের কাঙাল, তোমার [illegible] তোমার প্রীতির জন্য লালায়িত, তোমার মমতার ভিখারী

নীলিমা চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্বামী-স্ত্রীর যে পরিচয় সে জানে, তার সঙ্গে এর কোনখানটাই যে খাপ খায় না! নিজের গৃহে তো

সে দেখিয়াছে, দাদার সামনে বৌ-ঠাকরুণ কি ভয়ার্ত্ত করুণ মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, অহরহ একটা কুণ্ঠিত ত্রস্ত ভাব! স্বামী স্ত্রীলোকের ভয়ের বস্তু, এই সে জানে! শুধু শাসন, আর ভৎর্সনা! পাণ হইতে চূণটুকু খসিলে রসাতল বাধিয়া যায়! আর এ তার চোখের সামনে...

ব্রজনাথ কহিল,—এসো, একটু গান শুনবে। গান শুনতে ভালো লাগে?

ঘাড় নাড়িয়া নীলিমা জানাইল, লাগে।

ব্রজনাথ নীলিমার হাত ধরিয়া আগাইয়া আসিয়া তাকে একখানি কৌচের উপর বসাইয়া দিল। কৌচের পাশেই একটা টেব্‌ল্‌ হার্ম্মোনিয়ম ছিল। হার্ম্মোনিয়মের সামনে বসিয়া ব্রজনাথ তার মূর্চ্ছাতুর দেহে অঙ্গুলি-তাড়নে জীবনের স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল। হার্ম্মোনিয়ম সে নিপুণ অঙ্গুলি-স্পর্শে জাগিয়া সুরের ফোয়ারা খুলিয়া দিল, আর তারি ধারায় কণ্ঠের সুর মিশাইয়া ব্রজনাথ গান ধরিল—

> মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
> সখি, জাগো জাগো...
> মেলি রাগ-অলস আঁখি
> সখি, জাগো, জাগো!...

এই অবধি গাহিয়া ব্রজনাথ গান থামাইয়া নীলিমার পানে চাহিল। নীলিমা তারি পানে চাহিয়া উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতেছিল। ব্রজনাথ চাহিবামাত্র দুইজনের চোখে-চোখে দৃষ্টি মিলিল। নীলিমা চোখ নামাইল

ব্রজনাথ কহিল,—গানটা সব শুনচো তো! মানেটুকু বুঝে নিয়ো...
এইটুকু বলিয়া ব্রজনাথ আবার গাহিল,—

আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগো ফাগুন-গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে,—
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি
'সখি, জাগো জাগো!'...

গাহিতে গাহিতে ব্রজনাথ নীলিমার পানে চাহিতেছিল। এটুকু গাহিয়া ব্রজনাথ আবার কহিল,—তোমাকেই আমার নিবেদন জানাচ্ছি, কবির প্রাণ-গলানো কথায়...বুঝচো?

লজ্জার মৃদু হাসি হাসিয়া নীলিমা আবার মুখ নামাইল। ব্রজনাথ আবার গাহিল,—

জাগো নবীন গৌরবে,
নব বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয় বীজনে
জাগো নিভৃত নির্জ্জনে!
জাগো আকুল-ফুল সাজে......

ব্রজনাথের কণ্ঠ ভালো! এমন গান—তার উপর প্রাণের সমস্ত আবেগ মিশাইয়া সে এ গান গাহিয়া শেষ করিল। গান থামিলেও তার রেশ সারা ঘরের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল!

ব্রজনাথ কহিল,—পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-বেদনা, সব কোলাহল দূরে রেখে সব ব্যথা ভুলিয়ে দিয়ে আমার এই খালি বুকখানি তুমি ভরিয়ে তোলো, নীলিমা, শুধু এমনি সুরে-সুরে...এ বুকে জাগিয়ে তোলো শুধু ওই পিকের কলরব, ফাগুনের গৌরব আর বকুলের সৌরভ! দু'জনের বুকের উপর দিয়ে বয়ে যাক্ শুধু মৃদু মলয়। (সংসার যেখানে যাবার যাক্।) তার পানে তাকিয়ে থাকবার আমাদের কোনো দরকার নেই! এ সংসারে আমাদের কি রইলো, কি গেল, তা দেখবারো আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই! তোমার চোখের সামনে থাকবো শুধু আমি, আর আমার চোখের সামনে থাকবে তুমি! আর কিছু আমরা চাইবো না, জীবনে...এ জীবন এমনি ভাবেই কাণায়-কাণায় উপভোগ করি, এসো...

এতখানি কবিত্বের উচ্ছ্বাস! বেচারী নীলিমার সঙ্গে এ কবিত্বের কোনোকালেই কোনো পরিচয় ছিল না। তবে এই নিমেষ-পূর্ব্বে ভাসিয়া-ওঠা সুরের তরঙ্গ, আর ওই ফাল্গুনের প্রণয়-ভীতার প্রাণ-ছোঁওয়ানো মৃদু-মলয়-বীজনে বকুল-সৌরভের উচ্ছ্বাস...এ-গুলা তার মনে কি ভাবের পরশ যে বুলাইয়া দিল!...দুঃখ-দারিদ্র্য, রূঢ় কথার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া এই-সবের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে, এখানে চকিত বিভ্রমের চপল হিল্লোল...এ যেন কোন্ সুদূর অতীতে স্বপ্নে-দেখা মায়ালোক! কৃতজ্ঞতায় তার ছোট বুকখানি ভরিয়া উঠিতেছিল। আদরের এমন উগ্র সমারোহ...এ তার একেবারে অগোচর ছিল! স্বপ্নেও সে কোনোদিন এতখানি আদরের কোনো আভাস পায় নাই...তাই কেমন বিহ্বলতার আবেগে...

ব্রজনাথ কহিল,—এজন্য আয়োজনের কোনো অভাব ঘটবে না, নীলিমা...বলিয়া সে আবার গান ধরিল,—

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না!
মন উড়েছে উড়ুক না রে
মেলে দিয়ে গানের পাখনা!...

...কঠিন মাটি মনকে আজি দেয় না বাধা
সে কোন্ সুরে সাধা;
বিশ্ব বলে মনের কথা,
কাজ পড়ে আজ থাকে থাক্ না!

সুরের পর সুরের ধারা ঢালিয়া ব্রজনাথ শুধু যে নিজেরি দগ্ধ বুককে স্নিগ্ধ শীতল করিল, তা নয়—নীলিমার ব্যথা-জর্জ্জর মনের সামনেও সুরে-রচা এমন এক বিচিত্র কল্পলোকের ছবি আঁকিয়া দিল, আনন্দের এমন সূচনা গড়িয়া তুলিল যে নীলিমা নিমেষে তার বহু-বৎসরের বেদনার স্মৃতি মুছিয়া মনকে প্রস্তুত করিয়া লইল, এই বেদনা-বর্জ্জিত আব-হাওয়ার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ অবাধে ছাড়িয়া দিবার জন্য...

তারপর সুরু হইল, তাদের চন্দ্রালোকিত, বিহঙ্গ-কলরব-মুখরিত, পুষ্পগন্ধোচ্ছ্বসিত জীবনের পথে শুভ সুন্দর যাত্রা! দিবসের কর্ম্ম-কোলাহল তাদের নিভৃত প্রণয়-কুঞ্জের দ্বারে আসিয়া উঁকি-ঝুঁকি করিতে ভীত-ত্রস্ত হয়, সেখান অবধি সে পৌঁছিতেও পারে না! আর শশী-সনাথ শর্ব্বরী...সেও নিত্য নব নব পুষ্প-সম্ভারে ভরা ডালি লইয়া তাদের চরণে নিবেদন করিয়া সার্থকতায় ভরিয়া ওঠে! সে যেন

রূপের-প্রেমের উৎসব-রজনীর এক একটী খণ্ড কাব্য-কাহিনী! সে কাহিনীতে কি বৈচিত্র্য! একাধিক সহস্র আরব-রজনীর কাব্য-, কাহিনীতেও বুঝি এমন উন্মাদনা, প্রাণের এমন স্পন্দন কোনদিন ক্ষণেকের জন্যও জাগে নাই! রূপের সিরাজী রক্ত-চুনীর মত ফেনিলোচ্ছল ধারে জীবনের পাত্রটিকে কাণায় কাণায় ভরিয়া তুলিতেছে, অহরহ! কি আবেশ, কি নেশা সে সিরাজীতে! সংসারের শত কর্ম্মের আহ্বান ব্যর্থ ক্ষোভে এ উৎসব-কুঞ্জের দ্বার-প্রান্ত হইতে ব্যথায় বেদনায় ফিরিয়া আসে—তার করুণ কাতর দীর্ঘনিশ্বাস কারো প্রাণ স্পর্শ করে না, তাই সে একান্ত নীরবে ঝরিয়া মরিয়া যায়!

অবু আসিয়া হাঁক পাড়িয়া বলে—তোমার হলো কি হে ব্রজনাথ, বায়োস্কোপের দিকে পাত্তা পাওয়া যায় না, গঙ্গার ধারে ষ্ট্রাণ্ড রোড কাতর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সারা হয়ে আছে...তুমি সে ধার মাড়াও না! ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা এমন বন্দী হয়ে করো কি!

ব্রজনাথ হাসিয়া জবাব দেয়,—তোমার ভগ্নীকে প্রশ্ন করো গে—তিনি যে কি মায়া-জালের সৃষ্টি করে তুলেচেন, দুনিয়ায় আর যে কিছু আছে, সে কথাও আমার মনে থাকে না!

ভগ্নীর প্রসঙ্গে ব্রজনাথের কথায় বাধা দিয়া অবু বলিয়া ওঠে,—থাক, থাক—বোনটা তো পাগল, তেমনি তুমিও...দুই পাগলে মিলেচে ভালো!

আরো এ-কথা, ও-কথা তোলা শেষ হইয়া গেলে অবু ঝুম করিয়া কাজের কথা পাড়িয়া বসে, বলে, ছেলেটার অসুখের জন্য ডাক্তার আর ওষুধের জ্বালায় হাত খালি হইয়া গিয়াছে—সংসার তার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিরাট মুখ মেলিয়া হাঁ করিয়া আছে...কি যে করি...

অর্থাৎ ঘরে চাল বাড়ন্ত, গোয়ালা ভারী তাগিদ সুরু করিয়াছে। টাকার জন্য পাগল হইয়া তাকে সংসার ছাড়িয়া সুদূর গভীর অরণ্যে-পর্ব্বতে পলাইয়া বুঝি-বা প্রাণ বাঁচাইতে হয়!...

ব্রজনাথ নিঃশব্দে অবুর হাতে টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলে,—কিছু মনে করো না, ভাই...নিয়ে যাও। কাকেও বলো না...

নিষেধের একটা অভিনয় সারিয়া লইয়া হাসি চাপিয়া অবু বলে,—না ভাই, তোমার উপর এ-ভাবে জুলুম...কুটুম্ব...তায়, কি প্রচণ্ড দায়ে বাঁচিয়েচো! আমাদের...এখনো...কি যে করি! তবে তোমার অনুরোধ...কাজেই নিতে হয়, না হলে...

ব্রজনাথ বলিয়া ওঠে—চুপ, কোনো কথা নয়!

অবু তবু জবাব দেয়,—তোমার দয়া...

ব্রজনাথ শেষে কহিল—ও কথা নয়। তুমি যে কি ঋণী করেচো আমায়, অবু...আমার মরা প্রাণটাকে শুধু কি বাঁচিয়েই তুলেচো? রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ...কতখানি জীবনের জোগান দিয়ে আমার মনকে জাগিয়ে নানা শোভায় তাকে সজ্জিত পরিপূর্ণ প্রাণবন্ত করে তুলেচো...

অবু মনে মনে হাসিয়া বিদায় লয়। যাইবার সময় একবার বলে—নীলি ভালো আছে তো? তার সঙ্গে দেখা...তাইতো...পাগলীটা বোধ হয় বেজায় অভিমান করবে! তা তাকে যেন বলো না যে আমি এসেছিলুম...আর এক সময় এসে পাগলীর সঙ্গে দেখা করে যাবো তখন! যে রকম অসুখ-বিসুখের উপদ্রব তার উপর এই দারুণ অভাব,...সমস্তর চাপে মারা গেলুম...তাহলে আজ আসি, ভাই!

ব্রজনাথ তাকে হাসি-মুখে বিদায় দিয়া স্বপ্ন-দিয়া-রচা প্রণয়-কুঞ্জে তখনি ছোটে, প্রিয়ার পাশটিতে...! মনে মনে ভাবে, অবুকে খুব বিদায় দিয়াছি! না হইলে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া এখনি কোথা টানিয়া লইয়া যাইত—আর সব আরাম হইতে এখনি আমায় বঞ্চিত করিত!

২

বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। দোতলার ঘরে অর্গানের সামনে চেয়ারে বসিয়া নীলিমা, পাশে ব্রজনাথ। নীলিমার সামনে স্বর-লিপির বহি খোলা। ব্রজনাথ কহিল,—শুধু বাজনা নয়, নীল্...বাজনার সঙ্গে গান গাইতে হবে...

নীলিমা কুণ্ঠিতভাবে হাসিল, হাসিয়া কহিল,—লজ্জা করচে যে...

ব্রজনাথ কহিল,—মিস্ রায়ের কাছে তো লজ্জা করে না! আর আমার সামনেই...

নীলিমা কহিল,—বা, মিস্ রায় যে মেয়ে মানুষ!

ব্রজনাথ অভিমানের ভাণ করিল; অভিমানের ভাণেই কহিল,—বুঝেচি নীল, আমার চেয়ে তুমি মিস্ রায়কেই তাহলে বেশী ভালোবাসো...কথাটা বলিয়া গম্ভীর ভাব দেখাইয়া ব্রজনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

নীলিমা বেদনাতুর নেত্রে ব্রজনাথের পানে চাহিল। ভয়ে তার মুখ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

ব্রজনাথ তা দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল। ঐ বেদনাতুর চোখের দৃষ্টিতে রাজ্যের কত করুণ শ্রী যে ফুটিয়া উঠিল! আবেগে সে নীলিমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া তার অধরে চুম্বন করিয়া কহিল,—আমার অভিমানিনীর মুখখানি মলিন হয়ে গেল যে! পাগলী...

চির-দুঃখের আঁধারেই যার দিন কাটিয়াছে, এ আদরে তার প্রাণ সচকিত করিয়া কতকালের পুঞ্জিত বেদনার অশ্রু চোখের কোণে আসিয়া স্তম্ভিত থাকিতে পারিল না—বড় দুটী মুক্তা ফুটাইয়া তুলিল। ব্রজনাথ তা দেখিয়া গলিয়া গিয়া কহিল,—ছি, এতে কাঁদে কি!

নীলিমা ব্রজনাথের বুকে মুখ লুকাইয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। এত আদর, এ সোহাগ...এ যে জন্ম-জন্মান্তরের কামনার বস্তু! এত বড় আশা যে তার প্রাণের কোনো কোণেও কোনোদিন এতটুকু আভাস ফুটাইতে পারে নাই...

ব্রজনাথ নীলিমার চিবুক ধরিয়া সস্নেহে তার মুখের পানে চাহিল, কহিল,—কেঁদো না, লক্ষ্মী মাণিক আমার...

নীলিমা বাষ্পার্দ্র স্বরে কহিল,—কেন তুমি নিশ্বাস ফেল্‌লে অমন করে!

ব্রজনাথের প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল। তার ছোট্ট একটু নিশ্বাস, তা'ও ছলের নিশ্বাস...সে নিশ্বাসটুকুতেও নীলিমার বুকে এমন ব্যথা বাজিয়াছে! সে নীলিমার অধরে আবার চুম্বন করিল, তারপর বলিল,—আমি একটু খেলা করছিলুম...

নীলিমা মুখ ফিরাইয়া কৃত্রিম রোষের ভঙ্গীতে কহিল,—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু...কেন অমন করলে! ফের এবার যদি অমন করে নিশ্বাস ফ্যালো...

হাসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—তাহলে কি শাস্তি দেবে? বল...খুব কঠোর, নির্ম্মম শাস্তি! না?

নীলিমা হাসিয়া ফেলিল। তার চোখের জল তখনো শুকায় নাই।

সেই অশ্রুর মাঝে এই হাসি...ব্রজনাথ ভাবিল, সে যদি কবি হইত, তাহা হইলে এ মাধুরী দুনিয়ার সামনে ছন্দে গাঁথিয়া দেখাইয়া দিত! ব্রজনাথ কহিল,—শাস্তি দেবে, তাহলে?

হাসিয়া নীলিমা কহিল,—দেবোই তো...

ব্রজনাথ কহিল,—কি শাস্তি, নীল...? বলো,...লক্ষ্মীটি...

নীলিমা কহিল,—বলবো না তো...তখন দেখবে...

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ! তারপর সুরে গাহিল—

আকুল আঁচলে পথিক চরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো!...
...শুধু হাসিখানি আঁখিকোণে হানি
উতলা হৃদয় ধাঁধিয়ো!...

নীলিমা মুগ্ধ নয়নে ব্রজনাথের পানে চাহিয়া রহিল। তার দুই চোখে গভীর আবেশ!...

মুগ্ধ ব্রজনাথ মৃদু কণ্ঠে আবার গাহিল,—

ওহে সুন্দর মরি মরি,
তোমায় কি দিয়ে বরণ করি?
তব ফাগুন যেন আসে
আজি মোর পরাণের পাশে
দেয় সুধা-রস ধারে-ধারে
মম অঞ্চল ভরি ভরি!

নীলিমা হাসিয়া উঠিল, হাসিয়া কহিল,—বা রে, বেশ মাষ্টার তো! এমনি করেই গান শেখাবেন আমাকে! হয়েচে! নিজেই গান গাইচেন খালি খালি...

ব্রজনাথ কহিল,—এ্যাঁ, আমার পাষাণীর পাষাণ-মনে দয়া হয়েচে! গান গাইবে, তাহলে!...সত্যি, গাও নীল...আমার ভারী দুঃখ হয় যে, আমার সামনে গাইতে কেন তুমি এমন কুণ্ঠিত হও!...মিস্ রায় কি বলছিলেন, জানো?...ব্রজনাথ চুপ করিল।

নীলিমা কহিল,—কি বলছিলেন?

ব্রজনাথ কহিল,—বলছিলেন, তোমার সুর ভারী মিষ্টি...আর অল্প সময়েই তুমি যা শিখেচো, তাতে তিনি শুধু যে অবাক হয়েচেন তা নয়, মনে তাঁর গৌরব হয়েচে অনেকখানি!...

নীলিমা কহিল,—বটে! তার প্রাইজ...?

ব্রজনাথ কহিল,—কি চাও, বলো...কি তোমায় দিই নি নীল...? আর আমার দেবার কি আছে...? তার স্বরে আবেশের সেই মুগ্ধ সুর!

নীলিমা কহিল,—এ কথা বলতে রবিবাবুর গানের শরণ নিলে না যে ..

ব্রজনাথ কহিল,—চাও...? তা'ও আছে। আমাদের প্রাণের কবি তরুণ প্রাণের হর্ষ-বেদনা কি-ভাবেই না অনুভব করে সুরে গেঁথে দিয়েচেন...বলিয়া ব্রজনাথ সুর ধরিল,—

......মম প্রাণ-মন-যৌবন নব,
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
ভিখারী, আমার ভিখারী!
হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই।
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই?

গান শুনিতে শুনিতে নীলিমার বুকের মধ্যে চিরদিনকার সঞ্চিত অশ্রু সাগরের তরঙ্গ তুলিল। এত সুখ, এত আদর! কাঙালিনীকে এ যেন কোন্ দেবতা বর দিয়া ইন্দ্রাণী করিয়া তুলিয়াছেন! এ সত্য...না, পাগল মন স্বপ্ন দেখিতেছে? দুটো পয়সার অভাবে যাকে সহস্র চক্ষুর সামনে ধরিয়া দিলেও কেহ গ্রহণ করে নাই...গৃহের কোণে অভিশাপের মত যে পড়িয়াছিল, যার চোখের সামনে হইতে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের সব আলো নিবিয়া গিয়াছিল, তার ভাগ্যে এত সুখ সহিবে তো?...অতি-কষ্টে রোধ-করা নিশ্বাস প্রাণের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আর্ত্ত বেদনায় ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ব্রজনাথ তা লক্ষ্য করিল; লক্ষ্য করিয়া কহিল,—এবার আমার পালা। তুমি নিশ্বাস ফেললে কেন?...

নীলিমার দুই চোখ তখন কম্পিত হইয়া উদ্গত অশ্রুর বেগ রোধ করিল। সে কহিল,—কত কথা মনে পড়ছিল...

ব্রজনাথ কহিল,—কি কথা নীল?

নীলিমা কহিল,—পুরোনো কথা।

ব্রজনাথ বিস্মিতভাবে কহিল,—পুরোনো কথা!

নীলিমা কহিল,—হ্যাঁ, কি অন্ধকারের মধ্যেই পড়েছিলুম, ধূলায় হীন আবর্জ্জনার মত! কেউ ফিরে তাকায়নি, দুই পায়ে মাড়িয়ে পথ চলেছিল! তোমার অপার করুণা—তুমি, আমায় সুখের স্বর্গে এনে তুলেচো! তাই ভাবছিলুম,...একটা অকল্যাণের বিভীষিকা নীলিমার চোখের সামনে তার বড় কালো পাখা মেলিয়া দাঁড়াইল, উৎসবের আলো সে পাখার আড়ালে যেন ম্লান হইয়া উঠিল! ভয়ে তার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, কথা শেষ হইল না।

ব্রজনাথ সস্নেহে কহিল,—তাই কি ভাবছিলে?

নীলিমা কহিল,—এ সুখ আমার সইবে তো?...নীলিমা আবার নিশ্বাস ফেলিল।

ব্রজনাথ বেদনার্ত্ত স্বরে কহিল,—আবার ঐ সব যা-তা ভাবো তুমি! তোমায় বলেচি তো নীল, সর্ব্ব-হারা অভাগা দীন রিক্ত আমি, আমায় তুমি ধূলিশয্যা থেকে তুলে রাজার সিংহাসনে বসিয়ে দেছ! তোমার এই মায়া, এই মমতা, এই দরদ, এই ভালোবাসা, এই রূপ, এই শ্রী...আমার প্রাণ যে কাণায় কাণায় ভরে উঠেচে...আমি তো জীবনটাকে ঠেলে ফেলছিলুম, দুঃখে, অবজ্ঞায়, পথের ময়লা ধূলোর মধ্যে...সে ধূলো থেকে, তুলে তুমি আমার এ জীবনকে রাজার বেশে সাজিয়ে দিয়েচো...তুমি মোরে করেছ সম্রাট! ছি নীল, পিছন-পানে তাকিয়ো না! অতীত দুঃখের স্মৃতিকে তার মাটীর কবর থেকে টেনে তুলে এই আলোকোজ্জ্বল বর্ণ-বিভবকে ভীত চকিত করে তুলো না...সংসার তোমার মূল্য বোঝেনি, তাই অবজ্ঞাত আঁধার কোণে তোমায় পড়ে থাকতে হয়েছিল...যাক, ও-সব কথা আবার কেন? তোমায় বলেচি তো, জীবনের পূর্ণপাত্র ভাগ্য আমাদের সামনে ধরেচে, আজ! এসো, দু'জনে তা থেকে যত মধু, যত সুধা নিঃশঙ্ক হয়ে নিঃশেষে পান করি...কেন এ সুখ চিরদিন থাকবে না? কারো কোনো ক্ষতি আমরা করিনি তো! এই অবধি বলিয়া সে স্তব্ধ হইল এবং ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিল,—এখন এ-সব আলোচনা রেখে তুমি গান গাও...যে-গান কাল শিখেচো...একটু পরেই মিস্ রায় আসবেন। তাঁর আসার আগে ও-গানটা ভালো করে রপ্ত করেও নাও...

নীলিমা অর্গানের রীড টিপিল ব্রজনাথ কহিল,—সুর দাও, দিয়ে গাও...

নীলিমা গাহিল—অতি মৃদু স্বরে...লজ্জায় জড়িত—বেদনার ভিড় ঠেলিয়া সে স্বর যেন আর বাহির হইতে চায় না! জোর করিয়া বেদনার পাথর ঠেলিয়া নীলিমা গাহিল—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে গো ফুল উঠবে।

ব্রজনাথ কহিল,—দেখচো তো, কবি কি বলেচেন—আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে...তবে? কেন তুমি অতীত দুঃখ-ব্যথার স্মৃতি মনে এনে চঞ্চল হও? সে সব ব্যথা আজ রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে যে!

নীলিমা গান থামাইয়া ব্রজনাথের পানে চাহিয়া রহিল। ব্রজনাথ কহিল,—না, না, গাও...কথার ঝড় তুলে সুরের পুরীতে আঘাত দেবো না। গাও, গাও তুমি...চমৎকার হচ্ছে...

নীলিমা আবার গাহিতে লাগিল,—

আমার অনেক দিনের আকাশ চাওয়া
আসবে ছুটে দখিণ হাওয়া.........

৩

হাসি-গানের মধ্য দিয়া যৌবনের উৎসব চলিল—প্রচুর তার সমারোহ! অতীত দিবসের দুঃখ-জ্বালার স্মৃতির কণাও ব্রজনাথের মনে রহিল না! তার চিত্ত-সাগরে আজ জোয়ার আসিয়াছে—যৌবনের সহস্র অপূর্ণ সাধ-আশা সহস্র উপায়ে তাদের তৃপ্তি সাধন করিতে আজ উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে! নীরজা? ছেলেমেয়েরা? তারা যেন জীবনের এক ক্ষুদ্র প্রান্তে আঁধার-কালো ছোট্ট একটু স্মৃতি। সে স্মৃতি এই আলোর সমারোহের মধ্যে কোথায় ম্লান হইয়া নিবিয়া গেছে! ব্রজনাথের মন আজ শুধু বাধাহীন আনন্দে পরিপূর্ণ, মশগুল!

বধূ নীলিমা তার প্রাণের সায়রে শতদল মেলিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে, সারাক্ষণ! তার হাস্যে-ভাষ্যে, তার গতির উচ্ছ্বাসে, তার বর্ণের বিভবে কেবলি মোহ! ব্রজনাথ এই মোহের সুরা পান করিয়া মাতাল হইতে বসিল। এ আনন্দের নিবিড় মোহের আবর্তে পড়িয়া সংসার বলিয়া যে একটা জায়গা কোথাও আছে, সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। যে-সংসার কাব্য-লোকের কোনো সন্ধান না রাখিয়া, তার প্রতি কোনো দরদ না দেখাইয়া অনায়াসে নিজের গতি-পথ ধরিয়া নিত্য চলিতেছে...কোন্ সেই অনাদি যুগ-যুগান্ত-কাল হইতে...সে-সংসারের কথা তার মনেও রহিল না! একদিন মর্ত্যভূমির পাষাণ-কঠিনতা তার বুকে বাজিয়াছে অহরহ, আজ যদি সে-কঠিন পাষাণের বুকে এমন মধুর অবসর ফুলের মত ফুটিয়া

উঠিয়াছে, এবং ফুটিয়া বর্ণে গন্ধে শোভায় এতখানি মোহের সৃষ্টি করিয়া প্রাণটাকে বিভোর করিয়া তুলিয়াছে,—যে বিভোরতায় কেবলি নব-নব আবেশ,—তখন কাজ কি আর পিছনে সে কঠিন পাষাণে-গড়া মর্ত্ত্যভূমির পানে ফিরিয়া চাহিয়া! কোনো দুঃখ নাই, নৈরাশ্য নাই,—এখন সারা বিশ্বে কেবলি আলো, কেবলি গান, কেবলি মধু, কেবলি গন্ধ! নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ বিনিদ্র নিশীথে বেদনার জ্বালায় মর্ম্মে এতটুকু দীর্ঘশ্বাস বহিয়া আনে না! মনও তাই আরামে বর্ত্তাইয়া বাঁচিয়াছে!

কিন্তু কঠিন সংসার তার এ সুখের প্রমোদ-কুঞ্জে একদিন দুরন্ত ঝঞ্ঝার উচ্ছ্বাস বহিয়া আনিয়া সেখানকার পত্র-পল্লব-পুষ্পেও বিপ্লব তুলিতে ছাড়িল না। ব্রজনাথ কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া নীলিমাকে পড়িয়া শুনাইতেছিল... সরকার মহেন্দ্রর তাগিদ সে কাব্য-সুখের মাঝে ঘন ঘন আসিয়া তাকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিল। বিরক্ত হইয়া ব্রজনাথ নীচে নামিয়া আসিল; কহিল,—ব্যাপার কি?

মহেন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে নিবেদন করিল, বালিগঞ্জের বাড়ীর ভাড়াটিয়া সাহেব তিন মাসের ভাড়া বাকী ফেলিয়াছে; তাকে বার বার তাগিদ দিয়াও কোনো ফল পাওয়া যাইতেছে না। কাল সে এক চিঠি লিখিয়া বসিয়াছে, যে মাসিক চারশো টাকা ভাড়া জোগানো তার আর ক্ষমতায় কুলাইতেছে না! ভাড়ার হার যদি কমাইয়া তিনশো করা হয়, তবেই ও-বাড়ীতে থাকে; না হইলে এ-মাসের শেষে তাকে বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে—পত্রের দ্বারা বাড়ী-ছাড়ার নোটিশও তাই জানাইয়া রাখিল!

এই গান-গন্ধ-আনন্দের মাঝখানে ঐ টাকা-পয়সার হিসাব-নিকাশ! যত বিশ্রী কোলাহল! ব্রজনাথ বিরক্ত হইল, কহিল,—এর জন্য আমায় ডাকবার কি দরকার ছিল? আপনি পুরোনো লোক—এর ব্যবস্থা বুঝে করতে পারলেন না?

কুণ্ঠিত ভাবেই মহেন্দ্র জানাইল, তিন মাসের ভাড়া বারোশো' টাকা এদিকে বাকী পাওনা। তার উপর এ মাস চলিতেছে—সর্ব্বসমেত ষোলশ' টাকা...এতগুলা টাকা? এই টাকাটাই আদায় করিবার পক্ষে...

ব্রজনাথ কহিল,—আদালত কি উঠে গেছে? নালিশ করে দেননি কেন?

মহেন্দ্র কহিল,—আপনার হুকুম না হলে...

ব্রজনাথ কহিল,—এর আবার হুকুম কি! টাকা পাওনা আছে, নালিশ করে আদায় করবেন...এ তো সনাতন প্রথা!...আদালতে হাকিম আছে, উকিল আছে, পেয়াদা আছে, বেলিফ্ আছে—ব্যস্...আমি তো হলফ্ নিতে যাবো না যে...

বাধা দিয়া মহেন্দ্র কহিল,—সাহেবের কি আছে না আছে...

ব্রজনাথ কহিল,—অত ভেবে অত সন্ধান নিয়ে মামলা করতে গেলে চলে না! সাহেব তো ইতিমধ্যে সমুদ্র-পারেও পাড়ি দিয়ে পালাতে পারে! নালিশ করে দিন...আর দেরী নয়!

মহেন্দ্র কহিল,—আপনার হুকুম পেলুম, এখন তাই করে দেবো। আর ভাড়া কমানোর বিষয়ে...?

ব্রজনাথ কহিল,—ভাড়া কমানো হবে না...

সবিনয়ে মহেন্দ্র কহিল,—বাড়ী তাহলে কিছুকাল খালি পড়ে থাকবে তো...ও-পাড়ায় অনেক বাড়ীই বেশী ভাড়ার জন্য এখন খালি পড়ে আছে...

ব্রজনাথ কহিল,—আমার চেয়েও ঢের বেশী খপর যখন আপনি রাখচেন, তখন যা উচিত ভাববেন, করবেন...আমায় ডেকে এ সব ঝামেলার মধ্যে অনর্থক মাথা দিতে বলবেন না।

মহেন্দ্র কহিল,—তাহলেও আপনার মত...

ব্রজনাথ বিরক্তির স্বরে কহিল,—কোনো প্রয়োজন নেই! আমায় একটু অবসর দিন...ঢের হিসেব-নিকেশ করেচি। দুদিন ছুটী চাইছি, তাও পাবো না?...

মহেন্দ্র সঙ্কোচে সারা হইয়া গিয়া কহিল,—বেশ।

ব্রজনাথের কেবলি সেই কাব্যের কথা মনে জাগিতেছিল...বাহিরে পড়িয়া থাক্ সমস্ত সংসার!' সে চায় না এ সংসার! শুধু প্রিয়ার হাসিটুকু...

সে চলিয়া আসিতেছিল, মহেন্দ্র কহিল,—আর একটা কথা ছিল...

থামিয়া ব্রজনাথ কহিল,—কি কথা?

মহেন্দ্র কহিল,—বিশ্বনাথ দরোয়ান বড়বাজারের বাড়ীর ভাড়া দেড়শো টাকা আদায় করে সরকারী ত'বিলে জমা দেয়নি। কাল রাত্রে সেখান থেকে লোক এসেছিল, কি ড্রেন-মেরামতির দরকার, সেই কথা বলতে। তাকে ভাড়া বাকী পড়েচে বলায় সে জবাব দিলে, ভাড়া সে ঠিক সময়েই দরোয়ানকে দিয়েচে। আমি রসিদ দেখাতে বলি, আজ সকালে তাই এসে সে রসিদ দেখিয়ে গেছে! তা...

ব্রজনাথ কহিল,—তা, আমায় কি করতে হবে?

মহেন্দ্র কহিল,—বিশ্বনাথকে কাল রাত্রে এ কথা বলায় সে ধমকে উঠে বলে, ভাড়াটের মিছে কথা, ভাড়া সে দেয়নি। কিন্তু তার পর আজ আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না। বোধ হয়, পালিয়েচে।

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ, তা কি করতে চান?

মহেন্দ্র কহিল,—যদি বলেন, তার নামে থানায় একটা রিপোর্ট করে দি...

ব্রজনাথ কহিল,—তা যদি করতে চান তো আমার মতের অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন?

মহেন্দ্র কহিল,—আপনার অনুমতি...

ব্রজনাথ কহিল,—যা উচিত বোধ হবে, করবেন। এতে অনুমতির অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই! অর্থাৎ এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারে বার বার আমায় ডেকে তুচ্ছ কথা তুলে বিরক্ত করবেন না...আমি একটু অবসর নিচ্ছি। আপিসের কেরাণী-চাকরও যে ছুটি পায়, আর আমি দু'দিন ছুটী পাবো না?...

মহেন্দ্র কোন জবাব দিল না; বিনয়ে কুণ্ঠায় মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজনাথ কহিল,—আমি কিছুদিনের জন্য একটু বাহিরে যেতে চাই। মানে, পশ্চিমে হাওয়া বদলাবার জন্য! শরীরটা কিছুদিন থেকে কেমন ভালো বোধ করচি না...তখন তো আপনাকেই সব দেখাশুনা করতে হবে! তেমনি এখন থেকেই ভাবুন, আমি পশ্চিমে চলে গেছি...বুঝলেন?

মৃদুভাবে ঘাড় নাড়িয়া মহেন্দ্র জানাইল, সব সে বুঝিয়াছে।...

দুপুরবেলায় আবার তেমনি সুরের ফুলঝুরি রচার প্রোগ্রাম। ব্রজনাথ অর্গান বাজাইতেছিল, আর ক্ষণে-ক্ষণে দ্বারের দিকে চাহিতেছিল, নীলিমার পায়ের ধ্বনিটুকু শুনিবার প্রত্যাশায়,...কখন্ সে আসে! নীলিমা গিয়াছিল আহার সারিয়া লইয়া এই গানের আসরে বসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে! নিত্যই তাই হয়...তবে আজ এখনো তার দেখা নাই! অলস-দুপুরও যেন তারি চরণ-ধ্বনিটুকুর জন্য কাণ পাতিয়া স্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে! তবু সে ধ্বনি জাগে না তো!

বিরক্ত হইয়া ব্রজনাথ ঘরের সামনের বারান্দায় আসিল; আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পায়ের সেই সলাজ-গতির মৃদু-মর্ম্মর ধ্বনি...আঁচলের চঞ্চল প্রান্ত, কেশের সেই আবেশ-করা মিষ্ট গন্ধ... কোনোটারই কোনো চিহ্ন নাই! চারিদিকে চাহিয়া অস্থির চিত্তে সে ডাকিল—কালী...

নেপথ্যের কোন্ অন্তরাল হইতে ভৃত্য কালী সাড়া দিল—যাই...এবং অচিরে তটস্থ হইয়া সে আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

ব্রজনাথ কহিল,—তোর মা-ঠাকরুণ কোথায় রে?

কালী কহিল,—জানিনা তো...দেখি ..

ব্রজনাথ কহিল,—ডেকে দে তো....

কালী ছুটিল অন্দরের দিকে। ব্রজনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বারান্দায় তেমনি অধীর চিত্ত লইয়া পায়চারি করিতে লাগিল।

নিমেষ-পরে কালী ফিরিয়া আসিল, আসিয়া কহিল,—মা রান্নাঘরে।

রান্নাঘরে! ব্রজনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িল! সে কহিল,—রান্নাঘরে কি করচেন? তাঁর খাওয়া হয় নি?

কালী কহিল,—খাবার তৈরী করচেন।

খাবার তৈরী করচেন! আশ্চর্য্য! ব্রজনাথ কহিল,—তুই বলেচিস্, বাবু ডাকচেন?

কালী কহিল,—বলেছিলুম। মা বল্‌লেন, বল্‌গে যা, খাবার তৈরী করেই যাচ্ছি!...

ব্রজনাথের মাথার মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল! সে কহিল,—তুই যা...কালী চলিয়া গেল। এবং সে চলিয়া গেলে ব্রজনাথ নিজেই রান্নাঘরের দিকে চলিল।

......এই যে! বামুন ঠাকুরাণী কাছে বসিয়া; বধূ নীলিমা স্বহস্তে ময়দার লেচির মধ্যে কিসের পুর পুরিয়া দিতেছে! ব্রজনাথ কহিল,—কি হচ্ছে?

নীলিমা মৃদু হাসিয়া মুখে ঘোমটা টানিয়া দিল; বামুন-ঠাকুরাণী একটু সরিয়া বসিল। ব্রজনাথ কহিল,—কি ও?

মুখ তুলিয়া হাসি-ভরা দুই চোখের দৃষ্টি ব্রজনাথের মুখে নিবদ্ধ করিয়া নীলিমা কহিল,—মাছের কচুরি তৈরী করতে শিখচি বামুনদির কাছে।...

ব্রজনাথের বুকখানাও জ্বলিয়া উঠিল। এমন অবসর পাইয়া মন তার নীলিমার প্রতীক্ষায় কি অধীরতায় ফাটিয়া যাইতেছে, আর নীলিমা এখানে পরম নিশ্চিন্ত মনে তুচ্ছ মাছের কচুরি তৈরী করা শিখিতেছে! যেন এ কাজ না শিখিলে তার জীবনটাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে! হায় নারী!

ব্রজনাথ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পাচিকার সামনে সে কথাটা

বাহির করিতে কেমন কুণ্ঠা বোধ হইল। ব্রজনাথ কহিল,—এসো, উঠে এসো। আগুন-তাতে এই দুপুরে বসে থেকে শেষে কি অসুখ করবে!

নীলিমা মৃদু স্বরে কহিল,—কোনো অসুখ করবে না...আমার এ রকম আগুন-তাত্ ঢের সওয়া আছে।

ব্রজনাথ কহিল,—থাক সওয়া...তুমি এসো...

নীলিমা মিনতির স্বরে কহিল,—আমি যাচ্ছি...একটু পরেই যাচ্ছি... তুমি যাও না।

ব্রজনাথ কহিল,—না, আমি যাবো না। এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবো, যতক্ষণ তোমার না হয়!

এ কথার মধ্যে অভিমানের প্রচ্ছন্ন ব্যথা ছিল অনেকখানি; তার সবটুকুই নীলিমার বুকে বিঁধিল! কিন্তু বামুনদিকে ধরিয়া এই যে মাছের কচুরি তৈরী করিতে শিখিবার প্রয়াস, এর যা-কিছু আয়োজন, এ যে সে নিজে হইতেই করিয়াছে! বামুনদি অনেক প্রতিবাদ তুলিয়াছিল, অনেক নিষেধ,—না বৌদি, রান্নাঘরে উনুনের সামনে বসে তোমার এ কষ্ট করার কোনো দরকার নেই! মাথা ধরবে, অসুখ হবে, সুখী শরীর তোমার... তাছাড়া বাবু যদি রাগ করেন? এ প্রতিবাদের উত্তরে সে-ই তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিল, না, ভাই বামুনদি, তোমার কোনো ভাবনা নেই! বাবুই বা রাগ করবেন কেন?...এ সাধও কি তার এমনি হইয়াছিল? নারী হইয়া কেবলি স্বামীর আদরে-সোহাগে ডুবিয়া থাকিবে, দিবারাত্রি প্রেমের কুঞ্জে বসিয়া সুরের সৃষ্টি করিবে—ইহাতে বাড়ীর দাস-দাসী আত্মীয়-পরিজনের কাছে বসিতে বা তাদের পানে চোখ তুলিয়া চাহিতেও যে সে একেবারে মরমে মরিয়া যায়! কত দিন এমন হইয়াছে, যে,

দাসী-পরিজনের কাছে একটু বসিমামাত্র তারা শিহরিয়া নিবেদন করিয়াছে, তুমি যাও বৌদিদি, ঘরে যাও...বাবু এখনি রাগ করবেন, এ কথার মধ্যে বিষের কণামাত্র নাই, দরদে-মমতায় ভরা হইলেও ইহার মধ্য হইতে সে যে অনেকখানি বিদ্রূপ কল্পনা করিয়া সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গিয়াছে!

এ-বাড়ীর প্রভুর প্রিয়তমা...এইটুকুমাত্রই তো তার পরিচয় নয়! এ বাড়ীর প্রভুর পত্নী সে, ..এই-সব দাস-দাসী-পরিজনের লালন-পালনের ভারও তার উপর! স্নেহে-মমতায় সে ভার পালন করিয়া সে তাদের বন্ধু হইবে, মার মত হইবে...স্বামীর প্রিয়তমা হইবার সঙ্গে সঙ্গে এদের মা হইবার সাধও যে তার নারীর প্রাণে সমান জাগিয়া আছে!

আজ তাই আগুনের সামনে বসিয়া থাকিলে অসুখ হইবে, স্বামীর মুখের কথার আভাষেও এই উদ্বেগের আশঙ্কা প্রকাশ হইবামাত্র দুস্তর লজ্জার ভারে নীলিমার মন যেন ভারী পাথর হইয়া উঠিল! তার উপর বামুনদিদি মৃদু স্বরে যখন তাকে কহিল,—বলচি তো বৌদি, কেন তোমার এ কষ্ট সহ্য করা! আমি সব তৈরী করচি...তুমি যাও তো...বাবু দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে...তখন লজ্জায় নীলিমা যেন পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। কিন্তু না, এত বাড়াবাড়ি, আদরের এত ঘটা যে পলকের অদর্শনে প্রলয় বাধিয়া যাইবে,—এও যে মাত্রা ছাপাইয়া চলিয়াছে! কি এ? ছি! সকালে পড়া কাব্যের সেই কথাটা তার মনে পড়িয়া গেল—কেবল অন্তরে তব, নহে নাথ, নহে—অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী!...

নীলিমা কহিল,—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে...?

ব্রজনাথ কহিল,—হ্যাঁ!

নীলিমা কহিল,—কষ্ট হবে যে তোমার! তার চেয়ে তুমি উপরে যাও...আমার এখনি হয়ে যাবে—কখানাই বা আর আছে!

ব্রজনাথ কহিল,—যখানাই থাক,...তুমি না নড়লে আমিও এখান থেকে নড়বো না।

বামুনদি আবার জনান্তিকে কহিল—দাও না আমায়, বৌদি...বলিয়া পূরের ডিশখানা সে টানিতে উদ্যত হইল।

নীলিমা বাধা দিয়া কহিল,—না ভাই বামুনদি,...এ সব আমি নিজের হাতে করবো।...বা রে, শিখবো না কিছু? এই অবধি বলিয়া ব্রজনাথের পানে চাহিয়া সে কহিল—কেন রাগ করচো! এখন যত রাগই করো, খেয়ে তখন দেখো গো,...কত তারিফ করবে। বখশিস চাইবো... খুশী-মনে বখশিস দিতে হবে কিন্তু। ছাড়বো না। কথাটা শেষ করিয়া নীলিমা হাসিল...ভুবন-ভুলানো হাসি! এই হাসিতেই ব্রজনাথ মজিয়া আছে!

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ তো, তোমার যা করবার করো...আমারো যা...

ভয়ে নীলিমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। অত আদর, অমন মায়া...চলিতে কঠিন মাটী পাছে পায়ে বাজে, এই আশঙ্কায় যে-স্বামী আকুল হইয়া থাকেন সর্ব্বক্ষণ...আজ তাঁর সামান্য একটু খেয়াল মিটিতে একটু দেরী হইয়াছে বলিয়া সে-স্বামীর মনে রোষের এমন স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছে! যে-ভাবে খুশী, তেমনি ভাবেই যে তাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন স্বামী, অহরহ তো তাতে এতটুকু আপত্তি তোলে নাই! নিমেষের জন্যও না...তারো কি একটা তুচ্ছ খেয়াল থাকিতে পারে না? সে খেয়ালের

দিকে সামান্য একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে গেল অমনি সারা আকাশ এমন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে !...

হায় রে, নীলিমা এ দুনিয়ার কতটুকুই বা জানে ! আগে যেটুকু জানিত, এ ক'দিনের আদর-সোহাগের বন্যায় সে-জানা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে ! সে যে নারী...পুরুষের খেয়ালেই নারী চলিয়া আসিয়াছে, চিরদিন...তার উপর পুরুষের যা-কিছু প্রীতি, তা যে পুরুষের ভালো লাগার জন্যই ! নারীর সে আদর-সোহাগ কেমন লাগিতেছে, পুরুষ যে তার কোনো সন্ধান রাখিবার ধারও কোনোদিন ধারে নাই !...

তবু এ সামান্য ব্যাপারে স্বামী যদি রাগই করেন,...উপায় কি ? মনের উপর যে আতঙ্ক ছায়া মেলিয়া ধরিতেছিল, নীলিমা জোর করিয়া সে ছায়াটুকু সরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে কহিল,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন গা ? তার চেয়ে এসে বসো এইখানে। ছাখো'দিকিন, আমি একদিনেই কেমন পাকা কারিগর হয়ে উঠেচি কচুরী তৈরী করতে...দেখলে কত খুশী হবে'খন !

ব্রজনাথ গম্ভীর ভাবেই কহিল,—না, এইখানেই আমি বেশ আছি।

এ কথার পর আর কথা নয় !...কি জানি, রাগ যদি তাহাতে আরো বাড়িয়া ওঠে ! নিজের গৃহে দাদার মেজাজ তো দেখিয়াছে সে...কাজ নাই আর অপ্রীতির এই ছোট স্ফুলিঙ্গটুকুকে কথার ফুঁয়ে বাড়াইয়া তুলিয়া !...কচুরি কয়খানা তাড়াতাড়ি ভাজিয়া ফেলিবার দিকেই সে মনোযোগ অর্পণ করিল; বামুনদিকে কহিল,—কুলোবে তো ভাই বামুনদি ? পুর কম পড়বে না ?

বামুনদি কহিল,—না বৌদি, ঠিক কুলিয়ে যাবে...

নীলিমা কহিল,—ক'গণ্ডা হলো সবশুদ্ধু ?

বামুনদি কহিল,—দেখচি গুণে।

নীলিমা কহিল,—সকলের কুলোবে ? মানে, চাকর-বাকর সক্কলের ?

বামুনদি কহিল—তা ঢের কুলোবে !

বাহিরে ব্রজনাথের মনের মধ্যে তখন ক্ষুদ্র অভিমানটুকু ফুঁপিয়া ফুলিয়া বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল ! তার এত প্রেম...সে প্রেমে এমন উপেক্ষা ! হায়রে, নীলিমা আজো বুঝিল না, ব্রজনাথ যে দুনিয়ায় আর কিছু চায় না, কিছুতে তার কোনো আকর্ষণ নাই ! শুধু নীলিমার কাছে কাছে অহরহ থাকিয়া তার সমস্ত মাধুরীটুকু নিঃশেষে পান করিতে পারিলেই সে ধন্য হইয়া যায়, তার কোথাও কোনো অভাব থাকে না !...কিন্তু নীলিমা...? হঠাৎ মনে হইল, ঠিক ! নীলিমারো তো মন বলিয়া একটা জিনিষ আছে ! যদি সে অন্য দিকে একটু নেত্রপাত করিয়া থাকে,—তাহাতে তার এমন কি অপরাধ হইয়াছে !...

মন আবার পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, কেন সে অন্য দিকে চাহিবে ? ব্রজনাথ তো তা পারে না। নীলিমা ছাড়া আর কিছুতে যে তার সুখের কণামাত্র নাই !...নীলিমার মন তারি মনের মত এমনি কেন না হইবে ? ক্ষণেকের বিরহ, পলকের জন্য চোখের আড়...তার যখন এমন অসহ ঠেকে, তখন নীলিমারও কেন তেমন না হইবে ? তার এই বুকভরা ভালোবাসা, অগাধ অসীম প্রীতি...এ পাইয়াও নীলিমার মন পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে না ? তুচ্ছ দাস-দাসীর কাজের দিকেও মন তার ছুটিয়া চলিবার অবসর পায় ! সংসার ?...সংসার কি তার চেয়েও বড় ?

মনে-মনে এমনি পাঁচ-সাত রকম ভাবিয়া সে রান্নাঘরের দ্বারে

আসিয়া দাঁড়াইল। নীলিমা তখন নিবিষ্ট মনে কড়ায় কচুরি ফেলিয়া ছোট খুন্তি দিয়া সেগুলাকে নাড়িয়া দিতেছে। আগুনের আঁচে তার ভ্রূ-যুগ সে একটু কুঞ্চিত করিয়াছে—আর আগুনের রক্ত শিখার সামনে ঐ মুখের মাধুরী...ব্রজনাথ ভাবিল, নীলিমার সবই সুন্দর...ঐ উনুনের পাশে এই কুশ্রী আব-হাওয়ার মধ্যেও তার যে শ্রী ফুটিয়াছে, তাও অপূর্ব্ব, অপরূপ!

সহসা নীলিমা ব্রজনাথের পানে চাহিল, চাহিবামাত্র হাসিয়া ফেলিল, কহিল,—কি দেখচো?...একখানা চেখে দেখবে?

ব্রজনাথ ঐ কচুরিরই কাঙাল বটে! সে কহিল,—না।

নীলিমা কহিল,—ছাখো না চেখে! সত্যি, আমার এতটা পরিশ্রম তাহলে সার্থক হয়...কেমন হলো...

একটা আঘাত দিবার অভিপ্রায়ে ব্রজনাথ কহিল—নিজে চেখে দেখলেই পারো!...কথাটা বলিয়া সে ভাবিল, মস্ত ঘা দিয়াছে!

নীলিমা কহিল—তাই তো, তোমার আগে আমি মুখে দেবো? আমি তো আর ক্ষেপিনি...

ছোট কথা, তুচ্ছ কথা! তবু এ কথার মধ্যে,......ব্রজনাথের মনে হইল, যেন অনেকখানি মমতা জড়িত রহিয়াছে!

থাক্ তা...এমন অবসর তা বলিয়া এ-ভাবে সে মাটী হইতে দিতে পারে না! তার ইচ্ছা হইল, ওই সুশ্রী সুগঠিত তনু...দুই বাহুতে তুলিয়া বুকে ধরিয়া তাকে প্রমোদ-কুঞ্জে লইয়া যায়! কিন্তু ঐ বামুন-ঠাকুরাণীটা...

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ, আমি চললুম...তোমার কাজ চুকলে খুশী

হয় এসো...না হয় তো, আলুর দম, ডিমের ডালনা, মটন-চপ তৈরী করে গৃহস্থর সংসারের সুসার করো...

কথাটা বলিয়া ব্রজনাথ সশব্দে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

বামুনদি কহিল,—গেলে না বৌদি? বাবু বোধ হয় রাগ করে চলে গেলেন!

নীলিমা কহিল—তোমাদের বাবু তো আর পাগল হননি যে এতেই রাগ করে যাবেন!

বামুনদি কহিল—যাও না, সত্যি! বাবুর সাধ, তোমার সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করবেন...

নীলিমার কাজের রোখ চাপিয়া গিয়াছিল। সে জবাব দিল—তুমি নাও তো ভাই, নিজের চরকায় তেল দাও এখন। পুরগুলো একটু চট্‌কে নাও—ঝরা-ঝরা হয়ে গেছে।

বামুনদি পুর ঠাশিতে ঠাশিতে বলিল,—বাবুর অভিমান বড্ড বেশী... এই যে বড় বৌদি চলে গেছেন ..কত কাল হয়ে গেল—তা, স্ত্রী তো... তবু বাবু কখনো তাঁর নামও করেননি কোনো দিন বা সেদিকে ঘেঁষেননি!

এমন যে আমোদ...বামুনদির এ-কথায় সে আমোদ মুহূর্তে ঘা খাইয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল! নীলিমার জীবন-আকাশে আলোর জোয়ার আসিয়াছে,...এমন জোয়ার যে কোথাও একটা কাঠি-কুঠারও জঞ্জাল নাই! এ কথায় সে আলোর জোয়ারে এক মুহূর্তে কত দুর্ভাবনা, কত বেদনার জঞ্জাল যে ভাসিয়া আসিল...!

বামুনদি বলিল—তাঁর মুখও তেমনি ছিল, মোদ্দা—বাবুর সঙ্গে ঝগড়া

ছাড়া অন্য কথা কইতে জানতেন না! ছেলেমেয়েগুলি পর্য্যন্ত মায়ের আদর কখনো একটু পায়নি। আহা, বাছারা...তাদের জন্যে এমন কষ্টও হতো! কারো উপর সে-বৌদির রাগ হতো যদি তো দিত ছেলেমেয়েদের ধড়াধ্বড় পিটিয়ে! কেউ কথা কবে? বাব্বাঃ! কারো ঘাড়ে এমন মাথা ছিল না!

বামুনদি নিজের মনে কবেকার অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা টানিয়া আনিয়া যুদ্ধ-বিপ্লবের ছোট-বড় কত মর্ম্মান্তিক কাহিনীই যে বকিয়া চলিল...নীলিমা নিঃশব্দে নিজের কাজ করিতেছিল। এ-সব কহিনীগুলা সহস্র রসনা মেলিয়া তার চতুর্দ্দিকে এমন আর্ত্ত চীৎকার তুলিয়া ধরিল যে এক সময়ে হাতের কাজ ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া কহিল—তুমি তাহলে বাকীগুলো তৈরী কর, ভাই, আমি যাই—বলিয়া সে তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সে ঘর ত্যাগ করিল। তার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিয়াছিল। পলাইয়া বাহিরে আসিয়া কোনো মতে চোখের জল মুছিয়া উপরে ব্রজনাথের ঘরে আসিয়া সে উপস্থিত হইল।

৪

ব্রজনাথ গুম্ হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। মুখ গম্ভীর। নীলিমা আসিয়া তার পাশে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া কহিল,—শুয়ে আছো কেন ?

ব্রজনাথ কোনো জবাব দিল না—খোলা জানলা দিয়া আকাশের পানে শূন্য দৃষ্টিতে যেমন চাহিয়াছিল, তেমনি চাহিয়া রহিল...নিশ্চেতন স্পন্দন-হীনের মত !

অভিমান ? রাগ ? নীলিমার বুক আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিল। ব্রজনাথের অধরে চুম্বন করিয়া নীলিমা কহিল,—রাগ করেচো ?

তবু কোনো জবাব নাই। নীলিমা কহিল,—আমার সঙ্গে কথা কবে না ?

সে শূন্য দৃষ্টি তেমনি নিষ্পলক ! নীলিমা কহিল,—তুমি পাগল হয়েচো ! নিজের হাতে স্বামীর জন্য খাবার তৈরী করে সে খাবার স্বামীকে খাওয়াতে কতখানি যে আনন্দ হয়...পুরুষ-মানুষ তুমি, কি করে তা বুঝবে, বল ?

ব্রজনাথের অন্তরাত্মা ক্ষোভে গর্জ্জন তুলিল, ছাই আনন্দ ! তোমার স্বামী পেটুক নয় তো যে...

ব্রজনাথের মুখের সে ঘোরালো ভাব কাটিল না দেখিয়া নীলিমা বিচলিত হইল। কাতর করুণ কণ্ঠে সে কহিল,—লক্ষ্মীটি, কথা কও গো, রাগ করে থেকো না...

ব্রজনাথের মনে হইল, আহা বেচারী! স্বর তার অমন করুণ হইয়া উঠিয়াছে! আবার পরক্ষণেই মনে হইল, না, ও স্বরেও এমন মাধুরী... তা তো ব্রজনাথ জানিত না! আর একটু অভিমান করিয়া থাকি, এ মাধুরী আরো অজস্র ধারে পান করিতে পাইব!...সে কোনো কথা কহিল না।

নীলিমা কহিল,—তবু কথা কইবে না?...কি আর বলবো...আমার অদৃষ্ট! একটা আর্ত্ত নিশ্বাস অসহ্য বেদনা বহিয়া তার বুক ঠেলিয়া বাহির হইল। নীলিমা ধীরে ধীরে আসিয়া খোলা খড়খড়ির ধারে বসিল; বসিয়া শূন্য মনে উদাস দৃষ্টিতে কোন্ সুদূরের পানে চাহিয়া রহিল।

ব্রজনাথ শুইয়া শুইয়া দেখিতে লাগিল...ওই অধর করুণা-মাখা, বেদনা-মিনতি-আঁকা...নীলিমা কি ভাবিতেছে? তারি রূঢ় অমার্জ্জনায়, পরুষ বচনে নীলিমা প্রাণে বেদনা পাইয়াছে? কিন্তু এ তো তার রাগ নয়...অভিমান...! আহা, বেচারী মার্জ্জনা চাহিতে আসিয়াছিল—ব্রজনাথ তবু মৌনতার তীরে তার মার্জ্জনার সে প্রার্থনাটুকুকে বিঁধিয়া জর্জ্জরিত করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে! নীলিমার দুই চোখে জল দেখা দিল; ব্রজনাথ আর স্থির থাকিতে পারিল না; উঠিয়া নীলিমার কাছে আসিয়া ডাকিল,—নীল—

নীলিমা কোনো জবাব দিল না, ব্রজনাথের পানে ফিরিয়াও চাহিল না; যেমন কাঠ হইয়া বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। ব্রজনাথ তার পাশটিতে বসিয়া পড়িল এবং নীলিমার আঁচল দিয়া তার চোখের জল মুছাইয়া তাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহ-গদ্গদ স্বরে

কহিল,—ছি, কেঁদো না নীল, তোমার চোখের জল আমার বুকে যেন হাজার তীরের ফলার মত বিঁধচে !

এ আদরে নীলিমা আপনাকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না, বেদনায় অভিমানে জড়িত বাষ্পার্দ্র স্বরে কহিল,—কেন তুমি আমার উপর রাগ করলে...কেন আমায় আদর করলে না,...কেন আমায় বুকে টেনে নিলে না ?...

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রজনাথ কহিল,—আমার ভারী অভিমান হয়েছিল, নীল ..

সুরে অভিমানের আব্দার তুলিয়া নীলিমা কহিল,—অভিমান কেন তোমার হবে ? তোমার জন্যে আমি খাবার তৈরী করছিলুম। আমি তো আর বসে বসে গালগল্প করিনি কারো সঙ্গে...

ব্রজনাথ কহিল,—আমি কি তোমার ঐ কচুরি খেলেই স্বর্গে যাবো ?

—যাও, ও কি কথা ! বলিয়া নীলিমা সরোষ ভঙ্গীতে নিজেকে ব্রজনাথের বাহু-পাশ হইতে সবলে মুক্ত করিয়া লইল।

ব্রজনাথ কহিল,—রাগ করলে নীল ?

নীলিমা কহিল,—না, রাগ করবে না ? আমি তো আর মানুষ নই—উনিই শুধু মানুষ ! ওঁরই শুধু সুখ-দুঃখ আছে ! উনিই শুধু মান-অভিমান করতে জানেন !

ব্রজনাথ কহিল,—কিন্তু তুমি তো সত্যিই মানুষ নও...আমাদের মত মানুষ কি তুমি, নীল...?

এ কথায় নীলিমার ভারী হাসি পাইল—ব্রজনাথ যেন কি ! কি যে বলেন, তার না আছে কোনো অর্থ ! হাসিয়া নীলিমা কহিল—না,

আমি কি তোমাদের মত মানুষ! আমার হাত নেই, মুখ নেই, কিছু নেই...! আমি ভূত প্রেত দানা দত্যি, শাঁখচুর্ণী...

সেই রোষের ভঙ্গী—তার সঙ্গে সেই হাসিটুকু···যেন হীরার কুচি! অমূল্য!

ব্রজনাথ হাস্য রোধ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল,—বালাই, তুমি ভূত-প্রেত হতে যাবে কেন! কিসের দুঃখে? তুমি অপ্সরী, তুমি দেবী!

নীলিমা এবার কৃত্রিম রোষের স্বরে কহিল,—যাও...! আমি দেবী, আর তুমি মানুষ, না? দেবীতে-মানুষে কখনো বিয়ে হয় বুঝি? বা রে বিদ্যে!

ব্রজনাথ কহিল,—হয় না? তুমি তো তাহলে ভারী জানো! আমি যদি প্রমাণ দিতে পারি?

নীলিমা মহা-উৎসাহে কহিল,—দাও প্রমাণ...

ব্রজনাথ কহিল,—চোখের সামনে এই তো জাজ্বল্যমান প্রমাণ পড়ে রয়েচে।

বিস্ময়ে-ভরা দৃষ্টিতে চারিধারে চাহিয়া নীলিমা কহিল,—কৈ? কোথায় প্রমাণ?

ব্রজনাথ নিজের বুকের উপর হাত রাখিয়া গম্ভীর ভাবেই কহিল,—এই আমি, মানুষ...তার পর নীলিমার হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতে তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—আর এই তুমি, দেবী...তুমি কি বলতে চাও তবে যে, আমাদের বিয়ে হয়নি?

নীলিমা প্রথমটা হতভম্বের মত বসিয়া ব্রজনাথের কথার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিল, এবং মুহূর্তে অর্থটুকু যখন বুঝিল, তখন হাসিয়া খুন! হাসিতে হাসিতে সে কহিল,—খুব প্রমাণ দিয়েচো, মশাই! থাক্, থাক্,

আর প্রমাণে কাজ নেই। . তোমার প্রমাণের বহর দেখে আমার হাসি রাখা দায় হয়ে উঠেচে!

ব্রজনাথ ভাবিল, কি তুচ্ছ কথা সব...আর কেহ বলিলে হয়তো বিরক্ত হইয়া সে-ই বলিত, কি ছেলেমান্সী! কিন্তু নীলিমার মুখে এই কথাই...এ ছেলেমান্সীর মধ্যেও যে অসীম পুলক, সে পুলকের একটু কণাও তার ভাগ্যে কখনো মিলিবে, এমন আশা যে তার কখনো ছিল না! এ পুলকের এক কণামাত্র পাইবার প্রত্যাশায় কি ভিখারীর মতই না সে সকলের দ্বারে ঘুরিয়া মরিয়াছে!...

নীলিমা তখনো হাসিতেছিল। ব্রজনাথ মুগ্ধ নয়নে সে হাসি দেখিয়া বিহ্বল উন্মাদ হইতেছিল। তার পানে চাহিয়া মুগ্ধ আবেশে ব্রজনাথ কহিল, – মান ভেঙ্গেচে আমার মানময়ীর?

নীলিমা কহিল,—মান আবার কখন আমি করলুম! বা রে, নিজে মান করে আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো! ভারী মজা, না?

ব্রজনাথ কহিল,—বটে! খড়খড়ির ধারে এসে বসা হলো...চোখে জল এলো...

বাধা দিয়া নীলিমা কহিল,—কেন তুমি আমার সঙ্গে কথা কইলে না? তাই তো আমার দুঃখ হলো। এতে দুঃখ হয় না?

ব্রজনাথ কহিল,—আর তুমি যখন আমায় ফেলে রান্নাঘরে উনুনের ধারে বসে খাবার তৈরী করতে ছোটো, তখন তাতে আমার মনে খুব আনন্দ হয়, না?

নীলিমা কহিল—মেয়ে-মানুষ হয়ে জন্মেচি, ঘর-সংসার দেখতে হবে তো...

ব্রজনাথ কহিল,—না। মাহিনা-করা দাস-দাসীর যা কাজ, তারা যা করতে পারে, সে কাজ করার জন্য পুরুষ-মানুষ বিয়ে করে না...স্ত্রী আর দাসী এক বস্তু নয়!

তার কথায় বাধা দিয়া নীলিমা কহিল,—কিসের জন্যে তবে তারা বিয়ে করে, শুনি?

ব্রজনাথ কহিল,—কিসের জন্যে,—তবে বলি, শোনো! এ একটা পুরোনো কাহিনী।...

নীলিমা উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিল,—স্বামী কি অমূল্য কাহিনীর বর্ণনা সুরু করিবে, তাহাই শুনিবার প্রত্যাশায়!

ব্রজনাথ কহিল,—এই পৃথিবী তৈরী করে ভগবান তার পানে চাইতেই দেখলেন, কি ছবিই ফুটেচে ঐ বিরাট শূন্য-তলে! ঐ রূপালি তরল স্রোতে নদী বয়ে চলেছে, কোথাও সে মস্ত পাহাড়ের পায়ের পাশ দিয়ে সরীসৃপের ভঙ্গীতে এঁকে-বেঁকে চলেছে, কোথাও সে চলেছে শ্যামল শষ্পে-ছাওয়া তটের বুক ছুঁয়ে...ঐ ফল-ফুলের গাছ তাদের শ্যামল বর্ণে...রূপালি নদীর পাশে কি চমৎকার মানিয়েচে...কিন্তু এ ছবি দেখবে কে? তাঁর হাতের এত-বড় কারি-গরি, নিজে দেখেই তো তৃপ্তি হয় না! তিনি ভাবতে বসলেন, তাইতো, কি করা যায়!...দেবতাদের ডাকালেন। দেবতারা এলেন। এসে তাঁরা দেখে বললেন, বাঃ, খাশা হয়েচে! এ কথা বলে তাঁরা স্বর্গে নিজেদের যার যার কাজে চলে গেলেন। ভগবান ভাবলেন, এরা এলো, এসে চকিতের জন্য মর্ত্ত্যের পানে চোখের দৃষ্টি হেনে আবার চলে গেল! তারা বিহ্বল হলো না এ দৃশ্য দেখে? তিনি নির্ব্বাক বিস্ময়ে মর্ত্ত্যের পানে চেয়েই রইলেন! চেয়ে চেয়ে ভাবলেন,

তাইতো, ও মর্ত্ত্য অমনি পড়ে থাকবে? মুহূর্ত্তের খেয়ালে তিনি মর্ত্ত্যভূমি গড়লেন বটে, কিন্তু তার সৌন্দর্য্য তাঁর প্রাণে অনেকখানি দরদ জাগিয়ে তুললে। ও-সৌন্দর্য্য এমন অকারণ ফেলে রাখতেও তাঁর মন যেন চাইলে না। অথচ একে বিলুপ্ত করার চিন্তায় মন ভারী কাতর হয়ে পড়লো। ও-মর্ত্ত্যভূমিকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে,—কিন্তু রাখতে গেলে এমন কাকেও মর্ত্ত্যভূমির সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া চাই, যার দরদ ঐ মর্ত্ত্যভূমির উপর অটুট থাকে। ভাবতে ভাবতে নিজের ছায়ায় তিনি পুরুষ গড়ে তাকে মর্ত্ত্যে পাঠালেন। পুরুষ এলো, এসে ঐ শোভার মধ্যে কেমন মন-মরা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো! ভগবান বললেন,—তুমি অমন উদাস-মনে বেড়াও কেন হে? পুরুষ বললে,—কি করবো প্রভু,—বড় একা, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে! এই ফুল-ফলের শোভা, এই বর্ণ-সুষমা—এ যে নিজে দেখে চুপ করে থাকতে পারচি না! এ শোভা আর কাকেও দেখাতে পেলে তবে যেন মনে আরাম পাই! ভগবান বললেন,—ঠিক, আমারো তাই মনে হতো,—তাইতো তোমায় সৃষ্টি করে মর্ত্ত্যলোকে পাঠিয়েচি। তিনি তখন আরো পুরুষের সৃষ্টি করে মর্ত্ত্যে পাঠালেন—কিন্তু সেখানে তাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। কেবলি তর্কাতর্কি আর কোলাহল চললো—দম্ভের বুদ্‌বুদ ফুটিয়ে পুরুষরা তা নিয়েই মত্ত চব্বিশ ঘণ্টা! অবহেলায় গন্ধ-গান শুকিয়ে ওঠে, গাছের ফুল ম্লান হয়ে ঝরে পড়ে, নদী আর উজানে বয় না! ভগবান দেখলেন, মহা বিপদ! পুরুষদের ডেকে তিনি প্রশ্ন করলেন,—ব্যাপার কি হে? তোমরা যে প্রকৃতির পানে ফিরেও তাকাও না! তারা বললে, আজ্ঞে, ও-সব নেহাৎ পুরোনো একঘেয়ে হয়ে পড়েচে! ওদের প্রাণ নেই! ভগবান

ভাবলেন, তাইতো, এমন মোহের বস্তু তাহলে কিছু সৃষ্টি করা চাই—যাতে পুরুষ বিভোর হয়—এমন সৌন্দর্য্য, যে-সৌন্দর্য্যের তরফ থেকে তারা সাড়া পেতে পারে...তাঁর কল্পনা তখন সব সৌন্দর্য্যের সার চুনে নিয়ে নারীর সৃষ্টি করলে! পৃথিবীর সেই শ্যামল-শোভার মাঝখানে নারী যখন প্রথম রাঙা চরণ-পাত করে দাঁড়ালো, পুরুষ তখন তাকে দেখে বিহ্বল চঞ্চল হয়ে উঠলো! তার ঔদাস্য টুটে গেল—নারীর রূপের স্তুতি করতে পুরুষ কাব্য রচনা করলে, তুলির সৃষ্টি করে ছবি আঁকতে বসলো, —আর মানুষের মন নারীর বন্দনায়, নারীর হৃদয়-জয়ের বাসনায় সর্ব্বক্ষণ সজীব সচঞ্চল রইলো। পুরুষ নারীকে সুখী করার জন্য আরো নব নব বেশে-ভূষণে পৃথিবীকে সজ্জিত সুন্দর করে তুললো!... নারীর কাছে পুরুষ পেলে সকল তাপ-জুড়ানো আরাম, অপরাধে মার্জ্জনা, প্রেম, প্রীতি...অর্থাৎ সর্ব্ব রকমে পরিতৃপ্তি! বুঝলে নীল...নারীর সৃষ্টি হবার আগে থেকে পুরুষ নিজের হাতে নিজের খাবার তৈরী করেই উদর পূর্ণ করতো। তাকে আহারের লোভ দেখিয়ো না! নারীর কাছে পুরুষ চায় প্রাণের আরাম, মনের তৃপ্তি! এ-বিশ্বে নারীর আসার পূর্ব্বে পুরুষের সে কি জীবন ছিল, না, তার সে জীবনে কোনো লক্ষ্য ছিল, উদ্দেশ্য ছিল, সুখ ছিল? কিছু না। নারীই তো পুরুষের জীবনে শত বাসনা, ভোগের সহস্র প্রয়াস জাগিয়ে তুলেচে...! জীবনে রস-বৈচিত্র্যের জোগান দিয়েচে নারী!

নীলিমা মুগ্ধ চিত্তে বসিয়া ব্রজনাথের কাহিনী শুনিতেছিল। কাহিনী শেষ হইলে সে ভাবিল এই নারী...এই তার কাজ!...তারই প্রীতির জন্য পুরুষ এই মর্ত্ত্যভূমিকে সজ্জিত সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে!

সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল...আর মনের মধ্যে সেই কোন্ অনাদি কালের অতীত কাহিনী কত-ভাবের কি গুঞ্জরণই তুলিতে লাগিল!

ব্রজনাথ কহিল,—এসো নীল, আমরা আমাদের উৎসব জাগিয়ে তুলি...দিনের এই প্রখর সূর্য্য-কিরণে চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুলি!...

৪

এখানে এই যে প্রমোদের পুষ্পিত আয়োজন...সুদূর পিত্রালয়ে বসিয়া নীরজা এ সংবাদটুকু ঠিকই পাইয়াছিল। এ সংবাদে বিচলিত হওয়া দূরের কথা—ঘৃণায় রুক্ষ মুখে সে শুধু একটা টিপ্পনী কাটিল। ভ্রাতৃজায়া সুধা তাকে বলিল,—আমার এ কথা বলা সাজে না, ভাই ঠাকুরঝি, তবু তোমার এমন নির্লিপ্তভাবে এখানে পড়ে থাকাটা কি ভালো হচ্ছে? এর পর...?

নীরজা হাসিয়া জবাব দিল,—এর পর আবার কি! সে দোরে আমি কি জীবনে আর কখনো গিয়ে দাঁড়াবো, ভাবিস্?

ননন্দার মুখে এ কথা শুনিয়া বধূ সুধা শিহরিয়া উঠিল। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কথান্তর আর মনান্তর হওয়া বিচিত্র নয়, তা বলিয়া সে বিবাদ এমন প্রচণ্ড হইবে যে চির-জন্মের মত কেহ কাহারো মুখ দেখিবে না...এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার!

নীরজা কহিল,—কেন সেধে কুকুরের মত আমি আবার সেখানে যাবো, বল্ তো? কখনো না! কেন, কিসের দুঃখে? আমার বাপ-মা কি আমায় পুষতে নারাজ, না, সে শক্তি তাঁদের নেই?

এ কথাগুলা শুধু বিরোধের কথাই নয় তো! এর সঙ্গে কতটা বিরূপতা, স্বামীর প্রতি কতখানি অশ্রদ্ধা আর ঘৃণাই না জড়িত আছে!

সুধা বলিল,—ছেলে-মেয়েরা ডাগর হচ্ছে, ভাই। ঠাকুর-জামাইকে তারা জানবে না কোনো দিন? বাপের স্নেহ, বাপের ভালবাসা...

মুখখানাকে বাঁকাইয়া নীরজা ব্রজনাথের উদ্দেশে একটা কটু গালি দিয়া কহিল,—সেই তো কবে চলে এসেচে, কোনো দিন এদের একটা তালাশ নিয়েচে?...ওরা নয় ভাববে, ওদের বাপ নেই...!

যাট! যাট! সুধা শিহরিয়া জিভ কাটিল!...তবে এ কথাও ঠিক, ঠাকুর-জামাইও তো ছেলেমেয়েদের কোনো খোঁজ-খপর লন নাই! স্ত্রীর উপর যত রাগই থাকুক, ছেলেমেয়েদের পানে তা বলিয়া ফিরিয়া চাহিবে না...এটা কি ঠাকুর-জামাইয়েরই উচিত হইয়াছে? তিনি পুরুষ মানুষ—স্ত্রী যত অবুঝই হোক--তিনি তো জ্ঞানী, লেখাপড়া শিখিয়াছেন, ছেলেমেয়েগুলোকে এভাবে অবহেলা করা তাঁর পক্ষে খুবই অনুচিত, খুব অন্যায়!

নীরজা কহিল,—ও-সব কথা থাক। আজ যে থিয়েটারে যাবার কথা আছে...দাদা নিয়ে যাবে...তা সাজগোজ করে নে, বৌ...দেরী করলে প্রথমটা দেখা হবে না!...

সুধা কহিল,—তুমিও তো চুপ করে বেশ বসে আছো! চুল বাঁধবার কোনো আয়োজন করোনি তো!

নীরজা কহিল,—আয়, তোর চুলটা আগে বেঁধে দি...

সুধা কহিল,—আর তোমার?

নীরজা কহিল,—তোর চুল বেঁধে দিয়ে নিজেরটা আমি নিজেই বেঁধে নেবো।

সুধা আর বাক্য ব্যয় না করিয়া ফিতা, সিঁদুর-কৌটা, চিরুণী প্রভৃতি

চুলের সাজ আনিয়া নীরজার সামনে রাখিল। নীরজা সাগ্রহে সুধার বেণী-রচনায় মনোনিবেশ করিল।

নীরজার বড় ছেলে যতিনাথ সজ্জিত বেশে আসিয়া কহিল,—আমরা তাহলে বেড়াতে যাচ্ছি, মা...

নীরজা কহিল,—যাও...

যতিনাথ চলিয়া গেল। যতিনাথ ডাগর হইয়াছে। দশ বৎসর তার বয়স। স্কুলে পড়িতেছে,—বড়লোকের ছেলে, তায় মামার বাড়ী আদরের প্রাচুর্য্যের মধ্যে থাকিলেও পড়াশুনায় তার মন আছে, বুদ্ধি-শুদ্ধিও বেয়াড়া পথের দিকে ঝোঁক দিতে শিখে নাই! মেজাজটুকু শান্ত,—কলহ-কোলাহলের সে কোনো ধার ধারে না!

চুল বাঁধা শেষ হইলে সাজ-সজ্জার পালা। তাও চুকিল এবং সন্ধ্যার পরক্ষণে দাদা নলিনাক্ষর সঙ্গে নীরজা ও সুধা থিয়েটার দেখিতে বাহির হইয়া গেল।...

থিয়েটারে ভারী ভিড়। মহা-সমারোহে থিয়েটারওয়ালারা একখানা নূতন নাটক খুলিয়াছে...নানা কাগজে এই নাটক সম্বন্ধে এমন আলোচনা বাহির হইয়াছে যে সে-আলোচনা পড়িলে মনে হয়, জগতে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে, যার পাশে জার্ম্মান যুদ্ধের অমন সমারোহও অতি-তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়—লাট-কৌন্সিলে ঢুকিবার জন্য সহস্র ফন্দী, সহস্র প্যাঁচ ও যুদ্ধ-বিপ্লবের প্রচণ্ড কোলাহলও এ আলোচনার মাঝে যেন কোথায় তলাইয়া যায়! হুজুগে মাতিয়া দলে দলে লোক ছুটিয়াছে থিয়েটারে এই নূতন পালা দেখিতে। না দেখিলে জীবনের মস্ত একটা দিকই পাছে খালি থাকিয়া যায়, এই আশঙ্কায়, এই উদ্বেগে!

প্রেক্ষা-গৃহের আগাপান্তলা লোকে ঠাশিয়া গিয়াছে। উপরের বক্সে রঙীন শাড়ীর বাহার তুলিয়া নানা রকমের তরুণীর দল আসিয়া সেখানে বসিয়া গিয়াছেন। সারা গৃহ একেবারে গম্ গম্ করিতেছে!

নীরজা আসিয়া একটা বক্সে বসিল। আগে হইতেই বক্স রিজার্ভ করা ছিল। নীরজা ও সুধাকে বক্সে বসাইয়া নলিনাক্ষ কোথায় উধাও হইয়া গেল। ও-দিকে নীচে তখন সেই কন্সার্ট নামক রাক্ষসটা বিরাট গর্জ্জন তুলিয়া দর্শকদের অত বড় কোলাহলকেও একেবারে কোণ-ঠাশা করিয়া দিয়াছে!

নলিনাক্ষ আসিয়া সুধাকে চুপি চুপি খবর দিল,—ব্রজনাথও থিয়েটার দেখতে এসেচে, তার নতুন বৌকে সঙ্গে নিয়ে!

সুধা কহিল,—তোমার সঙ্গে দেখা হলো না কি?

নলিনাক্ষ কহিল,—না। সে আমায় দেখতে পায়নি, তবে আমি তাকে দেখেচি।

সুধা কহিল,—একবার দেখা করো,—বুঝিয়ে বলো, জানলে? সত্যি, ঠাকুরঝি কি যে বুঝেচে, জানি না! আমার কিন্তু ভারী বিশ্রী ঠেকে! স্বামী-স্ত্রী এমন পরের মত দূরে দূরে থাকবে, কেউ কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না,—কি এ, বাপু!...

নলিনাক্ষ কোনো কথা বলিল না। দু'খানা প্রোগ্রাম আনিয়াছিল, নীরজাকে ডাকিয়া তার হাতে একটা প্রোগ্রাম গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—এই নে প্রোগ্রাম, নিরু...

নীরজা মঞ্চের উপর মঞ্চকে ঢাকিয়া ঐ যে প্রকাণ্ড পর্দ্দাখানা হাওয়ায় দুলিতেছিল, সেই পর্দ্দার দিকে চাহিয়াছিল। নলিনাক্ষর আহ্বানে

ফিরিয়া চাহিয়া সে প্রোগ্রাম লইল এবং লইয়া প্রোগ্রাম পড়িতে বসিল।

সুধার কিন্তু আগ্রহের সীমা ছিল না। সামনের বক্সগুলার পানে সে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছিল। ব্রজনাথকে কবে সে দেখিয়াছে... চেহারাটুকু অবিকল মনে নাই! তা না থাক, তবু পরিচিত লোকটিকে এত অপরিচিত লোকের ভিড়ের মাঝে দেখিলে একেবারেই কি চিনিতে পারিবে না ?...

মেয়েদের পিছনে তার নিজের আসনে বসিয়া নলিনাক্ষও অলক্ষ্য হইতে সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া সাম্‌নের বক্সগুলার দিকে চাহিতেছিল, ব্রজনাথের সঙ্গে যদি চোখাচোখি হইয়া যায়...! যদি হয়, সে কি করিবে ? আলাপ ? কিন্তু সেটা ভারী বিসদৃশ হইবে না কি ?...কেন বিসদৃশ ঠেকিবে ? তার সঙ্গে তো ব্রজনাথের কোনো দিনই কোনো তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া কোনোরূপ কথান্তর বা মনান্তর ঘটে নাই! নিজের বোনকে তো সে ভালো করিয়াই জানে—কত দুর্জ্জয় তার গোঁ, কি উত্তপ্ত মেজাজ! এই বিচ্ছেদের জ্বালা তার মনকেও তাতাইয়া তোলে বিলক্ষণ...বোনকে উপদেশের ছলে দু'একটা কথা বলিবার চেষ্টাও সে করিয়াছিল! এমনও বলিয়াছিল,—তোর কিছু করিয়া কাজ নাই, আমিই মধ্যস্থ হইয়া তোদের এ বিবাদ, এ কলহ মিটাইয়া দি—বোন...তাহাতে দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া বোন সংক্ষেপে জবাব দিয়াছিল,—না!

সেই ছোট জবাবটুকুর মধ্যে মনের কি ঝাঁজই না ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল! তার উপর মার অতিরিক্ত আদর! মেয়ে যা বলিবে, মা তাতেই সায় দিবেন, এইটাই না হইয়াছে সব-চেয়ে মস্ত বিপদ!

না হইলে স্বামীর ঘর ছাড়িয়া বোন আসিয়া যে তাদের এখানে পড়িয়া আছে, এ ব্যাপারে মাথা তার কতখানি নুইয়া থাকে! অন্ন-বস্ত্র বা বিলাস-ভূষণ জোগানোর কথা তো এ নয়...আসলে, বাহির হইতে এ ব্যাপারটা যে অত্যন্ত কদর্য্য দেখায়! তার ব্রজনাথের মত স্বামী!...

ব্রজনাথ যখন আবার বিবাহ করিল, এবং তারপর তার পাঁচজন বন্ধু আসিয়া এ সংবাদ লইয়া তারি বৈঠকখানায় এ-সম্বন্ধে আলোচনা জুড়িয়া দিল, তখন সে কি কম বেদনা পাইয়াছে? না, অপমানের তার কোনো সীমা ছিল?...কিন্তু সে কি করিবে! সে যে কতখানি নিরুপায়!...যদি কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে সে জোর করিয়া বোন্‌কে লইয়া গিয়া ব্রজনাথের সামনে হাজির করিয়া দিত, হাজির করিয়া দিয়া নিজে সে ব্রজনাথের কাছে মার্জ্জনা চাহিত!...বোন্ যদি তার স্বার্থের কথা তুলিয়া, মমতা-হীনতার বিষয়েও কোনো অভদ্র ইঙ্গিত করিত, হিসাব-নিকাশের কথা পাড়িত—এমন তো তর্কের মুখে সে পাড়িয়াছে, আর মা'ও সে তর্কে মেয়ের পক্ষে যোগ দিয়া তাকে বলিয়াছেন,—তোদের ভাবতে হবেনা রে বাপু, ওর আর ওর ছেলেমেয়ের জন্য যে বন্দোবস্ত করতে হয়, আমরাই তা করে যাবো—তোদের হাত-তোলায় ওকে থাকতে হবে না...ভয় নেই...এ যে কত বড় হীন, নীচ ও ইতর ইঙ্গিত...জোর করিয়া বোনকে ব্রজনাথের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে গেলে বোন এ-সব অভদ্র ইঙ্গিত তুলিলেও সে তা গ্রাহ্য করিত না। এ অপমান সে নীরবে মাথা পাতিয়া লইতে সর্ব্বক্ষণই রাজী! কিন্তু মা-বাপ তো শুনিবেন না! এজন্য ক্ষোভের দুঃখের তার আর কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না...আজ

থিয়েটারে আসিয়া ব্রজনাথকে দেখিবামাত্র এই-সব চিন্তাগুলা নূতন করিয়া আবার তার মনে উদয় হইল !

এখানে আসিয়াছিল সে খুব সহজ, লঘু, স্বচ্ছন্দ চিত্ত লইয়া আমোদের প্রত্যাশায়...কিন্তু যে আঘাত পাইল, সে আঘাতে আমোদের স্পৃহামাত্র আর তার মনে রহিল না ! মাঝে হইতে মনটা ছেঁচিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবার জো...

ওদিকে কন্‌সার্টের আর্ত্তনাদ সহসা থামিয়া গেল। ওই কোলাহলে একটু তবু স্বোয়াস্তি ছিল। এই যে এত-বড় কলরব-কোলাহলের আড়ালে তার মনের যা কোলাহল, তা একান্তে লোক-চক্ষুর অগোচরে বেশ আত্মগোপন করিয়াছিল, এখন সে কলরবের আড়াল খসিতে মনের সে কোলাহল সগর্জ্জনে এমন সাড়া তুলিল যে সে-গর্জ্জনে তার মন আর মাথা তুলিয়া যেন দাঁড়াইতে পারে না ! কন্‌সার্ট থামিলে তার মনে মস্ত বিভীষিকা জাগিয়া উঠিল। সামনের বক্সগুলার পানে একটা চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া সে ভাবিল, তবু ভালো, ব্রজনাথের সামনা-সামনি বসিয়া তাকে এই দীর্ঘ দাহের জ্বালায় জ্বলিতে হইবে না ! অশান্তিরও সীমা রহিল না—কোন্ কাহার কাছে কি অপরাধ, করিল আর তার লজ্জায় সে এমন খুন হইয়া যাইতেছে ! যে অপরাধী...সে বেশ পরম নিশ্চিন্ত মনে ঐ প্রোগ্রাম দেখিতেছে ! নিয়তির এ এক বিচিত্র লীলা বটে !

মঞ্চের পর্দ্দা উঠিলে পালা সুরু হইল। নাচ-গানের বিভ্রমের মধ্যে দেখা গেল, উপবনের মধ্যে রাজা শিলাসনে বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন—তাঁর মনে গভীর বেদনা। রাণী মহা-উদ্বিগ্ন হইয়া সখীদের ডাকিয়া ডাকিয়া কত গান, কত নাচের ফরমাশ করিলেন,—কত ভাবেই রাজার

মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইলেন, তবু রাজার মন আর পাওয়া যায় না! রাণী প্রমাদ গণিলেন। বসন্তোৎসবের এত আয়োজন, সব বুঝি ব্যর্থ হইয়া যায়! শেষে তিনি সখীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নূতন-আমদানি এক সখীকে আনাইলেন—কিন্তু তার তরুণ বয়স আর জোৎস্নার মত শ্রী...রাজার দৃষ্টির সামনে তাকে হাজির করাইতে রাণীর আতঙ্কও কম নয়! যদি রাণীর কপাল ভাঙ্গে? নূতন সখী আসিলে রাণী তাকে একটা পুষ্প-কুঞ্জের অন্তরালে দাঁড় করাইয়া আদেশ দিলেন,—গান গা,...এমন গান...যাতে দুনিয়া থেকে সব দুঃখ, সব জ্বালা, সব নৈরাশ্য, সব যাতনা ধুয়ে মুছে যায়!

সখী তখন গান ধরিল। যেমন তার গলা, তেমনি গানটুকু!... নলিনাক্ষর মত বিষয়ী লোকের মনও দুশ্চিন্তা ভুলিয়া এই গানের কথায় সুরে আবেশে ভরিয়া উঠিল! চমৎকার! খাসা! গান থামিলে দর্শকের দলে সঘন করতালি-ধ্বনি উঠিল—গায়িকা আর-একবার গানটুকু গাহিল। এ গান শুনিয়া ও-দিকে রাজার যেন চেতনা হইল। এতক্ষণ তিনি নিশ্চেতন নিস্পন্দ, মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়াছিলেন। গান থামিলে রাজা বলিলেন,—কে গায়! কে এ গান গায়!

রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাণী প্রমাদ গণিলেন। যদি রাজা গায়িকাকে দেখিয়া ফেলেন? সর্ব্বনাশ! সভয়ে তিনি সখীদের বলিয়া দিলেন—ওকে সরিয়ে দে, শীগগির...

সখীরা তাড়াতাড়ি তাকে সরাইতে ছুটিল। কিন্তু সে-দিকেও বিপদ! গায়িকাও রাজাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে—গদগদ স্বরে নিজের মনে বলিতেছে,—কি সুন্দর! কি সুন্দর!...রাণী দেখিলেন,

গায়িকা নড়ে না...তিনি ছুটিয়া আসিলেন, আসিয়া তাকে সবলে ধাক্কা দিয়া কহিলেন,—দূর হয়ে যা পিশাচী...গায়িকা সরিয়া গেল। কিন্তু...

রাণী দেখেন, রাজা তাকে দেখিয়া ফেলিয়াছেন, আর দেখিয়া তারি পিছনে স্বপ্নাভিভূতের মত চলিয়াছেন, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া—এসো, এসো, দূরে নয়, দূরে নয়—কাছে এসো, পাশে এসো...

একটা আতঙ্কের উদ্বেগে মুহূর্ত্তে যেন চারিদিকের আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। রাজা গায়িকার পিছনে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিলেন। রাণী সখীদের বুকে লুটাইয়া কাতর স্বরে কহিলেন,—আমার কপাল ভাঙ্গলো, সখী...

সহসা নলিনাক্ষর মনে হইল, নীরজার বুকে বেদনা জাগিবে না তো, এ দৃশ্যে? তারো যে এমনি দশা! তার উপর ব্রজনাথ তার সেই নূতন বধূকে লইয়া এই থিয়েটারে বসিয়া এই নাটকেরি অভিনয় দেখিতেছে!...

পর্দ্দা পড়িয়া গেলে আবার সেই কন্‌সার্ট। তবে এবার তার বিক্রম তেমন প্রচণ্ড নয়...মৃদু নিঃস্বন!

নীরজা সুধাকে কহিল,—কেমন দেখচিস্ বৌ?

সুধা কহিল,—চমৎকার ভাই...না?

নীরজা কহিল,—দূর! রাজা একটা গান শুনলেন, অমনি দু'হাত তুলে কোথায় কার পিছনে ছুটলেন...

কথাটা নলিনাক্ষর কাণে গেল। সে ভাবিল,—হারে অভাগিনী, জীবনটার অর্থও তুই বুঝিলি না, কোনোদিন! যৌবনে মনের যে ক্ষুধা, দরদ-প্রীতি পাইবার যে পিপাসা,...মায়া-প্রেমের যে আকুল গান.. এ-সবের কি কোনো পরিচয় জানিলি না!...আশ্চর্য্য! কিম্বা মন বলিয়া

বস্তুটাই তোর বুকের মধ্যে তোর বিধাতা পুরিয়া দিতে ভুলিয়াছেন! তীব্র ঝাঁজ আর কঠিন স্বার্থ বুকে পুরিয়াই বসিয়া আছিস চিরদিন, এমন নির্ব্বিকার হইয়া!...তার রাগ ধরিল। সে উঠিয়া পড়িল এবং উঠিয়া পাশের বারান্দায় আসিয়া উদ্বিগ্ন মনে পায়চারি করিতে লাগিল।

৫

এমনি পায়চারি করিতে করিতে সহসা নলিনাক্ষ ভাবিল, ব্রজনাথের সঙ্গে দেখা করিয়া এ-সব কথা না পাড়ুক, এমনি আলাপ করিতে দোষ কি! কিন্তু তা বলিয়া ব্রজনাথের বক্সেও তো হুম্ করিয়া গিয়া সে উপস্থিত হইতে পারে না! সঙ্গে আছে তার নূতন বধূ...কি জানি, বধূর যদি বিরক্তি লাগে! তার সঙ্গে ব্রজনাথের যা সম্পর্ক, বধূর পক্ষে সেটা তেমন প্রীতির বলিয়া গণ্য না হওয়াই বেশী স্বাভাবিক! ব্রজনাথের সঙ্গে তার এককালে যেন খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল,...কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া তার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। ইচ্ছা থাকিলেও নিজের বাড়ীর তরফ হইতে মা ও বোনের নিষেধের ভয়ে সে দেখা করিতে পারে নাই, নহিলে কবে গিয়া দেখা করিয়া এই বিশ্রী ব্যাপারটার সমাধানও হয়তো সে করিয়া ফেলিত! আজ দৈবাৎ ব্রজনাথকে এত কাছে পাইয়াও সে আলাপটুকুর দ্বারা শিষ্টাচার পালন করিবে না? না হয়, পারিবারিক কথাগুলাই সে পাড়িবে না। বিশেষ বোন যখন তা চায় না, এবং ব্রজনাথেরও তাহাতে হয়তো বেশ প্রীতির সঞ্চার হইবে না...

নলিনাক্ষর কৌতূহল প্রচণ্ড বাড়িয়া উঠিতেছিল...সঙ্গে সঙ্গে একটু সমবেদনা। এই বয়সে পত্নীর দিক হইতে কোনোরূপ দরদ-প্রীতি না পাওয়া খুবই দুর্ভাগ্যের কথা...পত্নীর অগাধ অসীম প্রেমে যার বক্ষ

স্নিগ্ধ-শীতল আরাম পাইয়াছে, সে হয়তো এ-দুঃখের যাতনাটুকু তেমন বুঝিবে না। নলিনাক্ষরও বুঝিবার কথা নয়! কিন্তু সে যে দুজনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচিত—দুজনের মধ্যে দু-একটা ছোট-খাটো বিপ্লবও সে চক্ষে দেখিয়াছে। তাছাড়া ব্রজনাথ তার কাছে দু-একবার নিজের মর্ম্মবেদনার গূঢ় কাহিনীটুকুও সখেদে বর্ণনা করিয়াছে!...তার এখন এ কৌতূহলও হইতেছিল, এই নূতন বধূটিকে পাইয়া ব্রজনাথের প্রাণের সে দারুণ অভাব ঘুচিয়াছে তো? তার অশান্তির উচ্ছেদ হইয়াছে তো?... পা তার চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু কি বলিয়া ঐ বক্সে সে যায়!

ভাগ্য মুখ তুলিয়া চাহিল। ব্রজনাথ সহসা তার বক্স হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল,—বয়...

মাথায় তকমা দেওয়া সাদা পাগড়ী আঁটা, সাদা চাপকান ও পায়জামা-পরা এক ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। ব্রজনাথ তাকে কহিল,—দো'ঠো আইসক্রীম-সোডা বরফ দে'কে—পাঁচো নম্বর বক্স...জলদি লাও...

—জী, হুজুর...বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। ব্রজনাথ আবার তার বক্সে ঢুকিবে বলিয়া যেমন ফিরিয়াছে, অমনি নলিনাক্ষ ক্ষিপ্র চরণে একেবারে তার পাশে আসিয়া ডাকিল,—ব্রজনাথ...

ব্রজনাথ বিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল! কহিল—নলিন...

নলিনাক্ষ কহিল,—হ্যাঁ। তুমিও থিয়েটার দেখতে এসেচো?

ব্রজনাথ কহিল,—হ্যাঁ। তার পা যেন কাঁপিয়া উঠিল। যেন সে কত-বড় অপরাধী—চোরাই মাল-সমেত মালিকের কাছে যেন ধরা পড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে, এমনি তার ভাব!

নলিনাক্ষ কহিল,—একলা এসেচো ?

ব্রজনাথ এ প্রশ্নে যেন এতটুকু হইয়া গেল। এইখানেই একটু বাধিল। কিন্তু কিসেরই বা বাধা ! তার কি অপরাধ ?...সে কহিল,—না—আমি বিবাহ করেচি আবার, শুনেচো, বোধ হয় ?

নলিনাক্ষ কহিল,—শুনেচি। তাঁকে নিয়ে এসেচো বুঝি ?

ব্রজনাথ কহিল—হ্যাঁ। তুমি একলা এসেচো ?

নলিনাক্ষর বুকও একটু কাঁপিল। সে কহিল—না,—আমার স্ত্রী এসেচেন...

তার কথা শেষ হইবার পূর্বেই ব্রজনাথ কহিল,—সুধাদিদি এসেচেন ! বটে !...ব্রজনাথ একটু উৎফুল্ল ভাবেই প্রশ্ন করিল।

নলিনাক্ষ অপ্রতিভভাবে কহিল,—সেই সঙ্গে নীরুও এসেচে !

দু'জনে যে জায়গাটুকুতে দাঁড়াইয়াছিল, সহসা সে জায়গাটুকু যেন সশব্দে ফাটিয়া মধ্যে মস্ত ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া তুলিল—কত সুদূর সে ব্যবধান ! কাহারো মুখে কোনো কথা নাই—দুজনের নড়িবার শক্তি অবধি রহিত ! দুজনেই প্রমাদ গণিল, তাইতো, এর পর কি কথা কওয়া যায় ? সে কথা কে প্রথম কহিবে ? এবং কথা যদি কওয়া না যায়, তাহা হইলে পরস্পরের কাছে পরস্পরে বিদায়ই বা লইবে কি ছলে !

ব্রজনাথ ভাবিতেছিল, যার জন্য প্রাণটা অমন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তার তরুণ মনের উপর যে শুধু উপদ্রবেরই সৃষ্টি করিয়াছে,—এমন উপদ্রব যে, চলিয়া গেলেও বেদনার জ্বালা মনকে সমভাবে জ্বালাইয়াছে...সে তার এত কাছে ! যে শান্তিটুকু বহু আয়াসে পাইয়া সে আরামে বাঁচিয়াছে...তার সেই শান্তির পাশটিতেই জীবনের সেই

প্রচণ্ড অভিশাপ, দারুণ অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে...যদি এখানেও সে কোনো উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া বসে!...নলিনাক্ষ ভাবিতেছিল,—তার বোন নীরুই ব্রজনাথের বুকে একদিন বিপ্লবের ঝড় তুলিয়াছিল! মস্ত ঝড়! তাকে এড়াইয়া যদি বা এখন সে একটু আরাম পাইয়া বাঁচিয়াছে, তার সে আরামে নলিন বাধা দিবে!...

বয়টা আসিয়া এ-দায়ে রক্ষা করিল। ব্রজনাথ যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে কহিল,—আস্‌চি ভাই...

বয়কে লইয়া সে গিয়া নিজের বক্সে ঢুকিল। নলিনাক্ষও ভারী বুকে টলিতে টলিতে আসিয়া নিজের বক্সে সুধার ঠিক পিছনে আসন গ্রহণ করিল। সুধা কহিল—কিছু পাণ আনাও না গা...ঠাকুরঝি বলছিল, পাণ না হলে ভালো লাগচে না।

নলিনের রাগ ধরিল। হতভাগিনী, আরামের তুচ্ছ কণাটুকুর দিকেও এমন মনোযোগ...অথচ নারীর জীবনে যা প্রধান সম্বল, সে-সম্বলকে তাচ্ছল্যের ভরে দূরে ঠেলিয়া বেশ আছিস তো...! নলিন কহিল—আচ্ছা, পাণ আনিয়ে দিচ্ছি। ঐ ড্রপ উঠচে। এখনি প্লে সুরু হবে। এখন থিয়েটার দেখতে বলো।

এ কথায় সুধা স্বামীর মুখের পানে চাহিল। নলিনাক্ষর মুখ গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি উদাস!

সহসা স্বামীর এ ভাবান্তরে সে বিস্মিত হইল—কিন্তু কোনো প্রশ্ন করিতে তার ভরসা হইল না। ওদিকে পর্দা উঠিয়া নূতন দৃশ্য সুরু হইয়াছে। নদী-তীরে এক মন্দিরের দৃশ্য। সে সেই দৃশ্যপটের দিকে চাহিয়া রহিল।

মঞ্চের উপর ও-দিকে দু'এক জন নর-নারীর কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, রাজ্যের কি খপরাখপরের কথা...এমন সময় সুধার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া নীরজার অলক্ষ্যে নলিন কহিল,—শুনচো ?

সুধার দৃষ্টি ছিল মন্দিরের পানে, মন কিন্তু সেদিকে ছিল না। মন নলিনাক্ষর পানে ; তাই নলিনাক্ষ কথা কহিবা মাত্র সুধা কহিল,—কি ?

নলিন কহিল,—দেখা হলো।...নলিন নীরজার পানে চাহিল ; নীরজা এক-মনে অভিনয় দেখিতেছে।

সুধা মৃদু কণ্ঠে কহিল—কার সঙ্গে ? ঠাকুর-জামাই ?

তেমনি মৃদু স্বরে নলিন জবাব দিল,—হাঁ।

সুধা কহিল,—কি বললেন ?

নলিন কহিল,—বিশেষ কিছু নয়। তবে তুমি এসেচো শুনে একটু খুশী হলো...তারপর নীরুর নাম করতেই একেবারে চুপ !...

সুধা একটা নিশ্বাস ফেলিল মাত্র, কোনো কথা কহিল না—তারপর নীরজার পানে একবার চাহিয়া তাকে লক্ষ্য করিল—কি নিশ্চিন্ত মনেই থিয়েটার দেখিতেছে ! এমনি ভাবেই স্বামীর আদর-সোহাগের মর্ম্ম না বুঝিয়া জীবনটাকে বেশ কাটাইয়া দিতেছে !...আশ্চর্য্য !...

তারপর স্বামীর দিকে হেলিয়া মৃদু কণ্ঠে সুধা কহিল,—দেখা হয় না ?

নলিন কহিল,—কার সঙ্গে ?

সুধা কহিল,—ঠাকুর-জামাইয়ের সঙ্গে।

নলিন কহিল,—তুমি দেখা করবে ?

ডাগর চোখের দৃষ্টিতে মিনতি ঢালিয়া সুধা নলিনের পানে চাহিল, কহিল— কোনো দোষ না হয় যদি তো দেখা করি। কি বলো ?

নলিন কহিল,—না, দোষ আবার কি! তবে কোথায় দেখা করবে? এখানে তো হয় না—ও এ-বক্সে আসবে না!

সুধা কহিল—ত্যাখো না, বাহিরে ওধারে বারান্দা আছে না?

—সেখানে? নীরু যদি বলে, কোথায় যাচ্ছো?

সুধা কহিল—সে আমি জবাব দেবো'খন...ঠাকুরঝিকে যা-হয়-কিছু বলবো।

নলিন কহিল,—না। শেষে যদি ও...

কথা আর শেষ করিতে হইল না। ছ'জনেই এ কথার শেষাংশটুকু কল্পনা করিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

নলিন কহিল,—আচ্ছা, দেখচি...ওদিকে পর্দ্দা পড়ুক...

নীচে মঞ্চের উপর অভিনয় চলিতে লাগিল—পুতুলের চিত্র-করা চোখ লইয়া নলিন ও সুধা ছ'জনে মঞ্চের পানে চাহিয়া রহিল। নাটকের এক বর্ণও তাদের মনের দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল না। চোখের সামনে নানা ভঙ্গীতে হাত-পা নাড়িয়া কথা কহিয়া নাচিয়া গাহিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দল নাটকের গতি অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিল। ...হঠাৎ ভীষণ করতালি-ধ্বনির মধ্যে আবার এক সময়ে পর্দ্দা পড়িয়া গেল। সুধার যেন চমক ভাঙ্গিল। সে কহিল— ঐ গো, ড্রপ পড়েচে!

নলিনাক্ষ উঠিল...তারপর কহিল,—কিন্তু দেখো, এ সব অপ্রীতিকর কথা যেন তুলো না। বেচারা এসেচে বৌ নিয়ে থিয়েটার দেখতে, একটু আমোদ করতে...তার মধ্যে এ সব ঝগড়া-কচকচির কথা—

সুধা কহিল,—আমায় বলতে হবে না গো—সে বুদ্ধিটুকু আমার খুব আছে!

নলিন কহিল,—তা জানি। তাহলে আর...কথা শেষ না করিয়াই সে বাহিরে চলিয়া গেল।

সুধা কহিল,—পাণ আনিয়ে দিয়ো তাহলে...ভুলো না যেন...

নীরজা কহিল,—দাদাকে পাঠালি বুঝি পাণ আনতে?

সুধা সংক্ষেপে জবাব দিল,—হ্যাঁ। বলিয়া পাছে আর কোনো প্রশ্নোত্তর চলে, তাই সে-প্রশ্নোত্তর এড়াইবার অভিপ্রায়ে হাতের প্রোগ্রামখানার প্রতি সুগভীর মনঃ-সংযোগ করিয়া বসিল!......

নীরজা কহিল,—সামনের বক্সে ঐ মেয়েটার শাড়ীখানা ত্যাখ্... বেশ রংটি, না ভাই?

সুধা সেদিকে চাহিল, পরে কহিল,—ঐ তো হেলিয়োট্রোপ-শাড়ী?

নীরজা কহিল,—হ্যাঁ, সাধারণ হেলিয়োট্রোপের মত নয় কিন্তু ভাই...

হাসিয়া সুধা কহিল,—অসাধারণ আবার কোন্‌খানটায় দেখলে তুমি?

নীরজা কহিল,—নিশ্চয় সাধারণ রং নয়।

সুধা কহিল,—সাধারণই...আমার চোখে তাই ঠেকচে।

নীরজা কহিল,—কক্‌খনো নয়। তোর চোখ খারাপ হয়েচে. দাদাকে বলে চশমা নে।

হাসিয়া সুধা কহিল,—তাই নেবো।

নীরজা কহিল,—তামাসা নয়। সত্যি! তারপর কহিল—দাদা আসুক, দাদাকে বলবো, দেখে বিচার করতে।

সুধা কহিল,—তোমাদের ভাই-বোনের নজরের দোষ হয়েচে বলবো তাহলে।

একটু পরেই নলিন ফিরিল; হাতে একরাশ পাণের দোনা। সুধা সেই পাণের দোনাগুলা খালি চেয়ারখানার উপর রাখিয়া বলিল—আমি একটু উঠচি ভাই ঠাকুরঝি...বসে থেকে থেকে পা কেমন ধরে গেছে...

নীরজা কহিল—গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতে হবে নাকি, তোর? কথাটা বলিয়া সে হাসিল।

সুধা কহিল,—তা যেতে পারলে মন্দ হয় না! বেশ জ্যোৎস্না রাত্রি আছে কিন্তু...

নীরজা দোনা খুলিয়া দুটা পাণ লইয়া একসঙ্গে মুখে পুরিল। সুধা কহিল,—তুমি কি বসেই থাকবে?

নীরজা কহিল,—হ্যাঁ। থিয়েটার দেখতে এসেচি, থিয়েটার দেখবো। এ তো মেলা নয় যে চারি ধারে ঘুরে বেড়াবো!

সুধা কহিল,—তাহলে তুমি বসো ভাই...আমি একটু হাওয়া খাইগে। মাথাও কেমন দপ-দপ করচে—এই ভিড়ের গরম—

নীরজা কহিল,—তোর সব তাতেই অসহ্য-বোধ!...

সুধা হাসিল, হাসিয়া কহিল—এমনি পোড়া কপালই আমার, বটে! তারপর নলিনাক্ষর পানে চাহিয়া কহিল,—একটু বাইরে চলো না গা... আমার মাথা ধরে উঠেচে এই গরমে...একটু হাওয়া পেলে আরাম হয়।

নলিনাক্ষ কহিল,—নিরু একলাটি থাকবে?

নীরজা কহিল,—তা থাকবো।

সুধা কহিল,—ভয় নেই গো...কাছেই কেল্লা নেই যে সেখান থেকে গোরা এসে তোমার রূপসী তরুণী বোনটীকে ধরে নিয়ে যাবে!...

নীরজা কহিল—সে ভয় তোমার যত, আমার তত নয়! তোমার মত রূপসী পাশে থাকতে কি আর আমার পানে তাকাবার কথা গোরার-মনে থাকবে!...

নলিনাক্ষ কহিল—এসো...

সুধা নলিনাক্ষর সঙ্গে চলিল। দুজনে খোলা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সুধা কহিল,—ঠাকুরজামাইকে বলোগে—আমি দেখা করবো।

নলিনাক্ষ কহিল,—না, তুমি দাঁড়াও, আমি তাকে ডাকাচ্ছি।

নলিনাক্ষ চলিয়া গেল, গিয়া পাঁচ নম্বরের বক্সের ধারে দাঁড়াইয়া ডাকিল—ব্রজনাথ...

ব্রজনাথ বধূকে কি বুঝাইতেছিল—নলিনাক্ষর আহ্বানে ফিরিয়া দেখিল; এবং ফিরিয়া নলিনাক্ষকে দেখিবামাত্র সে তার কাছে আসিল। কহিল,—কি হে?

নলিনাক্ষ কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—একটু বারান্দায় আসবে? মানে, আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।...

ব্রজনাথ সাগ্রহে কহিল,—সুধাদি!...তারপর চমকিয়া চুপ করিল, পরক্ষণে কহিল,—কিন্তু সঙ্গে...?

নলিনাক্ষ কহিল,—ভয় নেই। আর কেউ নেই। সে জানেও না যে, তুমি আজ থিয়েটারে এসেচো, আর কাছাকাছি এই বক্সে আছো।

ব্রজনাথ কহিল,—তাকে যেন আমার কথা বলো না!...

নলিনাক্ষ কহিল—না, না। তুমি পাগল হয়েচো! তোমার বেদনা কি আমি বুঝিনা, ভাই?...

নলিনাক্ষ ব্রজনাথকে সঙ্গে করিয়া বারান্দায় আসিল। সুধা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নলিনাক্ষ কহিল—ব্রজনাথ এসেচে গো...

সুধা অগ্রসর হইয়া আসিয়া নমস্কার করিল, কহিল—ভালো আছেন?

ব্রজনাথ ভড়কাইয়া গেল; প্রতি-নমস্কার করিয়া কোনো রকমে কহিল,—হ্যাঁ। তুমি ভালো আছ, সুধাদি?...

ঘাড় নাড়িয়া সুধা জানাইল, সে ভালো আছে।

তার পর?...

ব্রজনাথ কহিল,—কেমন থিয়েটার দেখচো, বল সুধাদি...?

সুধা কহিল,—মন্দ নয়।...আপনি একা এসেচেন...?

ব্রজনাথ কহিল—না।

সুধা কহিল—নতুন বৌ সঙ্গে আছে?

ব্রজনাথ কহিল,—হ্যাঁ।

সুধা কহিল,—আলাপ হয় না?

ব্রজনাথ কহিল,—কেন হবে না?...

সুধা কহিল,—শুনেচি, খুব সুন্দরী...না হয় একবার দেখালেনই...

হাসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—কোনো বাধা নেই...

সুধা কহিল,—আনবেন?

ব্রজনাথ কহিল,—এখানে?...কিন্তু...

সুধা কহিল,—ভয় নেই। ঠাকুরঝি জানবে না—বা, এখানে সে আসবেও না...

ব্রজনাথ চুপ করিয়া রহিল। সুধা কহিল,—কি বলে পরিচয় দেবেন, ভাবচেন, বুঝি?

ব্রজনাথ কহিল,—তাতে ভাববার কিছু নেই! আসল যা পরিচয়, তাই বলবো। বলবো যে, এটি আমার স্নেহময়ী সুধাদি...

এ কথায় সুধার বড় আনন্দ হইল। ঠাকুর-জামাই তাহা হইলে তাহাকে পর করিয়া দেন নাই! তার প্রতি ঠাকুর-জামাইয়ের স্নেহ তেমনি অটুট আছে! তার কেমন সাহসও হইল। সে কহিল,—আমাদের সঙ্গেও কি দেখা করতে নেই?

ব্রজনাথ হাসিল,—সে খুব লজ্জিতের হাসি। হাসিয়া সে কহিল,—কি করে কোথায় দেখা করবো ভাই সুধাদি, বলে দাও তো...

সুধা কহিল,—তা বটে!...কিন্তু ঠাকুর-জামাই, একটি কথা বলবো, রাগ করবেন না?

ব্রজনাথ কহিল,—তোমার উপর কখনো রাগ করেচি সুধাদি যে আজ এ কথা বলচো?

সুধা কহিল,—রাগের কারণ হতে পারে, এমন কথা কখনো বলিনি তো...

ব্রজনাথ কহিল,—এখনই বা কি কারণ থাকতে পারে...?

সুধা কহিল,—ঠাকুরঝিকে কি চিরদিনের মতই ত্যাগ করলেন? স্ত্রী, একদিন তাকে বিবাহ করেচেন...ছেলে-মেয়ে হয়েচে...

ব্রজনাথ আবার হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আমি তো ত্যাগ করিনি...

সুধা কহিল,—আমাদের ওখানেই ঠাকুরঝি পড়ে থাকবে চিরকাল? এতে আপনার...

বাধা দিয়া ব্রজনাথ কহিল,—আমার ইচ্ছায় তিনি আমার গৃহ ত্যাগ

করে আসেন নি—আমি তাঁর পুনঃ-প্রবেশও নিষেধ করি নি...তাঁর যাওয়া-আসা তো সম্পূর্ণভাবে তাঁরি ইচ্ছাধীন...

সুধা কহিল—তা বটে! যাক ও সব বাজে কথা...আপনার গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেচি...আলাপ করিয়ে দেবেন?

ব্রজনাথ কহিল,—সানন্দে...

সুধা নলিনাক্ষর দিকে চাহিল, চাহিয়া কহিল—তুমি তাহলে যাও গো, তোমার বোনের কাছে একটু বসো গে...তাকে চৌকি দিয়ো—এদিকে না এসে পড়ে...

নলিনাক্ষ দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া চলিয়া গেল।

ব্রজনাথ কহিল—আমাদের বক্সে আসবে, সুধাদি?

সুধা কহিল,—এইখানে আনবেন না?

—বেশ, তাই হোক। বলিয়া ব্রজনাথ চলিয়া গেল এবং সুধা ভাবিতেছিল, কি বলিয়া সে আলাপ সুরু করিবে! কোনো উপায় নির্দ্দেশ করিয়া লইবার পূর্ব্বেই ব্রজনাথ ফিরিল; সঙ্গে নীলিমা। যেমন রূপ, তেমনি সরল বেশ-ভূষায় সে রূপ যেন আরো উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে! ব্রজনাথ নীলিমার দিকে চাহিয়া কহিল—ইনি হলেন আমার পরম স্নেহময়ী সুধাদিদি...বুঝলে নীলিমা—তোমার সঙ্গে ইনি আলাপ করতে চান। তোমরা দুজনে আলাপ কর...বলিয়া সে একটু দূরে সরিয়া গেল।

৭

নীলিমার পানে স্তব্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সুধা কহিল—তোমার নামটি কি ভাই ?

সলজ্জভাবে নীলিমা কহিল,—নীলিমা।

সুধা কহিল,—যেমন রূপ, তেমনি নামটিও! তোমার ভাই সবই সুন্দর! নাহলে আর . ইচ্ছা করিয়াই কথাটা সুধা শেষ করিল না।

নীলিমা সুধার পানে চাহিল, কহিল—আপনি...?

সুধা কহিল,—আপনি না! তুমি বলো। আমি তোমার দিদি হই,—সুধাদিদি—বুঝলে! বাকী পরিচয় যদি জানতে চাও, তাহলে তোমার বরকে জিজ্ঞাসা করো।...

নীলিমা সলজ্জভাবে হাসিয়া মাথা নামাইল। সুধা তাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; তারপর সস্নেহে তার চিবুক ধরিয়া সস্নেহে প্রশ্ন করিল,—বর তোমায় খুব ভালোবাসে তো নীলিমা ?

নীলিমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া লজ্জার বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। সে আবার মুখ নামাইল। সুধা বড় দুষ্ট—আবার সেই প্রশ্ন তুলিল, কহিল,—আমায় বলতে হয়। আমি যে সুধাদিদি হই...লক্ষ্মী বোনটি, বলো—লজ্জা করো না।

ঘাড় নাড়িয়া নীলিমা জানাইল, বর তাকে ভালোবাসে।

সুধা কহিল,—তাই তো উচিত। এ মুখখানি দেখে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারে কখনো! শুনে ভারী খুশী হলুম ভাই। আশীর্ব্বাদ করি, এ ভালোবাসা অটুট্ থাক্!

সুধার মুখে কথাটা একটু অত্যুক্তির মত শুনাইল! সেটা সুধার বয়স অল্প বলিয়াই...বোধ হয়! কথাটা ব্রজনাথের কাণে গেল। সে কাছে আসিয়া হাসিয়া কহিল,—সুধাদির মত অমনি ভাবেই তুমি বরের আদরিণী হয়ে থাকো—আমি এটুকু যোগ করে দিলুম, সুধাদির আশীর্ব্বাদের সঙ্গে!..

সুধা কপট রোষের ভঙ্গীতে কহিল,—হাঁ, আপনি সব জানেন কি না...না?

ব্রজনাথ কহিল,—জানিই তো! নলিনাক্ষর নলিন নয়নদুটী যে সুধাময়,—এ খপর কি আমার জানতে কোনো দিন বাকী ছিল, সুধাদি? নলিনের বুকে সুধা, মুখে সুধা, চোখের দৃষ্টিতে সুধা...সাধে কি আমি নলিনকে সুধাময় বলি, ভাই সুধাদি...!

সুধা কহিল,—যান্, আপনি ভারী দুষ্টু...!

ব্রজনাথ কহিল,—বটেই তো! সত্যি কথা বললেই আজকালকার দিনে মানুষ দুষ্টু হয়!...

সুধা কহিল,—একটা কথা বলবো?

ব্রজনাথ কহিল,—বল, ভূমিকার দরকার নেই!

সুধা কহিল,—এক দিন নীলিমা বোনটীকে দেখতে যদি আপনাদের বাড়ী যাই, তাতে আপত্তি আছে?

ব্রজনাথ থামিল, থামিয়া কহিল,—তুমি একলা যাবে? না, চেড়ী-বেষ্টিতা হয়ে যাবে?

সুধা কহিল,—ছি! ও কি কথা!...তবে, ভয় নেই, আমি একলাই যাবো। তাহলেও সঙ্গে, হ্যাঁ,...একজন থাকবে বৈ কি। তাকে না নিয়ে যাবো কি করে!

ব্রজনাথ কহিল,—হাকিমের পেয়াদাটি সঙ্গে যাবে বুঝি!

সুধা কহিল,—বটে, পেয়াদা বলা হলো...আমি তাকে বলে দেবো'খন!

ব্রজনাথ কহিল,—দোহাই সুধাদিদি...তাহলে সে শালা প্রমোদ-শালার অর্দ্ধেক আনন্দই বোধ হয় লুট করে একে হত্যাশালায় পরিণত করবে!...

কথার অর্থ সুধা ঠিক বুঝিল না। সে ব্রজনাথের পানে চাহিয়া রহিল। ব্রজনাথ কহিল—অর্থাৎ আমাদের আনন্দ-সভার অর্দ্ধেক আনন্দর জোগান সে দেবে—তু'জনকেই তাই স্বাগত বলচি আমরা তু'জনে, এখন এবং এখান থেকেই!...

ওদিকে এক-ঝাঁক গলায় একটা হট্টগোলের সঙ্গে বাজনার শব্দ শুনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড রব,—সাইলেন্স!...সুধা কহিল,—ঐ পালা সুরু হলো। যাও ভাই নীলিমা; থিয়েটার ত্মাখো গে! আলাপ হলো তো—একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে গিয়ে তোমাদের কাব্য-সুখে ব্যাঘাত ঘটাবো।

নীলিমা সস্নেহে সুধার তুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—একদিন যেয়ো দিদি, সত্যি...

ব্রজনাথ কহিল,—কাব্য-সুখে তাতে ব্যাঘাত ঘটবে না,—সুধাদি। মিছে ভয় দেখাচ্ছো। আমাদের কাব্য-সুখ তাতে আরো নিবিড় ঘনীভূত

হয়ে উঠবে...যেমন দুধ ঘন হয়ে ক্ষীর জমে...তেমনি জমে উঠবে, আমাদের কাব্য-সুখ !...

—আচ্ছা, আচ্ছা, তখন দেখা যাবে...বলিয়া সুধা হাসিয়া উঠিল। তারপর নীলিমাকে কহিল,—মনে থাকবে তো ? ভুলে যাবে না ?

ঘাড় নাড়িয়া নীলিমা কহিল,—না।

—তাহলেই ঢের হবে, ভাই। বলিয়া সুধা আবার কহিল,—এখন থিয়েটার ছাখোগে...এইটেই শেষ অঙ্ক। ভালো লাগচে তো ?

—হ্যাঁ। বলিয়া নীলিমা ব্রজনাথের সঙ্গে তার বক্সে চলিয়া গেল। সুধাও আসিয়া নীরজার পাশে বসিল। নীরজা কহিল—মাথা-ধরা ছাড়লো রে ?

সুধা কহিল,—অনেকটা।...

নীরজা কহিল,—তোদের সব বাড়াবাড়ি। ছু'দণ্ড থিয়েটার দেখতে এসেও চুপ করে এক ঠাঁই বসতে পারিস না—যেন নাচতে সুরু করে দিছিস্...

হাসিয়া সুধা কহিল,—আমি যে নৃত্যময়ী! তাছাড়া, থিয়েটারও তো নৃত্যশালা। ঐ ছাখো না ভাই, ওধারে সকলে মিলে নাচতে লেগে গেছে !

নীরজা কহিল,—মরণ ! কি কথায় কি কথা যে বলিস, তোর কিছুর ঠিক নেই !

সুধা কহিল,—কথা কেমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে ভাই ঠাকুরঝি—নে বড্ড বেশী আমোদ হচ্ছে কি না...

নীরজা কহিল,—হঠাৎ এত আমোদ উথলে উঠলো কেন ?

সুধা কহিল,—কি জানি, ভাই, হঠাৎ কেমন অমন হয় আমার !

নীরজা কহিল,—মন্দ নয় !...

নীচে অভিনয় চলিতে লাগিল। উপরের বক্সে বসিয়া নীরজা অভিনয় দেখিতে লাগিল। আর সুধা ? ঐ নাচ-গান হাসি-অশ্রু-ভরা অভিনয় তার মনের কোণ হইতে সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। আনন্দে-বেদনায় তার মন মুহুর্মুহুঃ দোল্ খাইতেছিল। ঐ ব্রজনাথ...স্ত্রীর প্রেমে আজ তার বুকের দাহ জুড়াইয়াছে—হাস্যময়ী রূপময়ী বধূ ! আর নীরু ? অভাগিনী ! অভাগিনীই বা বলি কেন ? পাষাণী ! মনের মধ্যে এক প্রকাণ্ড পাষাণ গড়িয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে ! স্বামীর সঙ্গ ছাড়িয়া কি লইয়াই যে এ-বয়সে ও ভুলিয়া আছে ! অনাসৃষ্টি ব্যাপার ! মুগ্ধ হইয়া বসিয়া অভিনয় দেখিতেছে ! প্রাণের উপর কত বড় মর্ম্মান্তিক অভিনয় সত্য করিয়া ঘটিতেছে, সেদিকে হুঁশ নাই ! ভালোও তো লাগে ! সাজ-সজ্জা, বিলাস-ভূষণ...এ-সবেও প্রখর দৃষ্টি... আশ্চর্য্য !

তার মনে হইল, যদি এমন দুর্ভাগ্য তার কখনো হয়...নলিনাক্ষ তার পানে ফিরিয়া না চায়...? ভাবিতে তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল ! তাহা হইলে হাসি-খেলা, চলাফেরা...কখনো না। বিষ খাইয়া বা যেমন করিয়া পারে, সে মরিবে—একদণ্ড বাঁচিবে না ! কম্পিত বক্ষে সে নলিনাক্ষর পানে চাহিল। নলিনাক্ষ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অভিনয় দেখিতেছে ?...কে জানে !

মাথাটা হেলাইয়া দিয়া সে নলিনাক্ষর পানে ঝুঁকিল, কহিল—থিয়েটার দেখচো ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নলিনাক্ষ কহিল—দেখচি বৈ কি।

সুধা কহিল,—কখনো না। তুমি কি ভাবচো!...

নলিনাক্ষ সুধার পানে চাহিল। তার দুই চোখের দৃষ্টিতে বেদনার কি নিবেদন যে ফুটিয়া রহিয়াছে! নলিনাক্ষর মনে হইল, ও মুখখানি... সে চমকিয়া উঠিল, না—এ থিয়েটার, তার নিজের সে নির্জ্জন কক্ষ নয় তো! ঠিক!...

সুধা ঠিক ধরিয়াছে...নলিন থিয়েটার দেখিতেছিল না—অনেক কথা ভাবিতেছিল! ব্রজনাথের কথা, নীরজার কথা, নীলিমার কথা!... বোনটাকে জোর করিয়া যদি ব্রজনাথের ঘরে সে রাখিয়া আসে? কিন্তু ব্রজনাথ আর নীলিমার ওই মিলনের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হাসি, পূর্ণিমার নিষ্কলঙ্ক চাঁদের জ্যোৎস্নার মতই অমলিন, শুভ্র...সে হাসি বিপ্লবের মেঘে ঢাকিয়া দিবে? এখন তা আর হয় না...তার কি অধিকার আছে, উহাদের মিলন-রাগিণীর ওই সুরটুকুর মাঝে কর্কশ কলরব তুলিয়া সে-সুর ছিন্ন করে! নীরজা...বোন,...সে যদি নিজে তার পাওনা ছাড়িয়া দেয়, তো অপরের এত মাথাব্যথা কিসের যে সে পাওনা আদায় করিয়া দিবে! তাছাড়া এখন ওদের হিসাব আরো জটিল হইয়া উঠিয়াছে!

সুধা কহিল,—বেশ মেয়েটি...যেমন কথা, তেমনি হাসি-হাসি মুখখানি...

নলিনাক্ষ কহিল,—ব্রজনাথ বেচারা এ্যাদ্দিনে সুখী হয়েচে...

সুধা কহিল,—তবু ভয়ে অস্থির আমাদের দেখে...ঠাকুরঝি সঙ্গে এসেচে বলে...

নলিনাক্ষ কহিল,—নীরুর জ্ঞান তো কোনো দিন হলো না...

সুধা কহিল,—একদিন ওদের ওখানে যাবো. বলেচি...

নলিন কহিল,—মা যদি পছন্দ না করেন ?

সুধা কহিল,—কেউ জানতে পার্‌বেন না. এমনভাবে যেতে হবে। পারবে না উপায় করতে? ধরো, আর কোনোখানে যেন যাচ্ছি...! আমার শৈলদির ওখানে যাচ্ছি বলে যদি যাই ?

নলিন কহিল,—কিন্তু ঘরের গাড়ী...ড্রাইভার যদি কথায় কথায় বলে. জামাইবাবুর বাড়ী গেছলুম...

সুধা কহিল,—ট্যাক্সি করে যাবো...

নলিন কহিল,—হঠাৎ ট্যাক্সি...?

সুধা কহিল,—তা বটে ! আচ্ছা, ভেবে দেখা যাবে...

নীরজা সুধাকে একটা ধাক্কা দিয়া ডাকিল,—বৌ...

সুধা কহিল,—ঠাকুরঝি...

নীরজা কহিল,—তুই যেন কি ! থিয়েটার দেখতে এসেও তোদের কথার বিরাম নেই...কথাটা একটু মৃদু ভঙ্গীতেই সে বলিল, দাদা না শুনিয়া ফেলে !

সুধা কহিল,—তা ভাই, ও আমার মস্ত দোষ।

নীরজা কহিল,—আরো এখানে পাঁচজন আছে তো...তারা কি ভাববে !

সুধা কহিল,—কি আবার ভাববে ! আমি তো তোমার দাদার সঙ্গে কথা কচ্ছি...ও-পাড়ার বটু মল্লিকের সঙ্গে কথা কচ্ছি না যে লোকে শিউরে উঠবে !

নীরজা কহিল,—ভ্যালা মেয়ে তুই ! তা বর তো পালায়নি ! ঘরে এত কথা কয়েও তোদের কথা শেষ হয় না ? এখানেও...তাহলে থিয়েটার দেখতে এলি কেন ?

সুধা কহিল,—তোমার দাদাকে দেখলে আমার যে আর কোনো দিকে মন যায় না, ভাই...

নীরজা কহিল,—মেয়ে বটে ! এত কি কথাই যে কোস্...কথা আর ফুরোয় না !

সুধা কহিল,—কথা সেই একই...তোমারি চরণ শরণ জানিয়া... বুঝলে... ?

নীরজা বিরক্তভাবে তার কথায় বাধা দিয়া কহিল,—থাম, থাম, তোর ফাজলামি আর শুনতে পারিনে...ওই রাজা আসচে...মরণ ! খীটার জন্ম পাগল হয়ে গেছে ! এ কি রাজা ? রাজ্য রইলো, ঐশ্বর্য্য ইলো...একটা সখীর পিছনে পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাখো া !...ছাই বই !

সুধা কহিল,—ঐ তো প্রেম !

নীরজা বিরক্তভাবে কহিল,—তোদের প্রেমের কাঁথায় আগুন !...

সে চুপ করিয়া আবার অভিনয়ের দিকে মনঃসংযোগ করিল। সুধা কটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, সাধে কি উনি বলেন, কি দিয়েই গবান তোমার মনটাকে গড়েছিলেন বোন...!......

যথাসময়ে অভিনয় শেষ হইল। নলিন একটু বিপদে পড়িল— াসিবার পথে ব্রজনাথের সঙ্গে নীরজার যদি দেখা হইয়া যায় !

সে কহিল,—তোমরা একটু দাঁড়াও...ভিড়টা একটু কমুক...

সুধা কহিল,—সকলেই যদি ঐ রকম ভেবে চুপ করে বসে থাকে...?

তার ইচ্ছা হইতেছিল, আর একবার নীলিমার সঙ্গে দেখা করে সে বক্স হইতে বাহির হইয়া পাঁচ নম্বরের দিকে চাহিল—কেহই বাহি হয় না! নলিনাক্ষর পানে চাহিয়া মৃদু স্বরে সে কহিল,—ওরা চলে গেছে এরি মধ্যে?

নলিনাক্ষ একটু অগ্রসর হইয়া দেখে, তাই বটে! ব্রজনাথ ও নীলিমার চিহ্নও নাই। তারা তাহা হইলে পালা শেষ হইবার পূর্ব্বেই থিয়েটার-গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! নলিন সুধাকে কহিল—তারা নেই।

সুধা কহিল,—আমিও তাই ভাবছিলুম। ঠাকুরঝি রয়েচে, পাছে থিয়েটার ভাঙ্গলে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাই আগেই চলে গেছেন!

নলিন কহিল,—ভালোই হয়েছে! তাহলে আর দাঁড়ানো কেন? তোমরা এসো...

৮

মার কাছে নলিন গোপনে কথাটা পাড়িল, সবটুকু যথাযথ অবশ্য প্রকাশ করিল না। মাকে শুধু বলিল, ব্রজনাথের সঙ্গে থিয়েটারে দেখা—নূতন বৌকে লইয়া সে থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিল। বৌটি পরমা সুন্দরী।

মা বলিলেন,—নীরোর সঙ্গে দেখা হলো নাকি?

নলিন কহিল,—না, এরা জানে না। সুধার সঙ্গে নীলিমার আলাপের কথা নলিন গোপন রাখিল। সুধার সঙ্গে সে এমনি পরামর্শ করিয়াছিল; প্রকাশ করিলে আরো পাঁচটা কথা যদি ওঠে, তাই!

মা কহিলেন,—কি বললে? নীরুর কথা কিছু হলো?

নলিন কহিল,—বিশেষ কোনো কথা না! সে বললে, আমার কথায় তোমার বোন্ বাড়ী ছেড়ে যান্নি, আর তাঁর ফিরে আসার সম্বন্ধে আমি কোন নিষেধও করিনি...

মা কহিলেন,—বটেই তো! মেয়েমানুষ অবুঝ! অভিমান করে যদি চলেই এসে থাকে, তুমি পুরুষ মানুষ, তাকে দুটো মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারো না? ও সব চালাকির কথা!

নলিনের রাগ ধরিল। মেয়ের দোষ দেখিতে পাও না, কেন না, সে মেয়ে! আর দোষ হইল তার...কেন না সে পর...! বটে! সে কহিল,—কিন্তু মা, আমার বোন হলে কি হয়, হক্ কথা বলতে গেলে

এ কথা মানতেই হবে যে, তোমার মেয়েটির গোঁ বড় সহজ নয়! এত গর্ব্ব তাঁরই বা কিসের? ক্ষতিটা হলো কার? ব্রজনাথের, না, নীরুর? সে তো আবার বিয়ে করলে...

মা কহিলেন,—পুরুষমানুষ—শাস্তর তার দিকে। কাজেই বাধলো না! তা বিয়ে সে করুক, আমার মেয়ে তা বলে মান খুইয়ে সেখানে এখন সতীনের বাঁদীগিরি করতে যাচ্ছে না! ওর কোনো অভাব আমি রাখবো না!

নলিন কহিল,—মানে?

মা কহিলেন,—ওর যাতে স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়, সে ব্যবস্থা আমরা করে যাবো! কি দুঃখে ও...যারা ওকে চায় না...তাদের দোরে ভিখিরীর মত গিয়ে দাঁড়াবে!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নলিন কহিল,—পয়সাতেই স্ত্রীলোকের দুঃখ ঘোচে না, মা! শুধু স্ত্রীলোকেরই বা বলি কেন, পুরুষেরও! ব্রজনাথের তো পয়সার অভাব ছিল না...তবু সুখী কি সে ছিল? আর মনের দিক দিয়ে মস্ত অভাব বোধ করেছিল বলেই না আবার বিবাহ করেচে! করে আমার বিশ্বাস, সে সুখীও হয়েচে!

মা কহিলেন,—তা কি তুই করতে বলিস, শুনি?

নলিনাক্ষ কহিল,—তুমি বুঝিয়ে ওকে ব্রজনাথের কাছে পাঠাও। ছেলে-মেয়েরা ডাগর হয়েচে। বাপ থাকতে বাপকে দেখতে পায় না, এতে ওরাই কি খুব খুসী-মনে মানুষ হবে, ভাবো?

মা কহিলেন,—সেখানে অন্য গিন্নী এখন আসন পেতে বসেচে—এদের খোয়ার হবে কম!

নলিন কহিল,—খোয়ার হবে না, মা, এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি। ব্রজনাথকে তো আমি জানি,—শান্ত মেজাজ তার... ছেলেমেয়েদের সে যে অবহেলা করবে, এমন অমানুষ সে কোনদিনই নয়, আর কোনদিন তেমন হতেও পারে না! তবে তোমার মেয়ে... ভয় তাকেই। সে যদি বিপ্লবের সৃষ্টি করে...?

মা কহিলেন,—তা সকলেই কি সমান হয়! ও কোনো রকম অসৈরণ সহ্য করতে পারে না।

নলিন কহিল,—অসৈরণ কাকে বলো, মা?

মা কহিলেন,—যা, যা, তোর সঙ্গে আর বকতে পারি না। তবে ব্রজ যে আবার এই বিয়ে করলে, বিয়ের আগে তার উচিত ছিল না, নীরুকে একবার খপরটা দেওয়া...যে, আমি আবার বিয়ে করচি? তুমি আসবে, কি, আসবে না, জানিয়ো...?

নলিন হাসিল, হাসিয়া জবাব দিল,—এ কি বাড়ী-ছাড়ার নুটীশ দেওয়া, মা? এ কথাটা যে উকিলের কথা হলো!...

মা কহিলেন,—তোরা যা ভালো বুঝিস্, কর্ না বাছা!...আর কিছু নয়, পাঁচজনের কাছে একটু ছোট হয়ে থাকা...স্বামীর বাড়ী ছেড়ে বাপের বাড়ী পড়ে থাকা...তার উপর স্বামী অক্ষম নয় তো...এই যা! তা না হলে আর কোথাও...

নলিন কহিল,—তাতো বলচি না। কিন্তু যেখানে বাধচে, সেখানে যে খুব বেশী রকমই বাধচে!...তুমি যদি অনুমতি দাও, মা...

মা কহিলেন,—কিসের অনুমতি?

নলিন কহিল,—ব্রজর সঙ্গে নীরুর মিটমাটের...নীরুর জন্য বলচি

না—বলচি শুধু ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে। আমি তাদের মা... পয়সা-কড়ির ব্যাপার নিয়ে কোনো ইতর অভিসন্ধি আমার নেই... তোমাদের যত-খুশী পয়সা-কড়ি, বাড়ী-বাগান ওদের দাও, তাতে আমার কোনো আপত্তি বা অমত নেই...তবে অমন বাপ থাকতেও ওরা মামার বাড়ী পড়ে থাকবে, এইটেই আমার খারাপ ঠেকে। ছোট হলেও ওদেরো বন্ধু-বান্ধব, সাথী, এক কথায়...ওদেরো একটা ছোটখাট গণ্ডী বা সমাজ আছে...ইস্কুলে যাচ্ছে, পাঁচ জনের বাড়ী যাচ্ছে, সেখানে দেখচে, আর সব ছেলে তাদের বাপের কাছে থাকে, বাপই তাদের সব... আর এখানে ওরা মামার বাড়ী পড়ে আছে...বাপের একটা নাম-ডাকও আছে!...এতে ওদের কোথাও ব্যথা বাজে না, তুমি ভাবো? বাপের বাড়ী থাকতেও যে ছেলে-মেয়ে মামার বাড়ীতে মানুষ হয়, তারা দুর্ভাগা!...এই কথাটাই আমার সব-চেয়ে বাজে, তাই এত কথা তোলা! নাহলে আমার আর কি!...

মা কি ভাবিতেছিলেন—স্বামীর ঘরে মেয়ের যে ঠাঁইটুকু এতদিন শূন্য পড়িয়াছিল, আজ আর তা নাই...এ কার অপরাধ?...তিনিও তো নারী, স্বামীর প্রেম কি বস্তু, স্বামীর ঘর, সে কি ঠাঁই—এ-সকলের মর্ম্ম তো তিনি ভালো করিয়াই জানেন!...তিনি সখেদে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

নলিনাক্ষ কহিল,—কি বলো, মা?

মা কহিলেন,—বেশ তো, বাবু, পারো মিটমাট করতে, চেষ্টা করো! কিন্তু একার ঘরেই যখন দু'জনে বনিবনা ছিল না, তখন এখন সে ঘরে সতীন এসেচে! কথায় বলে, সতীনের মত অভিশাপ মেয়ে-মানুষের জীবনে আর নেই...

নলিনাক্ষ কহিল,—আমি বুঝে-সুঝেই ব্যবস্থা করবো...তেমন বুঝি যদি তাহলে কি আর এগুবো...!

মা কহিলেন,—ঢাখো বাছা, যা ভালো বোঝো, করো। আমারো কি এতে সুখ আছে, না, স্বাচ্ছন্দ্য আছে! মেয়ে পরের,—তাকে ঘরে ধরে রাখতে কোন্ মার প্রাণ চায়? সেই মা তো বটে আমি...

মার সঙ্গে এই অবধি কথা কহিয়া নলিন আসিয়া সুধাকে কহিল,—ওগো, মার মন একটু নরম দেখলুম...তা তুমি যে ও-বাড়ী যাবে, এ-সব কথা,...মানে, নীরুর কথা ব্রজনাথের কাছে পাড়বে না কি?

সুধা কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—কিন্তু এ বৌটি বড় লক্ষ্মী... ঠাকুরঝির যা মেজাজ, সে-বেচারীর উপর যদি কোন রকম জুলুম হয়? আমা হতে তার অনিষ্ট হবে, এই কথাটা কেবলি মনে হচ্ছে...

নলিনাক্ষ কহিল,—সে কথা আমিই কি ভাবিনি! নিজের বোনের মঙ্গল দেখতে গিয়ে শেষে আর-একজনের সুখের পথে কাঁটা দেওয়া —সেও ঠিক হবে না!

সুধা কহিল,—কি করি, বলো তো?

নলিনাক্ষ কহিল,—তার বৌয়ের সঙ্গে আলাপই শুধু করে এসো... এ সব কথা তুমি কিছু তুলো না। সে কথা যদি পাড়তে হয় কখনো তো আমিই পাড়বো। বাবার শরীর ইদানীং খুব খারাপ যাচ্ছে, এই অজুহাতেই সে কথা আমি পেড়ে দেখবো, বুঝলে!

সুধা কহিল,—বেশ।......

সেই দিনই সুধা ব্রজনাথের গৃহে বেড়াইতে চলিল। সেদিন ব্রজনাথের এই বিবাহের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব। মার্কেট হইতে অজস্র

ফুল আসিয়াছে এবং মার্কেটের দু'জন মালী আসিয়া ব্রজনাথের শয়ন-কক্ষের পাশের ছোট ছাদটিতে কুঞ্জ-বন রচনা করিতেছে। ব্রজনাথ ও নীলিমা কুঞ্জ-বন-রচনার বিষয়ে মাঝে-মাঝে উপদেশ দিতেছে।

সুধাকে দেখিয়া ব্রজনাথ একটু অপ্রতিভ হইল। সহসা তার মনে হইল, এ ছেলেমানুষী করার মধ্যে কোথায় যেন অসঙ্গতি ঘটিতেছে! আমোদের এ সুর আজো এ নরম পর্দায় বহানো...এ যেন ঠিক মানাইতেছে না! আর একবার এই সুধার সামনেই উৎসবের এক আয়োজন সে করিয়াছিল। সে আয়োজন একজনের তীব্র বিদ্রূপে ফাঁশিয়া চূর্ণ হইয়া যায়! আজ আবার তেমনি আয়োজন! তবে এবার ফাঁশিয়া যাইবার কোনো আশঙ্কা বা উদ্বেগ নাই...তবু সেই দর্শক...সুধা! এ-আয়োজনের মাঝখানে অকস্মাৎ সে আসিয়া উদয় হইয়াছে!

ব্রজনাথ কহিল,—এসো সুধাদি...

সুধা কহিল,—এসে পড়লুম, কিন্তু কোন নোটীশ না দিয়েই...হয়তো খুব অপরাধ করলুম...

হাসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—সুধাদির কোন সময়েই কোন অপরাধ হতে পারে না...

সুধা কহিল,—একটা কথা আছে...

নীলিমা আগাইয়া আসিয়া সুধাকে অভ্যর্থনা করিল। সুধা কহিল,—আমি কে, বল দিকিন,—মনে আছে?

নীলিমা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সুধাদিদি।...বলিয়া সে সুধাকে প্রণাম করিল।

সুধা নীলিমার চিবুক ধরিয়া সাগ্রহে আদর করিল, তার পর তার অধরে

স্মন-রেখা অঙ্কিত করিয়া কহিল,—একটা কথা কয়ে নি ভাই, তোমার বরের সঙ্গে...তারপর তোমাকে তোমার বরের বাহু-পাশ থেকে কিছুক্ষণ দূরে আটকে রাখবো। বলিয়া সে ব্রজনাথকে কহিল,—শুনুন...

ব্রজনাথ সুধাকে লইয়া ঘরের মধ্যে আসিল। সুধা কহিল,—বাড়ীতে বলে আসিনি যে, আমি এখানে আসচি। ট্যাক্সিতে এসেচি। আপনার বাড়ীর দাসী-চাকররা যেন না জানতে পারে, আমি কে... বুঝলেন,—ঠাকুরঝি তাহলে জানবে। তাকে জানাতে চাই না...

হাসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—খুব বুঝেচি। তাই হবে সুধাদি। যদি এখানে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তাকে বললে হবে, আমার দিদি হন্! তবে দিদিটি বয়সে ছোট ভাইটির চেয়ে ঢের ছোট...এই যা!

সুধা কহিল,—তা হোক্ গে...

ব্রজনাথ কহিল,—অগত্যা!...

সুধা বাহিরে আসিল; আসিয়া নীলিমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিল,—এসো ভাই, বসতে দেবে না? কতদূর থেকে এলুম...

নীলিমা কহিল,—আসুন।

সুধা কহিল,—আবার আসুন...কেন বল তো? দিদি বলে আমি কি এতই বুড়ো হয়েচি.. না, আমার মাথার চুল পেকে শণের নুড়ি হয়েচে, য, এ রকম শ্রদ্ধা আর সম্মান দেখানো হচ্ছে! আমায় তুমি বলে কথা কইতে হবে...তুই বললে আরো খুশী হবো।

হাসিয়া নীলিমা কহিল,—আচ্ছা দিদি, তোমায় তুমিই বলবো।

সুধা কহিল,—হ্যাঁ, তাই বলবে। তারপর কুঞ্জ-রচনার যে আয়োজন চলিতেছে, তার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া সুধা প্রশ্ন করিল,—এ কি হচ্ছে?

নীলিমা কহিল,—ওঁর পাগলামি!

সুধা কহিল,—তার মানে?

নীলিমা মাথা নত করিয়া সলজ্জভাবে কহিল,—আজ আমাদের বিয়ের তারিখ কি না…

সুধা কহিল,—বাঃ, বেছে বেছে বেশ দিনটিতেই তাহলে এসেচি তো…তোমাদের মিলনের বাঁশী বাজাবার জন্য…তবে দুঃখ এই যে, বাঁশী আমি বাজাতে জানি না!

নীলিমা কহিল,—তোমার বর আসেন নি? একলা এসেচো?

ব্রজনাথও ঠিক ঐ কথা কহিল,—তুমি একা এসেচো সুধাদি! নলিন?…

সুধা কহিল,—আমায় নামিয়ে দিয়ে কোথা গেলেন…কি কাজ আছে…মানে, বাবার শরীর বেশ ভালো যাচ্ছে না, তাই তাঁরি কি একটা দরকারে…

ব্রজনাথ কহিল,—কি অসুখ?

সুধা কহিল,—নানা রকম উপসর্গ…বেরুতে পারেন না—এক-রকম শয্যাগত আছেন।

—বটে! বলিয়া ব্রজনাথ চুপ করিল।

সুধা কহিল,—আমার বোনটিকে এখন ছাড়চি না,…আপনি ঐ মালীগুলোর কাছে যান…ওরা বসন্তের সহচর,…আপনারো যোগ্য সহচর হবে ওরা…বলিয়া সে উচ্চ হাস্য করিল এবং নীলিমাকে টানিয়া তার শয়ন-কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল।

সেই ঘর…এ ঘরে সে আগেও অমন আসিয়াছে কত দিন—এই

ঘরেই নীরজা গম্ভীর মুখে মানে বসিয়াছে, আর বেচারা ঠাকুর-জামাই বিশুষ্ক মুখে টেবিলের পাশটিতে চেয়ারে বসিয়া শূন্য মনে এ-বই ও-বই নাড়াচাড়া করিয়াছেন!...তার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।...ঘরের সজ্জা তেমনই আছে, তবে এ-সবের উপর পারিপাট্যের জলুষ, একটা সুমধুর শ্রী...

সুধা একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর নীলিমাকে আবেগে বুকের মধ্যে টানিয়া কহিল,—ইচ্ছে করচে, এ মুখখানিকে বুকের মধ্যেই চেপে রাখি সারাক্ষণ...কি ভুবন-ভুলানো শ্রীই যে তুই পেয়েচিস, বোন...

নীলিমা কহিল,—যাও দিদি, কি যে তুমি বকো!...

সুধা কহিল—সত্যি ভাই, মিছে কথা নয়...নারী হয়ে নারীর মন ভোলাস, এমন মন-মোহিনী নীলিমা তুই...বলিয়া সে নীলিমার অধরে আবার চুম্বন করিল।

৯

গৃহে ফিরিয়া রাত্রির নির্জ্জনতায় স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

সুধা কহিল,—বড় লক্ষ্মী বৌ...যেন এ মাটীর পৃথিবীর নয়! বাদ-বিসম্বাদ, ঝগড়া-ঝাটি, অধিকার-অনধিকারের কোনো কথা জানে না! এমন সরল মন! ঠাকুরঝির কথা তুলেছিলুম...ও জানে, ঠাকুরজামাই তাকে ত্যাগ করেচেন। বললুম, তিনি তো বড়, যদি আসেন? এসে সংসারের ভার নিয়ে চেপে বসেন? তা কি বললে, জানো?

নলিন কহিল—কি?

সুধা কহিল,—বললে, বেশ হয় তাহলে দিদি...দুই বোনে কেমন থাকি। এ একলা আছি, কথা ক'বার সঙ্গী পাই না...দিদি এলে ছোট বোনটির মত থাকি বেশ। কোনো ঝক্কি থাকে না! ছেলেমেয়ের কথা তুললুম—তা বললে, তাদের জন্য এমন মন-কেমন করে! বেশ কেমন, মা বলে ডাকবে...কত ভালোবাসবো!...

নলিন কহিল,—তাইতো, এ ক্ষেত্রে আমাদের হাত দিতে যাওয়া ঠিক হবে না। একেই তো জগতে সুখ দুর্ল্লভ, শান্তি আরো দুর্ল্লভ! দুটীতে অমন মনের সুখে, প্রাণের শান্তিতে বাস করচে, তার মধ্যে এই প্রলয়ের ঝড় বয়ে নিয়ে গেলে সব ছারখার করে দেবে! ওরা তো আমাদের কাছে কোনো দোষ করে নি।

সুধা কহিল,—বৌ কি আমায় ছাড়তে চায়! দিদি আবার এসো, দিদি আবার এসো...একলা নয়, বরকে সঙ্গে এনো...কি আগ্রহ, কি

আব্দার !...আমি বললুম, বরকে আনতে বলচো, সে তো এসে একলাটি বাইরে বসে থাকরে, তার সঙ্গে কথা কবে কে ? তা বললে, বাইরে কেন থাকবেন ? আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করবো, আমি তাঁর সঙ্গে কথা কবো, আলাপ করবো...

নলিন কহিল,—তোমার পরিচয় জানে ?

সুধা কহিল,—শেষে বললুম। মানে, ও-কথা বলতে হলো...কিছুতে ছাড়বে না ! তা শুনে বললে, তাঁকে কেন আনলে না দিদি ? অর্থাৎ ঠাকুরঝিকে ! আরো বললে, তিনি যদি না আসতে চান, ছেলেমেয়েদের আনলে না কেন ? যতিনাথকে নিয়ে যাবার জন্য অনেক মিনতি করলে...

নলিন কহিল,—থাক্ সুধা,...আমাদের সঙ্কল্প আর কাযে পরিণত করে কাজ নেই ! যে যেখানে যেমন আছে, সে সেখানে তেমনিই থাক !...এতদিন যদি কোথাও কোন খেদ, কোন ক্ষোভ না তুলে সব নির্বিবাদেই চলে আসচে...

সুধা কি ভাবিতেছিল,—এ কথার সে কোন জবাব দিল না।

নলিন কহিল,—মা নীরুকে কদিন ধরে বোঝাচ্ছেন। ও এখন যেতেও খুব অরাজী নয়। তবে নিজে থেকে যাওয়া, এই যা বাধা ! তা ব্রজনাথও যেতে বলবে না কোনো দিন...

সুধা কহিল—স্বামীর ঘরে যাওয়ার ব্যাপারে আবার অপমানই বা কি, তা বুঝি না...স্ত্রীর মান বড় হবে স্বামীর মানের কাছে ?...

...ওদিকেও বিপ্লব বাধিতেছিল, খুঁটিনাটী ব্যাপার লইয়া সংসার-যন্ত্রটা কোথায় যেন বিগড়াইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

দুপুর বেলা। ব্রজনাথ ও নীলিমা নিত্যকার মত সুখের কল্পলোকে বিচরণ করিতেছিল, সহসা নীচে যেন বজ্রাঘাত হইয়াছে, এমনি কোলাহল! স্বপ্ন টুটিয়া গেল। ব্রজনাথ শিহরিয়া প্রশ্ন করিল,—ব্যাপার কি?

—তাইতো! বলিয়া নীলিমা উঠিয়া দ্বারের সাম্‌নে আসিল। আসিয়া প্রশ্ন করিল,—দেখে আসবো?

ব্রজনাথ বিরক্ত হইল, কহিল—কি দেখবে?

নীলিমা কহিল,—মতির মার গলা শুনচি....

মতির মা দাসী। ব্রজনাথের জবাবের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়াই নীলিমা সকৌতূহলে অন্দরের একতলায় ছুটিল। গিয়া দেখে, সেখানে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! নীলিমা কহিল,—কি হয়েচে, বামুনদি?

বামুনদি ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—তুমি উপরে যাও বৌদি....এ-সব ছোটলোকের ঝগড়ার মধ্যে ..

গৃহিণীকে দেখিয়া মতির মা সঝঙ্কারে কহিল,—আমার মাইনে চুকিয়ে দাও বৌদি...আমি আর থাকবো না এখানে। ছোটলোক ছাতুখোর ব্যাটার এমন আস্পর্দ্ধা, আমায় অপমান করে!....

যেন দক্ষযজ্ঞ চলিয়াছে! নীলিমা কহিল,—হয়েচে কি?

মতির মা কহিল,—খালি চুরি, খালি চুরি! মাগো, এমনি করেই মনিবের সর্ব্বনাশ করতে হয়!...মাছ এনেচে, দু'টাকার, আর আমরা খেতে পাই না...আলুর সের ছ'আনা করে ..'ও-বাড়ীর কাত্যের মা বলছিল, বাজার ভারী শস্তা। তাই জগা ছোঁড়াকে বলছিলুম...তা তেড়ে আমায় মারতে এলো! মনিবের পয়সা বলে এমন তাচ্ছিল্যিই করতে হয়!...

চাকর-বাকর তো নয়, চোর পুষচো, বৌদি...তাড়াও, তাড়াও, না হলে ভদ্রস্থা থাকবে না।...

বাদ-বিসম্বাদের হট্টগোল ঘাঁটিয়া যেটুকু সংবাদ পাওয়া গেল, তার মর্ম্ম এই যে,—জগা ভৃত্য বাজার করিতে গিয়া গৃহস্থকে বেপরোয়া লুঠ করিতেছে! আনাজ, তরকারী, মাছ প্রভৃতির বাবদ চতুর্গুণ দাম আদায় করিতেছে...এ কি ধর্ম্মে সহিবে! তা মনিবের যদি এদিকে নজর না থাকে...

মতির মা কহিল, এ চুরিতে রাজার ভাণ্ডার উজাড় হইয়া যায় বৌদি, তা...

সঙ্গে সঙ্গে আরো চুরি ধরা পড়িল...চাল যে তিন দিনের মধ্যেই ফুরায়, ডাল মাসে আসে বারো-চৌদ্দ টাকার, এ সবের অর্থ কি?

বামুনদি কহিল,—কাকেই' বা বলি, বৌদি, এ সব তুচ্ছ কথা! জগাকে দরের কথা বললে সে মারতে আসে। বলে, কারো সন্দ হয় তো বাজারে যাক্ না নিজে...

ব্যাপারটার রিপোর্ট ব্রজনাথের কাছে পেশ হইলে সে গর্জ্জিয়া কহিল,—সব ব্যাটাকে দূর করে দাও এই দণ্ডে।

একেই তো দ্বিপ্রহরের সুখালাপে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, তার উপর তার সরল বিশ্বাস এরা এমনি করিয়া নিত্য হত্যা করিতেছে, বদমায়েস, বেইমানের দল...

সরকার মহাশয়ের তলব হইল। ব্রজনাথ কহিল,—আপনি এ-সব খোঁজ রাখেন না মোটে?

সরকার মহেন্দ্র জানাইল, তাকে নিজেকে পাঁচ দিক দেখিতে হয়।

জগার হিসাব লইয়া সে বহু তর্ক তুলিয়াছে, জগা বলিয়াছে, বাজারের দর কবে বাড়ে, কবে কমে, কিছু ঠিকানা থাকে না! খোঁজ লইবার অবসর তাঁরো হয় নাই...

ব্রজনাথ কহিল,—সে অবসর যদি আপনার না হয়, তবে কি আমার হবে! মানে, আমি যাবো আলু-শাক-মাছের দর যাচাই করতে?...

সরকার চুপ করিয়া গেল। ব্রজনাথ কহিল,—সে অবসর আপনার না হয় যদি তো কাজে অবসর নিন্! বিশ্বাস করে সব ভার আপনার হাতেই দিয়েচি আমি,—তার কি এমনি...

সরকার কহিল,—মনিবের নজর না থাকলে...

ব্রজনাথ এ কথায় রাগিয়া উঠিল, কহিল,—মাইনে খাবে শুধু শুধু, আর বসে থাকবে,—না? সব চলে যাও। আমি দেখচি, নিজে সব দেখা-শুনা করতে পারি কি না...

পুরাতন ভৃত্য-দল বিতাড়িত হইল, নূতন লোকের আমদানি হইল। সরকার মহাশয়কে চাকরিতে বাহাল রাখা হইল, তবে তাঁকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল, সব দিকে তাঁর নজর রাখা চাই! সংসার আবার পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।...

এমনি চলার মুখে হুম্ করিয়া একদিন নীরজা আসিয়া উপস্থিত, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া। ব্রজনাথ তখন নীলিমাকে লইয়া বায়োস্কোপে যাইবার জন্য মোটরে উঠিতেছে। অতিথি দেখিয়া নীলিমার পা বাধিয়া গেল। সে গাড়ী হইতে নামিতে যাইতেছিল...

ব্রজনাথ কহিল,—নামতে হবে না।

নীলিমা কহিল,—কারা এলেন...

ব্রজনাথ কহিল,—ও সহজ কারা নন্—পরে বুঝবে! ওঁরা এসেচেন বলে আমাদের প্রোগ্রাম নষ্ট হতে পারে না।...

মোটর চলিয়া গেল। গাড়ীতে বসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—আমার জীবনের অভিশাপ...

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নীলিমা ব্রজনাথের পানে চাহিল। ব্রজনাথ কহিল,—ও নীরজা, তোমার সতীন।

এ কথায় নীলিমা মনের কোথাও ব্যথা পাইয়াছে, তাকে দেখিয়া এমন মনে হইল না। নীলিমা কহিল,—উনি থাকবেন এখানে...?

ব্রজনাথ কহিল,—সে উনিই জানেন, আর যিনি ওঁকে সৃষ্টি করেচেন, ওঁর সেই বিধাতা জানেন।

নীলিমা কহিল,—থাকলে বেশ হয়...না?

ব্রজনাথ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল,—খুব বেশ—নিশ্চয়!

নীলিমা কহিল,—তুমি কি চলে যেতে বলবে না কি, যদি উনি থাকতে চান?

ব্রজনাথের বিরক্তি ধরিতেছিল—বায়োস্কোপে ভালো একখানা ছবি ছিল...মাঝে হইতে কি এ! সে কহিল,—আমি কাকেও কিচ্ছু বলবো না...

বায়োস্কোপ হইতে ফিরিয়া ব্রজনাথ দেখিল, নীরজা ছেলেমেয়েদের লইয়া কায়েমিভাবেই আস্তানা পাতিয়াছে। নীলিমা ছুটিল, সপত্নীকে দেখিতে।

নীরজা নীচেয় ছিল—বামুনদি ও দাস-দাসীদের আয়ত্ত করিয়া লইয়া তাদের কার্য্যাদির ধারা সকলকে সে বুঝাইয়া দিতেছিল। নীলিমা

আসিয়া নীরজার পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল, প্রণামান্তে নীরজার পানে চাহিল। বামুনদির দল এ-ব্যাপারে এক অজ্ঞানা আশঙ্কায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীরজা নীলিমার পানে চাহিল, কহিল,—ছোট বৌ! কর্ত্তাও ফিরেচেন?

নীলিমা কহিল,—হ্যাঁ।

নীরজা কহিল,—তোমাদের ঘর-দোর, বিছানা-পত্র যেমন তেমনি আছে...তাতে হাত দিইনি। ওই পূব দিকের বড় ঘরটায় আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকবো...তাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না, বোধ হয়...?

নীলিমা কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—অসুবিধা কিসের, দিদি! তুমি বড়, তুমি যা করবে, তাই হবে।

নীরজা কহিল,—বেশ।...আমি সংসারটা এখন একবার বুঝে নিচ্ছি। এ-ধারে একেবারে চোরের আস্তানা গড়ে উঠেচে, দেখচি...তুমি বুঝি এ-সব ছাখো না! অবসর নেই, না?

নীলিমা তেমনি কুণ্ঠা-জড়িত কণ্ঠে লজ্জানত মুখে কহিল,—এ-সব দেখতে এলে উনি রাগ করেন। বলেন, যার উপর যে ভার আছে, সে তা করবে! ওদের পিছনে লাগতে গেলে ওদের কাজে বাধা দেওয়া হবে। সে ঠিক নয়!

নীরজা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—এই বুদ্ধি নিয়েই মানুষ সংসার করে, বটে!

নীলিমা চুপ করিয়া রহিল। নীরজা কহিল,—এখন থেকে ভাঁড়ার

আমার হাতে, বুঝলে বামুনদি...তার পর নীলিমার দিকে চাহিয়া কহিল,—তোমার স্বামীতে ভাগ নিতে আসিনি, ছোট বৌ। মা-বাপও ভারী জ্বালাতন করছিল, অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলুম...তার উপর ছেলেমেয়ের আব্দার...ভাবলুম, দূর হোক, কচকচি কেন সই? তাই এলুম। তা তোমাদের ঘরের দিকে নজর দেবো না,. ছেলেমেয়েদের নিয়ে একধারে পড়ে থাকবো...দুটী পেটে খাবো, এই...আর তোমাদের সংসারের চাকাটা চালিয়েই আমি আরামে থাকবো। তোমাদের একটু সোয়াস্তি দেওয়া ছাড়া অস্বস্তির কিছু করবো না!...

কথাগুলা খুব সরস নয়...এমন কথা নীলিমার কোথাও কোনো দিন শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই! এ কথায় সে কি বলিবে, বা এ-কথার পর কি করিবে, কিছুই সে স্থির করিতে পারিল না।

কিন্তু নীরজা নিজে তাকে মুক্তি দিল। নীরজা কহিল,—ভাঁড়ারে চলো তো বামুনদি, কি আছে, কি নেই, দেখি, একবার...তারপর সরকার মশায়কে ডাকিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে! মাগো, এ যেন মরুভূমির মধ্যে এসে দাঁড়ালুম...যা আছে তার যা দশা...ছি, ছি! ছোট বৌ যেন ছেলেমানুষ, বামুনদি, এ-সব জানে না...তোমরা তো কাজের লোক বাড়ীতে আছো...এমনি করেই ঘর-দোর রাখে! গৃহস্থ পয়সা দিতে নারাজ নয় তো...

এমনি বকিতে বকিতে নীরজা বামুনদির দলটিকে লইয়া ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। নীলিমার আপাদ-মস্তক কাঁপিতেছিল...মস্ত বড় আগ্রহ লইয়াই সে সপত্নী-সম্ভাষণে আসিয়াছিল,—এঁরই তো ভ্রাতৃজায়া সুধাদি! অথচ সুধাদির কি সে সুধা-ভরা আলাপের ভঙ্গী!

তার চরণ-পাতে যেন আলোর ফুল ফুটিয়া ওঠে...কি হাসি, কি আনন্দ তার মুখের কথায় ঝরিয়া পড়ে! আর এ...? একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীর পায়ে সে আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। ব্রজনাথকে ঘিরিয়া ছেলেমেয়েরা তখন নানা কথা কহিতেছিল। নীলিমাকে দেখিয়া ব্রজনাথ কহিল,—তোমরা যাও এখন, খেলা করোগে...

নীলিমা ছেলেদের টানিয়া বুকের কাছে আনিল। যতিনাথকে কহিল,—আমি কে, বল তো বাবা...

যতিনাথ তার পানে চাহিয়া চাহিয়া কহিল,—ছোট মা...

মা-সম্বোধন! একটু আগে বুকে যে দাহ ফুটিয়াছিল, এ-ডাকে সে দাহ নিমেষে যেন মুছিয়া গেল! সে কহিল,—কে বললে...?

যতিনাথ নিঃসঙ্কোচে কহিল,—মামীমা...

মামীমা! সুধা...! নীলিমা কহিল,—আমায় তুমি ভালোবাসবে?

যতিনাথ কহিল,—বাসবো।...তুমি বকবে না ছোট মা?

নীলিমা তার সুন্দর কচি মুখখানিতে চুম্বন করিয়া কহিল,—না বাবা, বকবো না...খুব, খুব ভালোবাসবো তোমাদের।...

...সেদিন গভীর রাত্রে নীলিমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া তার মুখ-চুম্বন করিয়া ব্রজনাথ বলিতেছিল,—আমরা কালই কোথাও চলে যাই, চলো নীল...এ বাড়ী ছেড়ে...

নীলিমা কহিল,—না।

ব্রজনাথ আবেগে তার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—না নয়! চলো, চলো নীল...পশ্চিমে...খুব দূরে...নাহলে আমি...আমি কি করবো, বুঝতে পারচি না!

"...সুধায় অরুচি হলে ফিরেও ত নাহি চায়,
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায় !
তোরা কেবল হাসি দিবি, তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা, আর ত রবে না কাছে !"

—রবীন্দ্রনাথ

৮

কি হইতে কি যে দাঁড়ায়...এ এক মস্ত সমস্যা। যে-নীরজা প্রাণের দ্বার-জানলাগুলা একেবারে বন্ধ করিয়া পিত্রালয়ে নির্ব্বিকার বসিয়াছিল, সহসা সে কেন আবার মান-অপমান ভুলিয়া নিজে হইতে ব্রজনাথের গৃহে ফিরিয়া আসিল, এ'ও তেমনি সমস্যা! দাদার কথায় মা তাকে এদিকে সচেতন করিয়া তুলিতেছিলেন, সত্য—তা তুলিলেও নীরজা তো ভুলিবার মেয়ে নয়! তার মন যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। কারো কথায় তার মন ফিরিতে জানে না! মর্জ্জি জিনিষটারি সে-মনে যা-কিছু আধিপত্য!

নলিন একটু মুষড়াইয়া সুধাকে কহিল,—ব্রজনাথ হয়তো ভাববে, আমাদেরি আলাপ জমার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর অন্যায় আক্রমণ করেচি!

সুধা নিরুত্তরে রহিল। সে ভাবিতেছিল, নীলিমা তাকে এমন ভালোবাসে, নিজের বোনের মতই দেখে! আর সুধা শেষে তার সুখের কুঞ্জে এমন বিষ-মাখা তীর নিক্ষেপ করিল! সপত্নীর মেজাজের ঝাঁজে তার হাসি-খেলার অমন বিচিত্র ফুলগুলি যে শুকাইয়া ম্লান হইয়া ঝরিয়া [illegible]বে!

এ-সব ছোট-খাট চিন্তার কথা কিন্তু ব্রজনাথের মনেও উদয় হইল না। সে ভাবিল, নীরজা আবার আসিয়াছে যদি, আসুক, ..তা লইয়া কোনো

কথা তুলিয়া সে আবার নূতন করিয়া আগুন জ্বালিতে প্রস্তুত নয়! নীরজা আসিয়াছে, একধারে থাকিতেও যদি চায় তো থাকুক—তার মনের কোনো ব্যাপারে ঘেঁষ না দিলেই হইল! কিন্তু নীলিমার মুখের হাসি যেন একটু ম্লান হইয়া আসিতেছে না? দুপুরে প্রমোদ-উৎসবের আয়োজন করিতে গেলে সে নিষেধ তুলিয়া কেবলি বলে, ছি, ছেলেমেয়ে রয়েচে...লজ্জা করে যে!

ব্রজনাথ জবাব দেয়,—থাকুক ছেলেমেয়ে...তারা তো আগেও ছিল।

নীলিমা বলে,—কি যে বলো! যতি বলছিল, ওকে কাগজের নৌকো করে দিতে হবে। তার কথা ঠেলে তোমার এখানে থাকবো...?

ব্রজনাথ নীরব থাকে। এক দিন বিরক্তির স্বরে সে কহিল,—থাক ওরা এখানে সংসার নিয়ে। আমি এত ধকল সইতে পারবো না...আমি তোমায় নিয়ে পশ্চিম যাবো। বহুদিন থেকেই তো যাবো-যাবো করচি। সরকার মশায়কে বলে যাবো, এখানকার সব তদ্বির করবে, আর আমার যেমন দরকার, টাকাকড়ি পাঠাবে। তাই চলো নীল...

নীলিমা কহিল,—সে কি ভালো হবে?

ব্রজনাথ কহিল,—কেন ভালো হবে না!

নীলিমা কহিল,—ছেলেমেয়েদের ফেলে যেতে তোমার মন কেমন করবে না?

ব্রজনাথ অবিচল স্বরে কহিল,—না। যার ছেলেমেয়ে, সে আছে তো! এতদিন যখন আমার সাহায্য-ছাড়া ওদের দেখা-শুনা [illegible] এসে থাকে, তাহলে এখনো তা চলতে পারবে...

নীলিমা বিস্ময়ে অবাক হইয়া স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। ব্রজনাথ

তার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া খুশী হইল—এবং তাই সে বাহিরে যাইবার যথারীতি আয়োজন করিতে লাগিল।

কথাটা সরকার মহাশয়ের মারফৎ দাসী-চাকর এবং তাদের মারফৎ বড় গৃহিণী নীরজার কর্ণগোচর হইল। সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদিন নীলিমাকে একান্তে পাইয়া কহিল—তোমরা বেড়াতে যাচ্ছ তাহলে?

নীলিমা কোনো জবাব দিল না। ভয়ে ভাবনায় তার মুখ বিবর্ণ হইল, বুকের মধ্যটা কাঁপিয়া উঠিল।

নীরজা কহিল,—তা যাও,...তবে না গেলেও চলতো। আমি তো তোমাদের কোনো সুখের ব্যাঘাত ঘটাতে যাইনি ছোট বৌ... এক ধারে পড়ে আছি।

নীলিমা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিয়া সে কহিল,—আমার একটুও ইচ্ছে নেই দিদি...উনি জেদ করচেন...

নীরজা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তা যাও না—আমি তো বারণ করচি না, বাধাও দিচ্ছি না। তবে উনি আমায় জানাতে পারতেন যে আমার এখানে থাকাটা ওঁর মনঃপূত কি না! না হলে নয় আবার সেই বাপের দোরেই ফিরে যেতুম। তারাও সত্যি আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়নি। নিজের ইচ্ছায় তাদের ওখানে চলে গেছলুম। ইচ্ছা হয়েছিল, ক'বছর সেখানে ছিলুম। আবার ইচ্ছা হলো, এখানে এসেচি। আমার দরুণ ও... যদি কোনো অসুবিধা ঘটে থাকে, তাহলে উনি তা বললেই পারেন! ... যেতে আমি সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত।...

নীলিমা কহিল,—কিন্তু উনি তো এমন কথা বলেননি, দিদি।

নীরজা কহিল,—না বললেই ভালো। তবে বললেও কোন ক্ষতি ছিল না...

নীলিমা কহিল,—তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করে তাই কেন বলো না দিদি... সত্যি, আমার ভারী বিশ্রী লাগচে...

নীরজা মুখ বাঁকাইয়া কহিল, –কিসের জোরে জোর খাটাবো আমি! আমার বয়সও নেই, রূপও নেই...

এ কথায় নীলিমা যেন মরমে মরিয়া গেল! সে যেন ভারী পাথরের মূর্ত্তির মত একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া রহিল—চলিয়া যাইবে, সে শক্তিটুকুও তার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল!

নীরজা কহিল,—তোকে লক্ষ্য করে আমি এ-কথা বলিনি, ছোট বৌ...এমনি...কথার কথা বলচি মাত্র। তুই সতীন বটে, কিন্তু তোর উপর আমার কোনো রিষ নেই...এতটুকু আমি তোর হিংসা করচি না। আমি স্বেচ্ছায় স্বামী ত্যাগ করে গেছি...যা ত্যাগ করেচি, তার পানে আবার ফিরে চাইবো, এমন বান্দা আমি নই!

এ-কথাগুলাও নীলিমার খুব ভালো লাগিল না। তবু একটু শান্তি পাইল এই ভাবিয়া যে, তার উপর নীরজার কোনো রিষ, কোনো হিংসা নাই! সে তেমনি নিরুত্তর রহিল—নীরজার কথার কোনো জবাব দিল না।

নীরজা আবার কহিল,—বেশ, ওঁকে জিজ্ঞাসা করো, উনি কি বলেন, আমি বাপের বাড়ী যাবো? তাহলে আমায় যেন তোমার মুখে সে ইচ্ছা জানান...কোনো সঙ্কোচ, কোনো লজ্জা করতে হবে না, আমারো তাতে কোনো ব্যথা বাজবে না। তবে ছেলেমেয়ে...তা, বলেন, নিয়ে যাবো। রেখে যেতে বলেন যদি রেখে যেতেও প্রস্তুত আছি!

এমনি কথা হইতেছে, এমন সময় যতিনাথ সহসা এই ব্যাপারের মধ্যে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল, আসিয়া একেবারে নীলিমার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল,—এসো তো ছোটমা, আমাদের সার্কাশ দেখবে, এসো... বলিয়া তার দিক হইতে কোনো ওজর বা নিষেধ তুলিবার অবসরমাত্র নীলিমাকে না দিয়া একেবারে হিড়-হিড় করিয়া তাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

নীরজা কহিল,—দেখিস্ রে, ছোটমাকে মেরে ফেলিস্‌নে যেন !

নীলিমার মনের সে-গুমটভাব এ ব্যাপারে এক নিমেষে কাটিয়া গেল। হাসিয়া সে কহিল—ভ্যাখো তো দিদি, ছেলের কাণ্ড ! আমি যাবো বলচি—তবু টানে !—টানিস্‌নে বাবা, অমন করে ! এমনিই যাচ্ছি...

যতিনাথ কহিল,—না, না, না—মা এখনি তোমায় নিয়ে বাজারের হিসেব কি গল্প করতে বসবে—তাহলে তুমি খুব আসবে কি না !

নীলিমা কহিল,—শোনো ছেলের কথা...কারো সঙ্গে গল্প কি হিসেব করবো না রে . তোদের সার্কাশ দেখা ছেড়ে কি আর কিছু করতে আমি পারি ? না, সে কাজ ভালোও লাগবে আমার ?

২

রাত্রি প্রায় ন'টা। দ্বারে মোটর সজ্জিত—মোট-ঘাট লইয়া দু'জন ভৃত্য ও সরকার মশায় ষ্টেশনে গিয়াছেন। ব্রজনাথ ও নীলিমা প্রস্তুত হইয়া লইতেছে। আপাতত রাঁচি যাওয়া স্থির। সেখানে মাসখানেক থাকিয়া সোজা দিল্লী, লাহোর হইয়া কাশ্মীর যাওয়া হইবে, এমনি ঠিক হইয়াছে। ইতিমধ্যে মোটরখানাকে রেলে করিয়া রাওয়ালপিণ্ডী পাঠানো হইবে। সেখান হইতে এই মোটরেই কাশ্মীর-যাত্রা।

যতিনাথ কাঁদিয়া খুন। ছোটমাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারিবে না। নীলিমা তাকে কত বুঝাইতেছে; বুঝাইতে গিয়া নিজেও কাঁদিয়া সারা হইতেছে!...ব্রজনাথ রাগ করিল। ভালো মায়া যা হোক্! নীরজার এ দিকে কোন হুঁশও নাই। সংসারের কর্ম্মচক্রটাকে সে সমানে ঘুরাইয়া চলিয়াছে। বহুকালের অমনোযোগিতায় সে যন্ত্রের বহু স্থানের বাঁধন শিথিল হইয়াছিল, বহুস্থল টুটিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইয়াছিল, নীরজা সে শিথিল বাঁধন, সে বাঁধ-টুটা সব আপনার নিপুণ হাতে সারাইয়া লইয়াছে। এখন এ যন্ত্রটার কোথাও কোন খুঁৎ নাই! স্বামীর মনের পথে সাথী হইবার শক্তি না থাকিলেও স্বামীর সংসার-যন্ত্র চালাইবার শক্তি সে যেন পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত করিয়াছিল! স্বামী কোনোদিন তার শক্তির তারিফ করেন নাই! করিবেন না, নীরজা তা জানিত।

তবু সে এই সংসার-যন্ত্র-পরিচালনায় একটুও কাতর হয় নাই! স্বামীর খুশিতে কৌতুক-পরিহাস বা তাঁর মনের খেয়াল মিটাইবার জন্য কোনো কালে আপনাকে সঁপিয়া দেওয়া—এগুলাকে সে অতি তুচ্ছ অকাজ বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছে, কাজেই কাজের দিক দিয়া সংসারটাকে অল্প কালের মধ্যেই সে বেশ করায়ত্ত করিয়া লইল। দাসী-চাকর সভয়ে এটুকু বুঝিল, এ সংসারের কোনো দিকে আর কোনো চালাকি চলিবে না! শক্ত পাল্লা এবার। ঢিলাঢালা বা ফাঁক কোথাও নাই...অপরাধ করিলে শাসন এখন সর্ব্বক্ষণ উদ্যত...বাড়ীতে একজন গৃহিণী আছে! প্রভুর মতই সর্ব্ব দিক দিয়া কাজ আদায় করিয়া তবে সে ছাড়িবে! কাজ বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তরও নাই!......

নীরজার এ কর্ত্তৃত্ব ব্রজনাথ ও নীলিমাকে কোনোখান দিয়া এতটুকু আঘাত দিতে পারে নাই। জীবনের যে দিকটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়া ব্রজনাথ যেদিকে কোনোদিন ফিরিয়াও তাকায় নাই, সে-দিকটায় যে খুশী আসিয়া কর্ত্তৃত্ব করুক, তাহাতে তার কি-বা আসিয়া যাইবে! আগে সংসার-যন্ত্র চালাইবার মালিক ছিল সরকার মশায়, পাচিকা, দাসী-চাকর,—ইহারা। এখন তাদের স্থান অধিকার করিয়াছে নীরজা! তাদের জীবন যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলার ফলে বাধাও যখন কিছুমাত্র উদয় হয় নাই, তখন নীরজা আসিয়া সংসার-যন্ত্রের চাকাখানা ঘুরাইতে থাকিলে ভাবনাই বা কি আছে!...

তবে ঐ ছেলেমেয়ে...! তাদের নানা আব্দার, নানা অনুযোগ... প্রমোদ-উৎসবের সুর তাহাতে কাটিয়া যায়! তাই ব্রজনাথ এই

ঝামেলার হাত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় সুদূর-বাসের কল্পন করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিয়াছে!

যাত্রা-ক্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নলিনাক্ষ আসিয়া উপস্থিত নলিনাক্ষ আসিয়া ব্রজনাথের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—আমিঃ তোমায় বাড়ীছাড়া করলুম শেষে...

ব্রজনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল,—তার মানে?

নলিনাক্ষ কহিল,—নয়?...এই যাওয়া আমারি দরুণ! তুমি ভাবচো আমিই তোমাকে...

হাসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—স্বপ্নেও তেমন কথা আমার মে হয়নি তো...

নলিনাক্ষ কহিল,—আমাদের কেবলি তাই মনে হচ্ছে...কি তুমি বিশ্বাস করো, ভাই...মার কাছে নিত্যই নীরোর কথা তুলতুম.. থিয়েটারে সে রাত্রে হঠাৎ তোমার সঙ্গে যে দেখা হয়, তারো ঢে আগে থেকে।...তারপর তোমার এই বিয়ে করার খপর পেয়ে ম বলতেন, নিরো সর্ব্বনাশ করেচিস, ছেলেমেয়েগুলোরও সর্ব্বনা করবি...এখানে আসার কথা প্রায় তিনি বলতেন। তা তুমি যে নীরোকে জানো...কি সর্ব্বনেশে খেয়ালী তার মন! কারো কথা টলবার নয়, কারো মিনতিতে গলবার নয়! এই যে এলো, এ ও নিজের খেয়ালে...আমার স্ত্রী সেই অবধি কাঁটা হয়ে আছে যেন! (বলে, তার নীলু বোনটি কি ভাবচে...তার সুখে আমরাই ঝড় তুললুম!

ব্রজনাথ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সুধাদিকে ভাবতে বারণ করো. আমাদের সুখের কুঞ্জে কোন ঝড় লাগেনি...তোমার বোনের খেয়া

আমিও তো জানি। তবে আমি একটু কৌতুক দেখচি...ছেলেমেয়েদের উপর আমার মায়া কি সত্যিই নেই? আছে। ওরা আমারো ছেলেমেয়ে তো...তাছাড়া বাইরে যাবার সঙ্কল্প করচি আজ তিন-চার বছর ধরে। পারিনি, তার কারণ, বাড়ীর কোনো পাকা বন্দোবস্ত করতে পারিনি বলে। এবার তোমার ভগ্নী আসায় সে বন্দোবস্ত হয়েচে...তোমার ভগ্নী পাকা গিন্নী এসে সংসারটীর সব ভার হাতে নিয়েচেন, আমিও তাই নিশ্চিন্ত হয়েচি। একটু বেরিয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েচি।

এ-কথায় নলিনাক্ষ একটু আরাম পাইল। সে কহিল,—তোমার কথায় বাঁচলুম। তুমি চিরদিন আমার বন্ধু...আমি তোমার আরাম সকলের আগে চাই। বাড়ীর স্বার্থ তোমার আরামের চেয়ে বড় করে আমি কখনো দেখিনি, এবং তো দেখবোও না.. আমার স্ত্রী নীলুদির সঙ্গে ষ্টেশনে দেখা করবেন বলে তৈরী হচ্ছেন। এখানে সে আসবে না... কারণ বুঝতেই পারচো তো...

ব্রজনাথ কহিল,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সুধাদিকে আমার ভালোবাসা দিয়ে বলো, তিনি চিরদিনই আমার স্নেহময়ী সুধাদি... তা ছাড়া ষ্টেশনে দেখা হবে তো...বেশ হবে। তুমিও দেরী করো না... ষ্টেশনে যাবার জন্য নিশ্চয় একটা ফন্দী বাৎলাবে বাড়ীতে...

হাসিয়া নলিনাক্ষ কহিল,—তা বাৎলাবো বৈ কি! বাৎলাবো কেন...বাৎলেচি। বাড়ীতে বলেচি, বায়োস্কোপ দেখতে যাবো... ট্যাক্সিতে যাবো...সোফারকে ছুটি দিছি, বলেচি, কাল ভোরেই আবার গাড়ী দরকার, তাকে আর রাত্রে খাটাবো না...

ব্রজনাথ কহিল,—বুদ্ধিমান বটে!

নলিনাক্ষ কহিল,—নীলুদি কোথায় ?...দেখা করে যেতুম...

ব্রজনাথ কহিল,—তোমার ভগ্নীর কাছে। তাঁর সঙ্গে ষ্টেশনেই দেখা করো...

নলিনাক্ষ কহিল,—সেই ভালো। নাহলে দেরী হয়ে যাবে... নীরুর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা না কয়েও তো যেতে পারবো না।...তাহলে চললুম ভাই...

নলিনাক্ষ চলিয়া গেল। ব্রজনাথ টুকি-টাকি জিনিষগুলা ঠিক লওয়া হইল কি না, তার সন্ধান করিতে লাগিল।......

গাড়ীতে বার্থ রিজার্ভ ছিল। ব্রজনাথ ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখে, নলিন ও সুধা আগে হইতেই প্ল্যাটফর্ম্মে হাজির। হাসিয়া সে নীলিমাকে কহিল,—ঐ ছাখো, কারা এসেচে...

—সুধাদি! বলিয়া নীলিমা হাসিয়া তার দিকে অগ্রসর হইল। সুধার নিকট গিয়া নীলিমা কহিল,—লক্ষ্মী দিদি আমার, তোমার জন্যে এমন মন কেমন করছিল—যাবার আগে দেখবার সাধ মনে এত বেশী হয়েছিল...

সুধা কহিল,— তাই তো এসেচি, ভাই। তোমার মনের খপর আমার কি কিছু জানতে বাকী আছে!

ব্রজনাথ কহিল,—গাড়ীতে বসে গল্প করো দু'জনে......

৩

আগ্রায় তাজের মর্ম্মর বেদীর উপর দুজনে বসিয়াছিল। আকাশে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নায় যমুনার কালো জলে তরল রূপার স্রোত ঝরিতেছিল।

ব্রজনাথ কহিল,—সার্থক ভালোবাসা এই বাদশা সাজাহানের! যুগ-যুগের নর-নারী ভালোবাসার এই স্মৃতিকে পূজা করে আসচে। আমি যদি তোমায় এমন ভালোবাসতে পারতুম, নীল...যে-ভালোবাসা অমর অক্ষরে চিরদিন পৃথিবীর বুকে খোদা থাকতো...

নীলিমা আবেগ-উদ্বেল বক্ষে কি ভাবিতেছিল,—মাথার উপর আকাশে ঐ জ্যোৎস্নার সাগর, পাশে স্বামী ব্রজনাথ...সামনে কত প্রেম, কত মায়া, কত স্বপ্ন দিয়া রচা অতীতের ওই সহস্র স্মৃতি-পুঞ্জ! নীরব নিশীথে ওই শ্বেত-পাথরের দেওয়ালে কি ভাষা যে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে! অত প্রেম, অত প্রীতি বুদ্বুদের মত অনন্ত কাল-সাগরের বুকে আজ মিশিয়া গিয়াছে!...ওই বিশাল প্রাসাদ, ওর কক্ষে কক্ষে নূপুরের কি নিক্কণই ধ্বনিত হইত! এই মোমতাজ বেগম...সাজাহানের অত প্রেমও তাকে বাদশার বুকটিতে ধরিয়া রাখিতে পারিল না...স্বামীর বাহু-পাশ হইতে ছিন্ন করিয়া কোথায় তাকে লইয়া গেল!...প্রেমের কি এমন শক্তি নাই, এ মিলন-পাশ অটুট রাখে...? সে শিহরিয়া উঠিল—তাদের এ নিবিড় মিলন—অদৃশ্য কোনো শক্তি যদি এ মিলনের বাঁধন টুটিয়া তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিচ্ছেদ আনিয়া দেয়? ব্রজনাথ যদি তার পাশে না থাকে...?

অজানা আশঙ্কায় ব্রজনাথকে সে আঁকড়িয়া ধরিল। ব্রজনাথ কহিল,—ভয় করচে ?

মৃদু হাসিয়া নীলিমা কহিল,—না।

ব্রজনাথ কহিল,—এমন জ্যোৎস্না, এমন জায়গা...মিলনের এই নিবিড় ডোর...একটা গান গাইবে, নীল ?

নীলিমা কহিল,—গাইতে পারবো না, এখন।

ব্রজনাথ কহিল,—কেন নীল ?...কি ভাবচো তুমি ?

নীলিমার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। কি অন্তর্গূঢ় বেদনা তার সমস্ত প্রাণটাকে যে চাপিয়া ধরিয়াছিল...! নীলিমা বাষ্পার্দ্র স্বরে কহিল,—বাদশার এত ভালোবাসা...তবু মোমতাজ চলে গেল !... আমার কান্না পাচ্ছে !...

ব্রজনাথ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—মানুষের শক্তি বড় অল্প... যাক মোমতাজ...বাদশা সাজাহান তো মৃত্যুহীন স্মৃতি দিয়ে সে প্রেমকে চিরদিনের জন্য বন্দী রেখে গেছেন।

নীলিমা কহিল—কিন্তু সে ভালোবাসার কাছে এ স্মৃতি কত তুচ্ছ ! হাসির স্মৃতি বেদনার স্তূপ হয়ে পড়ে আছে শুধু !

ব্রজনাথ কহিল,—তা বটে !...ব্রজনাথ নীরব হইল। তারপর কহিল,—আগ্রার আকাশ-বাতাস ভালোবাসার নেশায় আজো যেন মশগুল রয়েচে ! পথে চলতে আমার কাণে প্রেমের কত সুখ, কত হাসি, কত কথা, নৈরাশ্যের কত দীর্ঘশ্বাসই যে বেজে উঠচে,...আমার কেবলি মনে হচ্ছে, আমি যেন সত্যিকার দুনিয়া ছেড়ে কোন্ মায়ায় ঘেরা স্বপ্নলোকে বিচরণ করচি..."আগ্রা যেন প্রেমের তীর্থ !" সেই ছোট্ট কবরটুকুর কথা

মনে আছে, নীল? শ্বেত পাথরের ছোট বেদীটুকু—মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে? সেই মতি-বেগমের কবর...মতি-বেগমের কথা জানো?

নীলিমা অশ্রু-ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিল।

ব্রজনাথ কহিল,—চমৎকার কাহিনী—হাসি আর অশ্রু দিয়ে রচা!... শোনো, বলি...

নীলিমা উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ব্রজনাথ কহিল,—মতি ছিল এক ইরাণ-বাঁদী। আগে তার কি নাম ছিল, তার কোনো খপর পাই নি। বাদশার দরবারে বাদশার পায়ে তাকে এনে নজরানা দেয় এক ইরাণ সদাগর। নজর দিয়ে অনেক টাকা সে বখশিস পায়। মতি বাঁদী হয়ে রং-মহালে ঢোকে। তার রূপের রোশনিতে রংমহাল আলো হয়ে ওঠে! বেগমদের রিষ হলো...! এই যে রূপের ছোট শিখাটুকু, আগুনের ফুলকির মত..এ দু'দিনে জেগে উঠবে...হয়তো এই ছোট ফুলকিটুকু তখন প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠে তাদের ভাগ্যকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে! এ ফুলকিকে নিবোতে না পারলে বেগমদের সোয়াস্তি নেই! এক হাব্‌শী বাঁদীর উপর বড় বেগমের হুকুম জারি হলো, মতির শির নে... কিন্তু খুব চুপি-চুপি, বাদশার কাণে এ খপর না যায়!

নীলিমা অধীর চাঞ্চল্যে কহিল,—তারপর?

ব্রজনাথ কহিল,—হাবশী হলেও বিধাতা তার বুকের কোণে একটু মমতা বুঝি পুরে রেখেছিলেন—তার উপর এমন রূপ...ইরাণী ও-চোখ দুটি তুলে চাইলে দুনিয়া ভুলে যেতে হয়! হাবশীর কেমন মায়া হলো...রঙীন ফুলটিকে তার পাপড়ি ছিঁড়ে নষ্ট করতে জহ্লাদেরও কোনো ক্ষণে একটু মমতা জাগা অসম্ভব নয়! হাবশী বাঁদী ইরাণীকে লুকিয়ে রাখলে, ভাবলে,

নিজের কুঠ্‌রিতে আপাততঃ রেখে শেষে তাকে মুক্তি দেবে আগ্রার পথে... রাত্রির আড়াল পেয়ে ইরাণীকে সে সরাতে যাচ্ছে, এমন সময় বাদশার সামনে পড়ে গেল। বাদশা ইরাণীর রূপ দেখে মুগ্ধ, বিবশ! হাবশীকে বহুৎ বখশিস্‌ দিয়ে ইরাণীকে বুকে নিয়ে বাদশা হারেমে ঢুকলেন—এক লহমার চোখের নেশায় ইরাণী হলো বাদশার বুকের কলিজা, চোখের রোশনি,—এত বড় বাদশাহীর মালিক, সেরা বেগম! ইরাণীর নামে মোহর খোদা হলো, ইরাণীর জন্য বাদশাহী মহালের ভোল ফিরে গেল, নতুন মহাল গড়া হলো! তাকে নিয়ে বাদশার খেলা ফোয়ারার মত শতধারে উছসে উঠলো! ইরাণীর সুখ-ঐশ্বর্য্যের আর সীমা রইলো না!...

নীলিমার বেশ লাগিতেছিল...এ প্রমোদ-উৎসবের সঙ্গে তার জীবনেরো অনেকখানি যেন মেলে...সেও তো ছিল ঐ বাঁদীর মত, পৃথিবীর ধূলিরাশির মধ্যে কোন্‌ গোপন অন্তরালে, শত অভাবের মধ্যে... আশার এতটুকু আলোও সেখানে প্রবেশ করিতে ভয়ে কুণ্ঠিত হইত!... তারপর দৈবাৎ একদিন তার বাদশা ব্রজনাথ তাকে দেখিয়া ফেলিল, এবং তারপর.......

ব্রজনাথ কহিল,—কিন্তু পূর্ণিমার রাত্রি যেমন ফুরোয়, তেমনি ইরাণীর সৌভাগ্য-শশীও অচিরে একদিন অস্তমিত হলো! তুরাণ থেকে যুদ্ধ জয় করে সেনাপতি এলেন, এক নূতন বাঁদী এনে বাদশার পায়ে তিনি তাকে উপহার দিলেন। তুরাণ-বাঁদী তরুণী, রূপেরো তার সীমা ছিল না! বাদশার মন টল্‌লো! তুরাণীকে বুকে ধরে তিনি ইরাণীকে বললেন,—হঠো...ঢের হয়েচে! ছাড়ো তোমার আসন!...

বেচারী ইরাণী! সন্ধ্যায় হাজার-বাতির ঝাড় জ্বেলে বেচারী নিজের হাতে ফুলের মালা গাঁথছিল! বাদশার কথা শুনে হাতের ফুল হাত থেকে ঝড়ে পড়লো! বাদশার কথায় তার বুক ভেঙ্গে গেল।... তার প্রাণের যত মধু, যত সুধা...বাদশার তা এরি মধ্যে নিঃশেষে পান হয়ে গেছে? আর্ত্ত ক্রন্দনে বাদশার পায়ে লুটিয়ে পড়ে সে বলতে লাগলো,—আছে, আছে, এখনো আছে, এখনো আছে বঁধু হে, আমার প্রাণের কাণায় কাণায় সুধা-মধু, অজস্র, অজস্র ধারে...

বাদশা তার পানে চাইলেন,—না, এর চেয়ে তুরাণী আরো সুন্দর, বয়স তার আরো তরুণ...তাছাড়া ইরাণীর প্রাণ-মন, তার কোন গোপন কোণই বাদশার কাছে অজানা নেই...পুরানো পুঁথির মতই তার সারা অবয়ব, তার মনখানাকে অবধি পড়া শেষ হয়ে গেছে! তার মধ্যে আর নূতনত্ব নেই, বৈচিত্র্য নেই,...আর তুরাণী?..অজানা রহস্যে তার ওই সারা অবয়ব ঘিরে আছে...নূতন সুধা, নূতন মধু...বাদশা বললেন,—চলে যা ইরাণী, জীর্ণ কেতাবের মত তোর অঙ্গের প্রতি পৃষ্ঠা আমার নিঃশেষে পড়া হয়ে গেছে...আর না,—ওতে আর নেশা নেই, মজা নেই!

বেদনার একটা আর্ত্ত রব তুলিয়া নীলিমা ব্রজনাথের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—ওগো, থামো, আর না, আর না, থামো, থামো তুমি। আমি এ গল্প আর সহ্য করতে পারচি না...ইরাণীর বেদনা ভারী পাথর হয়ে আমার বুকের উপর চেপে ধরচে...থামো, থামো তুমি...

ব্রজনাথ এতক্ষণ মুগ্ধভাবে সেই প্রেমের বেদনা-মাখা কাহিনী বলিয়া চলিয়াছিল, সহসা নীলিমার এ-ভাবে বিচলিত হইয়া সে কহিল,—

ও কি করচো নীল! এত অস্থির হচ্ছো কেন! এ যে গল্প...কোথায় ইরাণী? তার জীবনের খেলা শেষ হয়ে গেছে...এ শুধু তার গল্পটুকু... হয়তো এতে অতিরঞ্জন আছে...!

তেমনি আর্ত্ত স্বরে নীলিমা কহিল,—থাক, থাক, ও আর শুনতে পারি না! এমন করে নিজের প্রাণ-মন বাদশার পায় সঁপে দিয়েছিল, যৌবনকে আঙুরের মত নিঙড়ে নিঙড়ে তার রস বাদশাকে আকণ্ঠ পান করিয়েচে, আর বিনা দোষে তাকে এই হেনস্থা...না! কি তার অপরাধ?

নীলিমাকে এতখানি বিচলিত দেখিয়া ব্রজনাথ অধীর হইয়া উঠিল। নীলিমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া ব্রজনাথ কহিল,—কি একটা গল্প শুনে তুমি এমন অস্থির হচ্ছো, নীল! গল্প গল্পই...

নীলিমা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—ওগো না, না...তুমি শুধু গল্পই দেখচো...কিন্তু ওর মধ্যে কত বড় হাহাকার, কি বুক-ফাটা যাতনা ..তুমি পুরুষ-মানুষ, তাই তা তোমার চোখে পড়চে না! কিন্তু আমি,...বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নীলিমা আবার কহিল,—মেয়ে মানুষ ভালো বেসে নিজেকে কি-ভাবে গলিয়ে ভেঙ্গে প্রিয়র পায়ে সঁপে দেয়—কি তুচ্ছ যৌবনের কথাই পুরুষ তোলে! কি তুচ্ছ যৌবনেই পুরুষ মত্ত হয়, মশগুল হয়! অঙ্গের এই ক্ষণিক জলুষ, দেহের এই নিমেষের পরিপূর্ণতা ...এইটেই কি নারী, না, তার সার? না, না, কি ভুল যে বোঝো তোমরা ...বাহিরের এ-সব আবরণের নীচেই নারীর সব আছে—তার নারীত্ব, তার প্রেম, স্নেহ, দরদ, প্রীতি, তার যা-কিছু শোভা-ঐশ্বর্য্য!...ও-সব ক্ষণিক তুচ্ছ আবরণের চেয়েও সে ঢের দামী...যা থেকে তার হাসির উৎস ছোটে, তার অশ্রুর ঝরণা নামে, তার প্রীতি-প্রেমের পদ্ম সহস্র-দল মেলে

ফুটে ওঠে,...তার নাগাল পুরুষ পাবে না কোনোদিন? তার পানে সে ফিরেও চাইবে না কখনো?...নীলিমা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্রজনাথ হাসিয়া কহিল,—ও তো বাদশার কথা তুলচো তুমি! আমি তো বাদশা নই...বা বাদশার চোখেও নারীকে দেখিনি কোনোদিন... তোমাকেও তেমন দেখি না যে, তোমার দুঃখ হবে! এইটুকু বলিয়া সে চুপ করিল; তারপর হাসিয়া আবার পরক্ষণে কহিল,—তুমি ইরাণ বাঁদী নও, আমিও দিল্লীর বাদশা নই, তার উপর তুরাণ জয় করে আমার কোনো সেনাপতি আমায় তুরাণ-বাঁদী নজর দেবে, তারো কোনো সম্ভাবনা নেই কস্মিন কালে!...কথাটা বলিয়া ব্রজনাথ নীলিমার অধরে সস্নেহে চুম্বন করিল, চুম্বন করিয়া নীলিমার বসনাঞ্চলের প্রান্ত দিয়া তার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে কহিল,—ছি, কেঁদো না। পাগল হয়েচো তুমি! কার দুঃখ নিজের বুকে টেনে এনে এতখানি বিহ্বল হচ্ছো, বলো তো... এক ইরাণ-বাঁদী...

নীলিমা কহিল;—ইরাণ-বাঁদীর কথা নয় গো,...এ যে জগতের নারীর কথা, নারী-জাতির বেদনার কথা এ...তার প্রাণের অতি-গোপন প্রচণ্ড ব্যথার কথা যে...

ব্রজনাথ কহিল,—ও কথা আর ভাবতে হবে না। তার চেয়ে, চেয়ে ছাখো, ওই যমুনার জলের পানে...কি রূপালি-পাত-মোড়া ছোট ছোট ঢেউ বইছে...যেন হাসির ঝিলিক ফুটেচে!...

নীলিমা ভারী বুকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—দৃষ্টি তার যমুনার পর-পারে! জ্যোৎস্নার ওই আলোর পর্দার পিছনে অস্পষ্ট আবছায়ার মত ঐ যে তীর-ভূমি দেখা যাইতেছে, তাহারি পানে। ও-পার যেন কাতর

বুকে. ম্লান চোখে এই তাজের দিকে চাহিয়া আছে !...ব্রজনাথ নীলিমার পানেই চাহিয়া ছিল, মুগ্ধ নয়নে !

হঠাৎ নীলিমা কহিল,—আগ্রা আমার আর ভালো লাগচে না ! এর বাতাসে যেন নারীর আর্ত্তনাদ হা-হা করে ফিরচে ! নারীর বুকের কলিজা পুড়িয়ে অতীত পুরুষের এখানে যেন দেওয়ালির উৎসব চলেছিল ... আর সে-উৎসবে নারীর নারীত্বে আগুন ধরিয়ে বাদশারা প্রভুত্ব-গর্ব্বে আতশবাজী পুড়িয়েচে ! সে আগুন যেন আমার চোখের সামনে জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলচে...তার আঁচে আমার মন অবধি যেন জ্বলে যাচ্ছে ! এ কবরের দেশ ছেড়ে আর কোথাও আমায় নিয়ে চলো গো...আগ্রার বাতাস আমার একটুও সহ্য হচ্ছে না আর...

ব্রজনাথ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—আগ্রা তোমার ভালো লাগলো না, নীল ? তুমি যে নতুন কথা বলচো ! আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ার যত কবি আগ্রাকে সোনার চোখেই দেখে এসেচেন....তারিফ করে আগ্রার সম্বন্ধে কত কবিতাই তাঁরা লিখেচেন...আগ্রার এমন অপযশ কেউ গায়নি কোন দিন...

নীলিমা কহিল,—না থাক্ ! আমার ভালো লাগচে না ! চারিধারে যেন মৃতের কাতর নিশ্বাস জমে রয়েচে...এখান থেকে চল গো—আগ্রা ছেড়ে আর কোথাও...না হয় বাড়ীই ফিরি ..

ব্রজনাথ কহিল,—সে কি, নীল ! বাড়ী ফিরবো কি ! বাড়ীতে কারা এসেচে, মনে নেই ?...তাছাড়া আমরা যে কাশ্মীর যাবো বলে বেরিয়েচি...কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ...ভূ-স্বর্গ দেখবে না ? কথাটা বলিয়া ব্রজনাথ নীলিমাকে বক্ষে টানিয়া লইল।

নীলিমা স্বামীর মুখের পানে চাহিল, চাহিয়া গাঢ় স্বরে কহিল,—এই তো আমার ভূ-স্বর্গ! আর কোনো ভূ-স্বর্গ আমি চাই না তো . আমার ভূ-স্বর্গ এই তোমার বুকখানিতে!

ব্রজনাথ আনন্দে বিহ্বল হইয়া নীলিমার অধরে চুম্বন করিয়া কহিল,—এ স্বর্গ নয়; স্বর্গ ছিলও না...তোমার স্পর্শে একে যদি স্বর্গ ই গড়ে থাকো...

৪

নিজেদের মোটরে চড়িয়া র‍্যাওয়ালপিণ্ডি ছাড়িয়া যখন পার্ব্বত্য-প্রদেশে তারা প্রবেশ করিল, তখন সেখানকার সে ভীষণ-মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া নীলিমা সত্যই মুগ্ধ হইল। সে কহিল,—কি সুন্দর !

ব্রজনাথ কহিল,—পাহাড়ের প্রচণ্ড বাধা ঠেলে আমরা যাবো কি করে, নীল ?

নীলিমা চাহিয়া দেখে, সামনে উঁচু মাথা তুলিয়া পাহাড়ের পর পাহাড় যেন প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে...সত্যই তো, এ বাধা ঠেলিয়া কোথায় যাইব ? কি করিয়া যাইব ?

তাদের মনের এ-সব চিন্তার দিকে দৃকপাতমাত্র না করিয়া হাওয়ার বেগে মোটর ছুটিয়াছিল। কখনো সে উচ্চে উঠিতেছে, কখনো নীচে নামিতেছে, পাশে প্রকাণ্ড খাদ - সহস্র বাঁক ! এই যে, এমন দুর্গম গিরির বুকে পথও আছে তো বেশ !...নীচের দিকে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও হয় তেমনি !

ব্রজনাথের মনে হইতেছিল, তার জীবনের পথেও এমনি পাহাড়ের বাধা ছিল, পাশে এমনি খাদ ছিল...সে পাহাড়ে মাথা ঠুকিয়া সে মরে নাই, সে খাদেও গড়াইয়া পড়ে নাই ! খুব রক্ষা পাইয়াছে ! ভাগ্যে তা হয় নাই, তাইতো সে নীলিমাকে পাইয়াছে ! তেমনি এ বাধা ঠেলিয়া এ খাদ পার হইয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীরেও না পৌঁছিব কেন !...

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে পাহাড়ের কোলে গড়হির ডাক-বাংলায় আস্তানা লইয়া নীলিমাকে সে চারিধারের শোভা দেখাইতেছিল। একধার দিয়া ঝিলাম বহিয়া চলিয়াছে,—ঝিলামের তীরে উঁচু পাহাড়ের কোলে পথ, পথের গায়ে সুদৃশ্য বাংলা। বাংলার পরই আবার উঁচু পাহাড় উঠিয়াছে! ব্রজনাথ কহিল,—সব কোলাহলের আড়ালে এই নির্জ্জন বাংলাখানিতে তোমায় নিয়ে থাকতে পেলে জীবনে আমার আর চাইবার কিছু থাকে না, নীল...

নীলিমা হাসিয়া কহিল,—দক্ষিণ হস্ত চলবে কি করে?

ব্রজনাথ কহিল,—দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেলে দেবো। এ শোভা, এ মাধুরীর মধ্যে দক্ষিণ হস্তের কথা তোমার মনেও আসে! ..

নীলিমা আবার হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তা আসে বাপু, দক্ষিণ হস্ত আমি কাটতে পারবো না—লাগবে। তাছাড়া এতখানি অঙ্গহানি করে মানুষ থাকতেও পারে না!...

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ, তোমার দক্ষিণ হস্ত বজায় থাকুক, তবে ও হস্ত আমার কণ্ঠে মালার মত লুটিয়ে পড়লেই আমি আরাম পাই...বলিয়া সে নীলিমার হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

নীলিমা সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল,—কি যে বলো! চারিধারে লোকজন রয়েচে...

ব্রজনাথ কহিল,—আছে না কি! আমি তো চোখের সামনে শুধু তোমাকেই দেখচি...আর সব আমার চোখের সামনে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে!...

নীলিমা কহিল,—তুমি ভারী এ ..যাও!—এসো না, একটু পথে

যাই...বলিয়া সে কহিল,—ত্থাখো, ত্থাখো, কাশ্মীরি মেয়েরা জলে নেমেচে! কি সুন্দর...জলে যেন গোলাপ ফুল ফুটেচে! কি রং...।

ব্রজনাথ কহিল,—ওদিকে আমায় প্রলুব্ধ করো না...জানো তো, রংয়ের আমি পূজারী...

নীলিমা কহিল,—থাক্, ঢের হয়েচে মশায়! কি কথায় কি কথা এলো। তা সত্যি, কি নিয়েই ভুলে আছো, তা জানি না...ত্থাখো দিকিন, একবার কাশ্মীরী মেয়ের রং...আর কি গড়ন! চোখ ফেরানো যায় না!

ব্রজনাথ কহিল,—আমার চোখে তো তেমন লাগচে না—আমার এ চোখ যে তোমায় নিয়ে পাগল হয়ে আছে!

নীলিমা কহিল,—আজো?

ব্রজনাথ কহিল,—বিরামহীন বিবশ আঁখি, বিভোর মোর প্রাণ!

নীলিমা কহিল,—সত্যি, বলো না। এত কাল তো আমায় দেখচো, পুরোনো হয়ে যাইনি? চোখের কোনো ক্লান্তি হয়নি আমায় দেখে দেখে?

ব্রজনাথ কহিল,—না, না, না,—আমার চোখে তেমনি ছবির মতই ফুটে আছো! যেদিন এ ছবি মিলুবে, সেদিন যেন আমার এ দুই আঁখি চির-ঘুমে আচ্ছন্ন হয়!

নীলিমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল,—যাও, অমন কথা যদি বলো তো তোমার সঙ্গে কথা কবো না, ভয়ঙ্কর আড়ি করে দেবো।

ব্রজনাথ কহিল,—না, না। অমন নিঠুরা নিদয়া হয়ো না, প্রেয়সি,

অধীনে সদয়া রহ...
কি দিয়া তুষিব? আর কি-বা দিব?
আমারে সে কথা কহ!

নীলিমা কহিল,—কবি হয়ে উঠলে যে...

ব্রজনাথ কহিল,—হবো না? কল্পনার উৎস সামনে রয়েচে...

নীলিমা কহিল,—তোমার পাগলামি আর শুনতে পারি না। থাকো তুমি—আমি বেড়াতে চললুম..বলিয়া নীলিমা ঝিলামের তীরের পথ ধরিয়া বহুদূর চলিয়া গেল। ব্রজনাথও অগত্যা তার অনুসরণ করিল।...

তিন-চারদিন পরের কথা। শ্রীনগরের কোলে ঝিলামের বুকে হাউস-বোট...অদূরে শঙ্করাচার্য্য পাহাড়। বোটের ঘরে খোলা জানালার ধারে বসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—মোটরখানা আনাই। নিশাৎ বাগে বেড়াতে যাওয়া যাক।

নীলিমা কহিল,—এমন চমৎকার আমার লাগচে যে আর কোথাও না গেলেও ক্ষতি নেই! সারা দিন-রাত আমি বোধ হয় ঐ জলের দিকে, কি, ঐ পাহাড়ের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। দ্যাখো তো, ঐ দূরের পাহাড়গুলি মেঘের গায়ে মিশে কেমন মেঘ্‌লা রঙে জেগে রয়েচে! কোথায় যাবে? এইখানেই বসে পাহাড় দ্যাখো!

ব্রজনাথ কহিল,—তা করে কাজ নেই! নিশাতে যাওয়া যাক। ডল লেকে শিকারা চড়ে কি আনন্দই পাওয়া গেছে! এত আনন্দ মর্ত্ত্য লোকে আছে বলে কল্পনাও করিনি কোনো দিন...

নীলিমা কহিল,—সেই পদ্মের রাশ...আহা, সত্যি, পদ্মবনটি চমৎকার!

ব্রজনাথ কহিল,—কোন্‌টা এখানে চমৎকার নয়, বলো?

ব্রজনাথ বোটের সর্দ্দার মাঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, মোটরটা আনিতে বলিয়া দাও...

সর্দ্দার মাঝি সেলাম করিয়া কহিল,—শিকারা, শেঠ-সাব?

ব্রজনাথ কহিল,—শিকারা সকালে তৈরী রেখো। এখন নয়।

মাঝি চলিয়া গেল। নীলিমা কহিল,—চায়ের সরঞ্জাম-টরঞ্জাম নিয়ে যাবো ?

ব্রজনাথ কহিল,—তোমায় কিছু করতে হবে না। নাথুকে হুকুম করচি।

নাথু ভৃত্য কলিকাতা হইতে সঙ্গে আসিয়াছিল, তাকে টিফিনের আদেশ দেওয়া হইল, সে সব সরঞ্জাম গুছাইয়া লইয়া সঙ্গে যাইবে।

নীলিমা কহিল,—আমায় তুমি কোনোদিন কোনো কাজ করতে দিলে না! চিরকাল অকেজো করেই রাখলে!.. এত বড় অকেজো কিন্তু আমি সত্যি নই !

ব্রজনাথ কহিল,—এই সব দাসী-চাকরের কাজ নাই করলে, নীল ! তোমার শুধু এক কাজ থাকুক্—চিত্ত-হরণ, মুগ্ধ-করণ, প্রমোদোৎসব-রঞ্জন !

নীলিমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—কিন্তু শুধু চিত্তহরণ করতেই আমি চাইনে! পিত্ত-হরণের ব্যাপারেও নিত্য যোগ দিতে চাই! আমি তোমার স্ত্রী !

ব্রজনাথ কহিল,—শুধু স্ত্রী নও...সখী মিথঃ...

নীলিমা রোষের ভঙ্গীতে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ব্রজনাথ কহিল,—রাগ করেচো নীল ?

নীলিমা কহিল,—আমার ভারী দুঃখ হয়, আমায় তুমি কি যে ভাবো...

ব্রজনাথ কহিল,—ভাবি, তুমি নয়ন-আনন্দরাশি প্রেয়সি আমার !

নীলিমা কহিল,—শুধু প্রেয়সি হতে চাইনে আমি...

ব্রজনাথ নির্ব্বাক দৃষ্টিতে নীলিমার পানে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা কহিল,—আমি তোমার স্ত্রী হতে চাই...গৃহিণী হতে চাই। এই রূপ, এই শ্রী...এইটেই তো আমার সব নয়!

ব্রজনাথ এ-কথায় চমকিয়া উঠিল,—তার মানে?

নীলিমা কহিল,—মানে, আমায় শুধু প্রমোদের সহচরী বলেই ভেবো না। একটু কাজ করতে দাও...তোমার কাজ...

ব্রজনাথ কহিল,—আচ্ছা, ভেবে দেখতে দাও আমায়...কি কাজের ভার তোমায় দেবো—এমন ভার দেবো যে, তখন বলবে, ওগো, ফিরিয়ে নাও তোমার কাজের ভার!

নীলিমা কহিল,—দিয়ে ছাখো, কখনো তেমন কথা আমার মুখে বেরোয় কি না...

একখানা শিকারা বহিয়া একদল ফিরিওয়ালা আসিয়া বোটে চড়িল—তাদের শিকারায় ওয়ালনাট কাঠের তৈরী বিবিধ খেলনা! ছোট ছোট হাউস-বোট, চায়ের ট্রে, আরো কত কি। পছন্দ করিয়া কয়েকটা জিনিষ লইয়া ব্রজনাথ ফিরিওয়ালাকে দাম দিবে, এমন সময় নীলিমা কহিল,—আমায় ঐ ছোট বোট চারখানা কিনে দাও—যতিনাথদের জন্য...

বোট লওয়া হইল। ফিরিওয়ালা সেলাম করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় মাঝি আসিয়া সংবাদ দিল, মোটর আসিয়া ঝিলামের ওধারে পথে দাঁড়াইয়া আছে।

নাথুকে ডাকিয়া চায়ের ও টিফিনের সরঞ্জাম সঙ্গে দিয়া ব্রজনাথ এবং নীলিমা আসিয়া মোটরে উঠিল।...

পথে পাহাড়ের কোলে দুলিতেছে...পরীমহল. চশমাসাহি...বাদশাহী কীর্ত্তির, বাদশাহী খেয়াল-খেলার স্মৃতির কণাগুলি !

নিশং বাগ—ফুলের কি প্রচুর ফশল ! রঙে রঙে চারিধার রঙীন ! থাকে-থাকে জমি উঠিয়া পাহাড়ের কোলে গিয়া ঘেঁষিয়াছে ! আর সে জমি আগাগোড়া ফুলে ফুলে ছাওয়া...কে যেন কুসুম-শয়ন বিছাইয়া রাখিয়াছে ! ফোয়ারা, রংমহাল...উৎসবের কি সমারোহই না একদিন ঘটিত এখানে ! রূপের পূজারী বাদশা রূপের কি মেলাই বসাইতেন !

লতানে গোলাপ ঝাড়ের পাশে নরম ঘাসে ছাওয়া উচ্চ ভূমি—ব্রজনাথ সেইখানে বসিয়া পড়িল। একটা মালী আসিয়া নীলিমার সামনে ডালি ধরিল। ডালির উপর আখরোট, বাদাম, আপেল, পীয়ার। ব্রজনাথ কহিল,—নাও, ও নজর দিচ্ছে। ওকে কিছু পয়সা দিতে হবে—এটা এখানকার দস্তুর !

নীলিমা কহিল,—কত দিতে হবে ?

ব্রজনাথ কহিল,—সে নাথু দেবে'খন—বলে দিচ্ছি।

ব্রজনাথ নাথুকে ডাকিল, কহিল,—একে দুটো টাকা দে।

নাথু মালীকে দু'টাকা বখশিস্ দিলে মালী চলিয়া গেল। ব্রজনাথ নাথুকে কহিল,—তুই নীচে ওই ছায়ায় গিয়ে চা তৈরী কর্‌গে...নাথু আদেশ পাইয়া বিদায় লইল।

ব্রজনাথ ডাকিল,—নীল...

নীলিমা মুগ্ধ আবেশে এক দিকে তাকাইয়া ছিল, কহিল,—উঁ,...

ব্রজনাথ কহিল,—কাছে এসো।

নীলিমা কাছে সরিয়া বসিল। ব্রজনাথ কহিল,--আমার কি মনে হচ্ছে জানো, নীল? এই শোভার মধ্যে...?

নীলিমা কহিল,—কি?

ব্রজনাথ কহিল,—চারিধারে শুধু চেয়ে থাকি, আর...

নীলিমা কহিল,—কি, আর?

ব্রজনাথ কহিল,—অধর অধরে বসি' প্রহরীর মত

চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিয়া!

নীলিমার মন আবেশে ভরিয়া উঠিয়াছিল। ব্রজনাথ তাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল,—ভাগ্যে এই ঠাঁই ছিল, নাহলে তোমার রূপ-মাধুরী তেমন করে উপভোগ করতে পারতুম কখনো...! এ রত্নটিকে বুকে নিতে হলে তার চারিধারে চাই এই ফুল, এই ঝরণা, এই ...ক্ত সৌন্দর্য্যটুকুও সেই সঙ্গে!'

সেই এক কথা, এক সুর! নীলিমার বুকের কোন্ গোপন তল হইতে একটা আর্ত্ত ক্রন্দন উথলিয়া উঠিতেছিল! এমন স্থানে স্বামীর এই আদর—তবু এ আর্ত্ত ক্রন্দন ওঠে কেন! এ বুঝি, তার চেতন-জাগ্রত নারীত্বের মর্ম্মবেদনার কাতর দীর্ঘশ্বাস!

৫

সেদিন বৈকালে পায়ে হাঁটিয়া ব্রজনাথ ও নীলিমা থার্ড ব্রিজ অবধি চলিয়া গেল। তারপর ঘুরিয়া চেনার-বাগের ধার দিয়া বর্বর-শা রোড ধরিয়া আসিয়া শ্রীনগরের বিস্তীর্ণ পোলো গ্রাউণ্ডের একধারে বসিল। দুই ধারে সুদীর্ঘ সফেদা গাছের সারি—সমান্তরালে অবস্থিত, তাদের উচ্চ শির আকাশকে স্পর্শ করিবার উদ্দেশ্যে কত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে! একদিকে শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের চূড়ায় সংলগ্ন প্রকাণ্ড বিজলী-বাতিটার গায়ে অস্ত-রবির লাল রশ্মি পড়ায় তার কাচটা ঝক্‌মক্‌ করিতেছিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিলামের দিকে কাঠের সুদৃশ্য কটেজগুলি বিলাতী চিত্রকরের হাতে আঁকা ছবির মত দেখাইতেছিল। নীলিমা কহিল—শ্রীনগরে আর কত দিন থাকবে?

ব্রজনাথ কহিল,—কেন, তোমার ভালো লাগচে না?...আমি তো দেশের কথা ভুলেই গেছি...

নীলিমা কহিল,—ভালো লাগচে খুবই, তবু এখানে বিদেশী তো আমরা। দেশের জন্য মন কাঁদবে না তাবলে? সব রইলো সেখানে...

ব্রজনাথ কহিল,—তোমার মার জন্য তোমার মন কেমন করচে, বুঝি? অবু...?

নীলিমা কহিল,—তেমন মন কেমন না করুক, চিঠি তো পাচ্ছি,—তবে এই যে নিত্য কত নতুন জিনিষ দেখচি, এ-সবের কত কথা যে আপন-জনদের বলতে ইচ্ছা করচে...তাদেরো যদি এ-সব দেখাতে পারতুম!

ব্রজনাথ কহিল,—চিঠিতেও তো দেখানো যায়।

নীলিমা কহিল,—আমি তো কবি নই যে, এই সৌন্দর্য্যের বর্ণনা লিখে জানাবো!...এই অবধি বলিয়া নীলিমা চাহিয়া দেখে, মাথায় পাগড়ি-আঁটা ব্রীচেশ-পরা একজন ভদ্রলোক, সঙ্গে পার্শী ধরণের সাড়ী পরা একটি মহিলা, তাদের দিকেই আসিতেছেন। এঁরা পাঞ্জাবি, না কাশ্মীরী? মহিলার পরিচ্ছদ আধুনিক সৌখীন বঙ্গ-মহিলার মতই! নীলিমা কহিল—এদিকে কারা আসচে না...? বাঙালী হয় যদি?

—জ্বালালে! বলিয়া ব্রজনাথ সেই দিকেই উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক কাছে আসিলেন এবং বিশুদ্ধ সরল বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করিলেন,—মাপ করবেন—আপনারা কি বাংলা দেশ থেকে এসেচেন?

ব্রজনাথ কহিল,—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

আগন্তুক কহিল,—ক'দিন আপনাদের দেখচিও। ইনি আমার স্ত্রী...কাশ্মীরে বাঙালী কেউ এলে তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ না করতে পারলে এঁর মনে মহা-অশান্তির সৃষ্টি হয়—তাই অন্যায় ভাবে আজ আপনাদের একধারে বসতে দেখেও সে নিভৃত বিশ্রাম-সুখের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে এসেচি...!

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ তো, আসুন...

আগন্তুক কহিলেন—আপনারা ঐ লালমুণ্ডির সামনে আছেন, না?

লালমুণ্ডি শ্রীনগরের ষ্টেট-মিউজিয়ম। ঝিলামের ঠিক বুকের উপর, সুদৃশ্য গৃহখানি।

ব্রজনাথ কহিল,—হ্যাঁ, লালমুণ্ডির এপারে আমাদের বোট আছে।

আগন্তুক কহিল,—বোটের কি নাম বলুন তো?

শ্রীনগরের খাস বাসিন্দা ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছাড়া খুব সম্ভ্রান্ত এবং বিদেশীরা সকলেই হাউস-বোটে থাকেন—এবং প্রত্যেক হাউস-বোটের একটি করিয়া রংদার বা সৌখীন রকমের নাম আছে।

ব্রজনাথ কহিল,—আমাদের হাউস-বোটের নাম, পরীস্তান।

আগন্তুক কহিলেন,—তাহলে মাহমদুর বোট!...আজ আপনাদের বোট তালাশ করে বার করবো বলেই স্থির করেছিলুম, আমরা স্বামী-স্ত্রীতে। তার পর আপনারা বেড়িয়ে ফিরছিলেন, আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে...আমরা লক্ষ্য করে আপনাদের পাছু নিয়েছি... এই অবধি বলিয়া আগন্তুক তাঁর সঙ্গিনীকে কহিলেন,—তোমরা আলাপ করো...এসো...

আগন্তুক ব্রজনাথের পরিচয় লইলেন,—নিজেরো পরিচয় দিলেন। তাঁর নাম যতীন্দ্র বাবু...কাশ্মীর মহারাজের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। তাঁরা প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া কাশ্মীরে বাস করিতেছেন,—তবে বিবাহ করিয়াছেন, কলিকাতায়। তাঁর স্ত্রীটি চমৎকার লোক, খুব মিশুক। পরকে আপন করিতে এঁরা স্বামী-স্ত্রীতে ভারী মজবুত! তার পরিচয়ও অচিরে পাওয়া গেল।

যতীন্দ্রবাবুর গৃহিণী নীলিমাকে একেবারে যেন পাইয়া বসিলেন—কহিলেন,—মাঠ থেকে বেড়িয়ে আমাদের ওখানে আপনাদের যেতে হবে...চা খেয়ে তবে বোটে ফিরবেন।

যতীন্দ্রবাবু ব্রজনাথকে কহিলেন,—এখানকার সব দেখাশুনা হলো? অচ্ছাবল! বেরীনাগ...! অনন্তনাগ? গুলমার্গ? উলার লেক?

এগুলো সব দেখে ফেলুন...এ সব না দেখলে তো কাশ্মীরের কিছুই দেখা হলো না! নিশং-বাগে গেছলেন ? শালেমারে ?...ভালো কথা, এ্যানিকাট দেখে এসেচেন ?

ব্রজনাথ কহিল,—নিশতে, শালেমারে গেছলুম—শঙ্করাচার্য্য পাহাড়েও উঠেছিলুম। আর কিছু দেখা হয় নি।

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন—হরি-পর্ব্বতের ফোর্ট ?

ব্রজনাথ কহিল,—না।

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—চলুন একদিন।

একে শ্রীনগর, তায় মুক্ত ময়দান...শ্রীনগরে পর্দ্দার তেমন রেওয়াজ নাই। ব্রজনাথের পর্দ্দা সম্বন্ধে কোনো রকম কড়াকড় ছিল না, যতীন্দ্রবাবুরও তাই,—কাজেই সামান্য একটু ব্যবধানের পর্দ্দা মাঝখানে রাখিয়া একদিকে পুরুষ দুজন, অপর দিকে মহিলা দুটীর যে আলাপ ধীরে ধীরে সুরু হইল, তাহা অতি অল্প কালের মধ্যেই সে ব্যবধানের পর্দ্দা সরাইয়া সবিস্তারে চারিজনের মধ্যে ব্যাপ্ত সুনিবিড় হইয়া পড়িল।

নীলিমা কহিল,—আপনাকে আমি দিদি বলে ডাকবো।

যতীন্দ্রবাবুর স্ত্রী কহিলেন,—তাই বলো। কিন্তু আপনি বললে চলবে না। তুমি বলতে হবে। আমিও তুমি বলচি তো—তোমার নামটি কি, ভাই ?

নীলিমা নিজের নাম বলিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনার ? বলিয়াই জিভ কাটিল, জিভ কাটিয়া সলজ্জভাবে হাসিয়া কহিল—তোমার নাম কি ভাই দিদি ?

তিনি কহিলেন—পঙ্কজিনী দেবী।

নীলিমা কহিল—আমার এক মাসতুতো বোন আছেন, তাঁর নামও পঙ্কজিনী—তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, দিদি হন!

পঙ্কজিনী দেবী হাসিয়া কহিলেন,—ভালোই হলো। আমার নাম-সম্বন্ধে তোমার আর কখনো ভুল হবে না!

নীলিমা কহিল,—আপনাকে...না, না, তোমাকে দেখে আর একজন দিদির কথা মনে পড়চে...আমার সুধাদি...তোমার মত এমনি চমৎকার গড়ন তাঁর, আর রংও এমনি চাঁপা ফুলের মত!...

সলজ্জভাবে পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—আমায় আর ফরশা বলো না, ভাই, তোমার ঐ মুখে!

নীলিমা কহিল,—কি বলবে, তবে? এ রংটাকে শাস্তরে আর কি বলে, দিদি?

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—তোমার পাশে আমি ফরশা নই গো! বুঝলে!

নীলিমা কহিল,—আচ্ছা, আচ্ছা!

যতীন্দ্রবাবু ও-দিকে ব্রজনাথকে কহিলেন,—বেশাতি করচেন খুব? শাল, শাড়ী,—এই সব?

ব্রজনাথ কহিল—বোটে আসচে বটে ঢের লোক। একজনকে দু'খানা শাড়ীর ফরমাশ দিছি...

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—দাম দেবার সময় আমায় দেখাবেন একবার, নাহলে বিদেশী আপনি,...ঠকতে হবে।

আরও খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর যতীন্দ্রবাবু কহিলেন—তাহলে আমার গরীবখানায় এবার চলুন, দয়া করে...

পঙ্কজিনী দেবীও নীলিমাকে কহিলেন—হ্যাঁ, ওঠো, চলো ভাই...

না গিয়া উপায় ছিল না—যাইতেই হইল। চৌমাথার কাছে একটা গলি ডাহিনে গিয়াছে—গলির মুখে বাঁহাতি বাড়ীখানি। বাড়ীটি দোতলা, পরিচ্ছন্ন। ফটকে ঢুকিতেই দুই প্রকাণ্ড কুকুর চীৎকার করিয়া লাফাইয়া আসিল। নীলিমা এজন্য প্রস্তুত ছিল না, সে চমকিয়া পঙ্কজিনী দেবীর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, এবং সজোরে তাঁর অঞ্চলের প্রান্ত হাতে চাপিয়া ধরিল। যতীন্দ্রবাবু ভৎর্সনার সুরে কুকুরদুটিকে ডাকিলেন—জলি, পপি...যাও...দোস্ত্...

কালো রঙের কুকুর দুটা এ ভৎর্সনায় প্রভুর পায়ের কাছে কুণ্ঠিত হইয়া বসিয়া পড়িল। ব্রজনাথ কহিল—বাস্ রে, কুকুর নয় তো, যেন বাঘ!

যতীন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন,—আমাদের দরোয়ানের কাজ করে। কলকাতা থেকে আমাদের এক বন্ধু এসেছিলেন—মস্ত লেখক—নাম করলে বোধ হয় চিনতেও পারবেন,—নানা কাগজে তিনি লেখেন যে! তা তাঁর স্ত্রী তামাসা করে বলতেন, এ দুটি আপনার পুষ্মিপুত্তুর, দাদু...

পঙ্কজিনী দেবী হাসিয়া নীলিমার পানে চাহিলেন, কহিলেন,—তাঁদের কথা বলবো ভাই তোমায়। এমন ভাবও হয়েছিল! লেখকের বৌটি আমায় এমন ভালোবাসতো—বাসতো বলি কেন, বাসে। ছেলেমানুষ! চিঠি দিতে যদি একটু দেরী করি তো কেঁদে খুন! যাবার সময় কি কান্নাই কেঁদে গেছে! কলকাতায় গেলে তাদের বাড়ী গিয়ে থাকতে হবে,...বলে গেছে। আর ফী-চিঠিতে তাগিদ আস্চে, কবে আমরা কলকাতায় যাবো। তা যাবো...আমার একটি দ্যাওর আছে, লাহোরে

পড়চে, দেবু...তার বিয়ে দিতে যেতেই হবে কি না...পঙ্কজিনী দেবী মনের আবেগে পুরানো কাহিনী আবৃত্তি করিয়া চলিলেন।

যতীন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন,—এই শীতে ফটকের সামনে বাইরে দাঁড়িয়ে এ-সব পরিচয় না দিয়ে উপরের ঘরে গিয়েই সব বলো...বলিয়া সরল প্রাণ-খোলা উচ্চহাস্য করিলেন।

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—এসো ভাই, উপরে এসো...

সকলে উপরে উঠিলেন। সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিতে ডান দিকে বারান্দা। এই বারান্দা দিয়া অন্দরের ঘরে যাওয়া যায়; আর সিঁড়ির ঠিক সামনেই বসিবার ঘর।

ঘরখানি খুব বড় নয়—ঘরের সাজ-সজ্জায় সরল ভাব, ধনের আড়ম্বর নাই, তবে রুচির পারিপাট্য আছে! মেঝেয় কাশ্মীরী নামদা পাতা, নামদার গায়ে চকোলেট্-রঙের সুতায় বোনা বড় বড় চেনার-পাতা। চেয়ার ও কৌচগুলার গায়েও সবুজ ও নীল রঙের সুতায় আঙুর পাতা বোনা। বেশ সৌখীন আবরণ। যতীন্দ্র বাবু হাঁকিলেন,—লছমন্...

একজন ভৃত্য আসিল, হাতে গড়গড়া। যতীন্দ্রবাবু ব্রজনাথের পানে চাহিয়া কহিলেন,—তামাক...?

ব্রজনাথ কহিল,—আমি তামাক খাই না...

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—তাহলে আমায় যদি অনুমতি দেন...

হাসিয়া ব্রজনাথ কহিল,—স্বচ্ছন্দে।...

নীলিমাকে লইয়া পঙ্কজিনী দেবী অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। ব্রজনাথকে লইয়া যতীন্দ্রবাবু এই ঘরেই বসিলেন। জলি ও পপি অনুচরদ্বয় দ্বারের সামনে পা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। তারপর নানা বিষয়ে কথাবার্তা

চলিল। কাশ্মীরের প্রচণ্ড শীতের কথা উঠিল। ব্রজনাথ কহিল,—এখানকার মেয়ে-পুরুষদের দেখি, একটা সাজির মত কি জিনিষে আগুন পুরে সেটা বুকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়...সাজিগুলি বেশ দেখতে মোদ্দা...

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—ওগুলোকে কাংরী বলে। বেতের তৈরী, সেটা খোলস,—তারি মধ্যে ধুনুচির মত মাটীর পাত্রে আগুন রাখে। একজন ইংরাজ কবি বলেচেন,—What Laili was on the bosom of Majnu, so is a Kangri to a Kashmiri. ঐ লম্বা ঝোল্লার মধ্যে কাংরী রেখে ওরা হাত-পা-বুক গরম রাখে, নাহলে যে শীত, সহ্য করবে কি করে? বড় গরীব এই কাশ্মীরীরা...অত কম্বল কোথায় পাবে? বিছানায় শোবার সময়ও তাই কাংরী পাশে থাকে...

ব্রজনাথ শিহরিয়া উঠিল,—বলেন কি! ঘুমের ঘোরে হাত-পা নাড়তে বিছানায় আগুন পড়ে যদি আগুন ধরে যায়...?

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—তা সময়ে-সময়ে যায় তো...পুড়ে মরেও কি কম! তবু অভ্যাস অনেকটা দাঁড়িয়ে গেছে।...যতীন্দ্রবাবু গড়গড়ায় দুইটা টান দিয়া কহিলেন,—কাল কি প্রোগ্রাম ঠিক করেচেন? মানে, কাল কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন ?

ব্রজনাথ কহিল,—আমাদের প্রোগ্রাম আগে থেকে ঠিক থাকে না... হঠাৎ বসে থাকতে থাকতে যেমন খেয়াল হয়, অমনি কোথাও বেরিয়ে পড়ি।

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—কাল ছাতাবলে চলুন, শিকারায় চড়ে ঝিলামের উপর দিয়ে...খাশা হবে।

ব্রজনাথ কহিল,—ছাতাবল বস্তুটা কি ?

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—ঐ এ্যানিকাট...সেটা হলো সেভনথ্ ব্রিজের পাশে। মস্ত বাঁধ আছে একটা...ঝিলামের সব জল পাছে বারামুলার ওদিকে বয়ে চলে যায়,—বারামুলা শ্রীনগরের চেয়ে ঢের নীচু কি না, তাই ঝিলামের জল ঝিলামে ধরে রাখার জন্য অনেক টাকা খরচ করে এই বাঁধ বাঁধা হয়েচে...একটা দেখবার জিনিষ। তাছাড়া সমস্ত শ্রীনগর সহরটাই নদী থেকে দেখতে পাবেন—দু'দিকে বাড়ী-দোকান...দেখে খুশী হবেন।

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ তো...কখন্ যাবেন, বলুন...?

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—বেলা বারোটায়, অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ার পর। কি বলেন? ভালো একখানা শিকারা আমি ঠিক করে রাখবো'খন—আপনাদের বোটে আমরা গিয়ে আপনাদের সেখান থেকে তুলে নেবো...

ব্রজনাথ কহিল,—আচ্ছা...তার বুকে বেদনাও একটু বিঁধিল এই ভাবিয়া যে তাদের নিভৃত আলাপের মধ্যে বাহিরের এই যে কলরব ঢুকিতেছে...অথচ গায়ে পড়িয়া যতীন্দ্রবাবুর এমন বন্ধুর মত গ্রহণ করার ভাব...এটুকুও বেশ লাগিতেছিল।...সে ভাবিল, কাল ইঁহাদের সঙ্গেই ঘুরিয়া আসা যাক্, তারপর দুজনের নিভৃত জল-যাত্রা নয় আর একদিন হইবে!

চা আসিল—রূপার চা-দানি। তাহাতে বেশ কারুকার্য। ব্রজনাথ কহিল,—এখানকার কাজ, বুঝি?

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—হ্যাঁ।

ব্রজনাথ কহিল,—বাঃ, খাশা কাজ তো...

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—তাহলে আর একটা জিনিষ দেখাই...বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন, এবং নিমেষ-পরেই রূপার একটা ছোট পাত্র লইয়া

ফিরিলেন। পাত্রটার গড়ন আঙুর পাতার মত! যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—সোনার পাতা—পাণ-শুপারি দিতে বেশ, নয় কি?

মুগ্ধভাবে ব্রজনাথ কহিল,—খাশা! আমায় এমনি গোটা চার-পাঁচ করিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—বেশ তা, করিয়ে দেবো। বেশী দামও পড়বে না। তা এখন চা পান করুন—জুড়িয়ে যাচ্ছে যে...

ব্রজনাথ চায়ের পেয়ালা মুখে ধরিল,—এক শিপ্ পান করিয়া কহিল,—এ যে আমাদেরি চা...কাশ্মীরী চায়ের স্বাদও এমনি না কি?

হো-হো করিয়া হাসিতে হাসিতে যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—কাশ্মীরী চা...সে খেতে পারবেন না। ওরা ভারী কড়া চা খায়...চাটা এরা সবাই খায় কি না, সারাক্ষণ...

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—এখান থেকে কতকগুলো জিনিষ নিয়ে যাবেন,—কাঠের উপর নানা কারিগরীর কাজ হয়...তা যদি পছন্দ হয়!...আসবাব-পাত্রের কথা আমি তত বলচি না...তবে, এখানকার তৈরী টেবল-ক্লথ, বিছানার চাদর, রূপার চা-সেট্, তাছাড়া জাফরাণ, খাঁটী পদ্মমধু...

ব্রজনাথ কহিল,—জাফরাণ আবার বয়ে নিয়ে যেতে হবে নাকি! আমাদের দেশেও তো পাওয়া যায়। আর সারা জীবনে মানুষের কতটুকু জাফরাণেরই বা দরকার হয়!...

যতীন্দ্রবাবু হাসিলেন, সেই উচ্চ হাসি! হাসিয়া তিনি কহিলেন,—আমাদের দেশে যাকে জাফরাণ বলে কেনেন, সে কি জাফরাণ, মশাই! সে সব নকল, রং-করা চামড়ার গুঁড়ো মিশেল,—তার সবটাই ভ্যাজাল! আসল জাফরাণ...এক তিলে যে গন্ধ, আর রঙের কি বাহার...ওঃ

যা দেখবেন, সে আর.. বলবার নয়। একদিন সোপুরে চলুন—সেইখানে মহারাজের ক্ষেতে জাফরাণের চাষ হয়...ছোট ছোট গাছগুলি...আর ভায়োলেট রঙের ফুল, কি বাহার, আর সে ফুলে তেমনি চমৎকার খোশবু!

এমনি নানা বিষয়ে কথা চলিতেছিল—রাত্রি যে ওদিকে নটা বাজিয়া গেছে, সেদিকে কাহারো হুঁশ নাই! সহসা অন্দরের দিক হইতে সাড়া আসিল,—বোটে ফিরতে হবে না?

ব্রজনাথ ও যতীন্দ্রবাবুর হুঁশ হইল। দু'জনে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, দ্বারপ্রান্তে নীলিমা ও পঙ্কজিনী দেবী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঘড়ির দিকে চাহিয়া ব্রজনাথ কহিল,—ইস, নটা বেজে গেছে যে... তাইতো, আজ তাহলে ওঠা যাক...ব্রজনাথ উঠিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রবাবুও।

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

ব্রজনাথ কহিল,—এই শীতে...?

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—এ শীত আমাদের ঢের সহা আছে। এ কি শীত দেখচেন! আর দু'মাস পরে যখন বরফ পড়বে...পথ-ঘাট সব বরফে ঢেকে যাবে! গাছের ডালে-পাতায় চাঁই-চাঁই বরফ জমে থাকে। ডল্ লেকের মাঝে মাঝে বরফে ঢেকে যায়!...সে যা চমৎকার দেখতে হয়!...

দ্বার-প্রান্তে আসিয়া নীলিমা ব্রজনাথকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—দেখচো, দিদি আমায় কি দিয়েচেন...

ব্রজনাথ সস্মিত মুখে প্রশ্ন করিল,—কি?

নীলিমা একটা ঝাড়নে-বাঁধা পুঁটলি দেখাইয়া কহিল,—আখরোট... কাগজী আখরোট...সত্যি, এমন নরম, একটু আঙুল দিয়ে টিপে ধরলেই

খোসা ভেঙ্গে যায়...আর তুমি সেদিন বোটে বসে কি ছাই আখরোট-গুলোই কিনলে !...

ব্রজনাথ কহিল,—তারা বিদেশী পেয়ে ঠকিয়ে গেছে।...তারপর এক-পা চলিয়া ব্রজনাথ কহিল,—কাল এক জায়গায় সকলে বেড়াতে যাচ্ছি, জানো ?...

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন—কোথায় ?

যতীন্দ্রবাবু জবাব দিলেন ; কহিলেন—ছাতাবলে !

—ও ! বলিয়া পঙ্কজিনী দেবী নীলিমার পানে চাহিলেন, কহিলেন—ঝিলামের সাতটা পুল আছে, না...এ হলো সেই সব-শেষের অর্থাৎ সপ্তম পুলের কাছে। বেশ জায়গা, ভাই...

নীলিমা কহিল—তুমিও যাবে তো দিদি ?

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—হ্যাঁ, চার জনেই যাওয়া যাবে...বেলা বারোটায়। ব্রজনাথবাবুকে বলেচি, আমরা দুজনে এখান থেকে শিকারা নিয়ে আপনাদের বোটে যাবো, বেলা ঠিক বারোটায়—আপনারা খেয়ে-দেয়ে তৈরী থাকবেন...গরম কাপড়-চোপড় কখনো তাচ্ছিল্য করবেন না—ফিরতে সন্ধ্যা হতে পারে। তাছাড়া বিনা-নুটীশে হঠাৎ এখানে এমন ঠাণ্ডা পড়ে যায়, মেঘ করে একটু ঝড়ও ওঠে সেই সঙ্গে...তার জন্য গরম কাপড়-চোপড় নিয়ে সর্ব্বক্ষণ তৈরী থাকতে হয়—ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্য...নাহলে নিউমোনিয়া হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় !

৬

এমনি করিয়া জীবনে নূতন প্রবাহ আসিল। দুজনের নিভৃত আলাপের মধ্যে এই প্রবাসী দম্পতীর আলাপের সুর আসিয়া এমন স্বচ্ছন্দে মিশিয়া গেল, যে ব্রজনাথ বুঝিতেও পারিল না, তাদের দু'জনের বেড়ার গণ্ডী-ঘেরা জীবনটুকুর সে বেড়া কবেই বা খসিয়া গেছে, আর সেই খোলা বেড়ার ফাঁক দিয়া সম্পূর্ণ অজানা এ দুটী তরুণ পান্থ একেবারে তাদের প্রাণের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে! শুধু দাঁড়াইয়া পড়া নয়, তাদের একান্তের খেলার সাথী ও সহচর হইয়া পড়িয়াছে! বেশ আছেন এঁরা—বাহিরের কোনো কোলাহল এঁদের জীবনের সুরকে আঘাত করে না! সরল আনন্দ-প্রবাহে দুখানি জীবন-তরী ভাসিয়া চলিয়াছে—কেমন নিশ্চিন্ত আরামে!

সেদিন চারজনে মিলিয়া হরি-পর্ব্বতে গিয়াছিলেন...টঙ্গায় চড়িয়া। সরু পথ, মোটরে যাওয়ার সুবিধা হইবে না, তাই টঙ্গার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। পাহাড়ে ওঠার পথটুকু বেশ নিরাপদ ছিল না,—একটু দুর্গম!...নীচে বহুদূর বিস্তৃত জমিতে অসংখ্য কবর, যেন মৃত্যু-লোকের নীরব স্তব্ধতা চারিধারে! একধারে পাহাড়ের পায়ের কাছে, এক ডালিম-ঝোপের পাশে ছোট একটি জীর্ণ মন্দির ছিল। মন্দিরে শিবলিঙ্গ।

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—আপনারা নয় এগিয়ে যান...আমরা দু' বোনে এই মন্দির দেখতে যাবো।

ব্রজনাথ কহিল,—কেন, আমাদের হঠাৎ এত বড় পাপী ঠাওরালেন কি বলে যে, ও মন্দিরে আমাদের প্রবেশ নিষেধ করে দিচ্ছেন ?

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন—প্রবেশ নিষেধ নয়। তবে এ মন্দিরে এমন কিছু নেই, যা আপনাদের ভালো লাগতে পারে। তাছাড়া এ-মন্দিরটি শুধু মেয়েদের জন্যই !

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ, আমরা দু' ভাইয়ে তাহলে দূরে ঐ শিলাখণ্ডের উপর বসিগে...

পঙ্কজিনী দেবী হাসিয়া কহিলেন—তাই বসুন গে...তারপর তিনি নীলিমার পানে চাহিয়া কহিলেন,—এসো ভাই নীলিমা, মন্দির দেখি গে...

নীলিমাকে লইয়া পঙ্কজিনী দেবী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শিবলিঙ্গ—বিশাল দেহ। অঙ্গ মসৃণ, নিকষ কালো। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নীলিমা কহিল,—কেউ নেই যে দিদি, এখানে. .?

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—না ভাই. এ এক রাণীর মন্দির। হাজার বছর আগে এ মন্দির তৈরী হয়েছিল।...মন্দিরের গল্পটি ভারী দুঃখের, ভাই...

নীলিমা কহিল,—মন্দিরের আবার গল্প কি, ভাই ?

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—এই পাথরটায় বসি একটু ভাই,—হাঁপিয়ে পড়েচি যেন ! বসে গল্প বলচি,—

উভয়ে একটা বড় পাথরের উপর বসিলেন ; বসিয়া পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন—রাণীর নাম ছিল অম্বা। কাশ্মীরে এক গরিবের ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর রূপ ছিল অসাধারণ ! লোকে বলতো. রূপ নয় তো,

যেন বিজলীর চমক! কাশ্মীরের যিনি রাজা...সেই রাজার দেড় হাজার রাণী ছিল...

নীলিমা শিহরিয়া কহিল,—দেড় হাজার রাণী!...

পঙ্কজিনী দেবী কহিল,—হ্যাঁ ভাই, দেড় হাজার রাণী! একে পুরুষ, তায় মস্ত বড় রাজ্যের স্বাধীন রাজা—সুন্দর মেয়ে দেখেচেন, আর নির্ব্বিবাদে তাকে নিয়ে গিয়ে রাণী করেচেন! বাধা দেবে কে, বল?...

নীলিমা একটা নিশ্বাস ফেলিল। পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন—এই অম্বা ডাগর হলো—তার রূপের জলুস্ আরো হাজারগুণ বেশী হয়ে ফুটলো। রাজার কাণে সে খপর গেল...রাজা একদিন এলেন, এসে অম্বাকে দেখলেন। যেমন দেখা, অমনি নেবার সাধ! অম্বার মা-বাপ কাঁদতে লাগলো। রাণী হওয়া সুখের কথাই নয় তো...রাজার চোখের নেশা...আজ যে রাণী, কাল সে পথের ভিখারিণী! কিন্তু গরীবের চোখের জলে কোনো রাজা কখনো টলেন না! অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রহরীরা দাঁড়ালো—রাজার হুকুমে বাহকের দল অম্বাকে তাঞ্জামে তুলে নিয়ে প্রাসাদে চললো। মহাধূম-ধামে রাজা সেখানে অম্বাকে বিবাহ করলেন... এত আনন্দ যে প্রজাদের এক বছরের খাজনা মাপ হয়ে গেল। নতুন রাণীর জয়-জয়কার পড়ে গেল, রাজ্যময়।...তার পরে এক বছর পরম সুখে কাটলো...রাণী চলতে গেলে পাছে মাটী পায়ে বাজে, রাজা সেখানে বুক পেতে দেন...রাণীর চোখ যদি ছলছলিয়ে আসে তো রাজা রাজ্যময় ঘোষণা করে দেন, সকলে মন্দিরে পূজা দাও, রাণীর মন প্রসন্ন হোক! এমনি রাজার ভালোবাসার বহর!...

নীলিমা রুদ্ধ নিশ্বাসে গল্প শুনিতেছিল। সে কহিল,—তারপর?

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—এক বছর পরে রাজা খপর পেলেন, ফৌজদারের ঘরে এক মেয়ে আছে, রূপে অপ্সরী! লোক তাকে আনতে ছুটলো!...অপ্সরী এলো। অপ্সরী পাটরাণী হলো। অম্বার পানে রাজা ফিরেও আর চাইলেন না। মনের দুঃখে অম্বা আত্মহত্যা করবেন বলে বিতস্তার জলে ঝাঁপ দিতে এলেন। সেখানে এক সাধুর সঙ্গে দেখা ...সাধু বললেন—মরবি কেন, মা! দেবপূজায় জীবন সঁপে দে। রাণী তাঁর কথায় ঐহিকের সব চিন্তা ছেড়ে তখন নিজের হীরা-জহরত বেচে সেই টাকায় এই মন্দির তৈরী করালেন। এই মন্দিরের কাজেই তিনি জীবন সঁপে দিলেন। এই মন্দিরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ লিঙ্গের নাম দীননাথ। দীন-দুঃখীরা এঁর পূজা করলে মনের দুঃখ দূর হবে—এই হলো এই দেবতার মাহাত্ম্যের কথা!

নীলিমা কাঠ হইয়া ভাবিতে বসিল,—রাণী অম্বার কথা! নারীর মর্ম্মদাহ, পুরুষের কঠিন রূঢ় অহঙ্কার—জগতের সর্ব্বত্র এই একই কাহিনী! লাঞ্ছিত নারীত্বের বেদনা কি সারা পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে! কোথাও এর বিরাম নাই? অসুরের বিক্রমে পুরুষ শুধু নারীত্বকে লুণ্ঠন করিতেছে, ব্যথায় জর্জ্জর করিয়া নির্ম্মম খেলা খেলিয়া আসিতেছে...হায়রে হতভাগিনী নারী!...

তার অসহ্য বোধ হইল। সে নিজে এ জীবনে কি-বা পাইয়াছে! সোহাগ, চুম্বন, আর আলিঙ্গন!...কিন্তু এ লইয়া তো চারিদিক দিয়া একটা জীবন সার্থক হইতে পারে না, কখনো...

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন—ওঠো ভাই, ওঁরা আবার তাগাদা দেবেন। পাহাড়ের অনেকটা এখনো উঠতে হবে কি না!...

যন্ত্র-চালিতের মত সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পঙ্কজিনী দেবীর নির্দ্দেশ-মত পাহাড়-পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।...পা আর চলিতে চায় না—তবু উপায়ও যখন নাই...জীবনের উপর তার ধিক্কার জন্মিয়া গিয়াছিল... এই নারী-জন্ম...তার উপর বিধাতার কি অভিশাপই না বর্ষিত হইয়া আসিতেছে, চিরকাল!.........

ফিরিবার পথে হঠাৎ একটা গড়ানে পাথরে অসতর্ক পা দিবামাত্র ব্রজনাথ গড়াইয়া খানিকটা নীচে পড়িয়া গেল। সকলে হায়-হায় করিয়া নামিয়া আসিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ! ব্রজনাথের বাঁ পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! তার চলিবার শক্তি নাই—তাছাড়া যাতনায় সে মূর্চ্ছিত! নীলিমার বুকটা যেন সশব্দে ফাটিয়া গেল! পৃথিবীর সব আলো চোখের সামনে নিবিয়া গেল! এ কি বিপদ আনিয়া দিলে, ভগবান! মনের কোন্ গোপন দুঃখে নিজের জীবনকে সে বিকৃত করিয়াছিল,—পুরুষকে নিষ্ঠুর বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিল...সে পাপে এত বড় শাস্তি, ঠাকুর...! তার চোখের জলে চারিধার অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মাথার মধ্যে রক্তটা সোঁ-সোঁ করিতেছিল। পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—মন খারাপ করো না, ভাই,—এ থেকে কি সর্ব্বনাশ না হতে পারতো! তা যখন হয়নি... মা-কালীকে ডাকো!...তাঁরো সর্ব্বাঙ্গ বিষম ভয়ে থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল!

যতীন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি পাহাড় বহিয়া নামিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন,—তোমরা কান্নাকাটি করো না...আমি এখনি লোক-জন নিয়ে আসচি! ভয় নেই।

পাহাড়ের বুকে একটু জলও নাই যে মুখে-চোখে দেয়! যত-শীঘ্র-

সম্ভব যতীন্দ্রবাবু ফিরিলেন, সঙ্গে লোকজন, এবং বড় পাত্রে নির্ম্মল জল। ব্রজনাথের মুখে-চোখে জল ছিটাইয়া দিতে সে চোখ মেলিয়া একবার চাহিল—কিন্তু বড় যাতনা! অতি-সাবধানে ব্রজনাথের দেহ বহিয়া গাড়ীতে কোন রকমে আনা হইল। তারপর অতি সতর্কভাবে টঙ্গা চালাইয়া ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাঁরা সোজা এক ডাক্তারের গৃহে গিয়া উঠিলেন। ডাক্তারটি কাশ্মীরী,—নাম শেঠ চুনিচাঁদ। ভাগ্যক্রমে চুনিচাঁদ গৃহেই ছিলেন। তাঁর পরিচর্য্যায় ব্রজনাথের চেতনা হইল। পায়ে কাঠ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তারপর তাঁরি মোটরে শোয়াইয়া ব্রজনাথকে আনিয়া যতীন্দ্রবাবুর গৃহে তোলা হইল। তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে।

যতীন্দ্রবাবু নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—এ অবস্থায় বোটে ফেলে রাখতে পারি না। আপনি একা...এখানে আমরা আছি, দেখবো...

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—কি ক্ষণে যে বাড়ী থেকে আজ বেরিয়ে ছিলুম...

নীলিমা আতঙ্কে কম্পিত বক্ষে কহিল—কি হবে দিদি?

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—আর কোনো ভয় নেই, বোন—তবে দু'দিন ভুগবেন—সে যাতনা-কষ্ট, এই যা—

নীলিমার চোখে জলের বিরাম নাই! এত জলও এ চোখে ছিল! ব্রজনাথের পায়ের কাছে মাথা গুঁজিয়া এক-মনে সে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল—কি করলে, ঠাকুর! আমার মনের কোন্ মিথ্যা বেদনার নিশ্বাসটা এত বড় করে দেখলে! এত ভালোবাসা, তবু এমন অভিমান আমার, এই ভেবেই এ শাস্তি দিলে...আমায় মাপ করো, ঠাকুর। এঁকে

ভালো করে দাও—বুক চিরে আমি রক্ত দেবো। আমার জীবনের সব সুখ, সব সাধ তোমার পায়ে বিসর্জ্জন দেবো—এ বিপদে রক্ষা করো, ঠাকুর...প্রাণটুকু ফিরিয়ে দাও, আরাম করে দাও, হে ঠাকুর...

যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—ভয়ের কারণ আপাততঃ কিছু নেই, ডাক্তার বললেন—তবে আমাদের খুব হুঁশিয়ার হয়ে সেবা করতে হবে...

পঙ্কজিনী দেবীরও চোখে জল। তিনি ব্রজনাথের মাথায় টাকা ছোঁয়াইয়া উদ্দেশ্যে কোন্ অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করিলেন। নীলিমা তখনো তেমনি অঝোর-ধারে কাঁদিতেছিল।

৭

যতীন্দ্রবাবু ও পঙ্কজিনী দেবীর সেবা-যত্নে কোথাও এতটুকু ত্রুটি নাই,—ভাই-বোনেও বুঝি এমন সেবা, এমন পরিচর্য্যা করিতে পারে না! তবু চিন্তার কি সীমা আছে! কোথায় নিজের দেশ-ভুঁই, আত্মীয়-স্বজন... আর কত দূরে, কত দুর্গম-দুস্তর পাহাড়ের পারে এই শ্রীনগর! নীলিমার বেদনার আর অন্ত ছিল না! মুখের কথায় ও স্নেহে সান্ত্বনা মিলিলেও প্রাণ যে তাহাতে এতটুকু তৃপ্তি মানিতে চায় না! ওই আকাশের গায়ে মাঝে মাঝে কালো মেঘের টুকরাগুলা যেমন চকিতে জমিয়া উঠিতেছে, তারো মনে সান্ত্বনার ফাঁকে ফাঁকে যে তেমনি দুশ্চিন্তার মেঘ আসিয়া জড়ো হইতেছে, প্রতিক্ষণে!...

সেদিন স্বামীর বুকে নীলিমা হাত বুলাইতেছিল, ব্রজনাথ সহসা তার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া রোগ-কাতর শীর্ণ স্বরে কহিল,—তোমার হাতে কি আছে নীল?

নীলিমা অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে কহিল,—কি আছে?

ব্রজনাথ কহিল,—তুমি নিজে জানো না...? আরাম, কি আরাম, কত আরাম যে পাই...আমার বুকের এ অস্থিরতা তোমার হাতের স্পর্শে কতখানি যে ঘুচে যায়...

নীলিমা কহিল,—কি কষ্ট হচ্ছে?

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রজনাথ কহিল,—কষ্ট কি একটা! বুকে, পায়ে, মাথায়, সর্ব্বাঙ্গে যাতনা...সে আর একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর কহিল,—কোথায় সুদূর পাহাড়ের উপর তোমায় এনে ফেলেচি...যদি আর না ফিরি...? একলাটি এখানে কি করবে তুমি, নীল...! তার চোখের কোণে দুফোঁটা জল আসিয়া জমিল।

এ-কথায় নীলিমার সমস্ত মনটাকে ভাঙ্গিয়া গলাইয়া রাজ্যের অশ্রু তার দুই চোখ দিয়া অঝোর ধারে ঝরিয়া পড়িল! ব্রজনাথ কহিল,—শুধুই কাঁদবে...? সান্ত্বনার এমন ভাষা দিতে পারো না, যাতে আমার মনে একটু বল পাই...?

নীলিমা এ দুশ্চিন্তার মাঝে কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না—ডাক্তার আসিতেছে, দেখিয়া যাইতেছে। যতীন্দ্রবাবু ও পঙ্কজিনী দেবী প্রাণ ভরিয়া সেবা-যত্ন করিতেছেন, তবু তার যে সহস্র দুশ্চিন্তা, যে উদ্বেগ আর আতঙ্ক...মুহুর্মুহু নব-নব দুশ্চিন্তা মনটাকে কি ভাবেই না বিঁধিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে...! যত মমতা, যত স্নেহই এঁদের থাক, তবু দুদিনের বন্ধু, পর তো,—তাঁদের গৃহে নানা অশান্তি বহিয়া আনিয়াছে, কি অস্বস্তি! তার উপর বার বার নিজের সহস্র দুশ্চিন্তার কথা তুলিয়া তাঁদের কত জ্বালাতন করিবে!...এমনিতেই তো লজ্জায় সে মরিয়া আছে,—তার উপর আবার...!

স্বামীর কথা শুনিয়া নীলিমা আরো অস্থির হইয়া উঠিল—অত-বড় দুর্ভাবনা যে-মনে জাগিয়া আছে, সে-মনের কোন্‌খান্‌ হইতে কি সান্ত্বনা সে তুলিবে! চোখের জল আরো বেগে ঝরিল। ব্রজনাথ বিরক্ত হইল, কহিল,—তুমি যাও, আমার গায়ে হাত বুলোতে হবে না! কেবলি কান্না

আর কান্না! দুটো সুখের কথা বলতে পারো না? নিজের দুঃখে তো জ্বলছিই, তার উপর অষ্টপ্রহর তোমার এই কান্না...!

অশ্রুর বেগ সবলে রোধ করিয়া ভারী গলায় নীলিমা কহিল,—কি কথা বলবো, বল...কি কথা তোমার ভালো লাগবে? কি কথায় আরাম পাবে তুমি,...তাই বলচি। আমি তো কাঁদিনি...

ব্রজনাথ কহিল,—না, কাঁদোনি! অমন ভারী গলা...চোখ তুলে চাও তো দেখি, আমার পানে...

নীলিমা চাহিল, চাহিবা-মাত্র দু' চোখে কোথা হইতে কি জলটা যে তখনি আসিয়া জমিল! ব্রজনাথ কহিল,—ও কি হচ্ছে, কাঁদচো আবার!

নীলিমা কাঁদিল, খুব কাঁদিল, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—কান্না পাচ্ছে যে! আমি চেষ্টা করেও এ কান্নাকে থামাতে পাচ্ছি না...

ব্রজনাথ একটু ঝাঁজালো স্বরেই কহিল,—থামিয়ে দরকার নেই... কাঁদো, অজস্র ধারে কাঁদো...যদি মারা যাই, আগে থেকেই কান্নার রিহার্শালটা দিয়ে রাখো...

মনের এ বেদনার উপর স্বামীর এই রূঢ় ভৎর্সনা...নীলিমা কাঁদিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময় পেয়ালায় কি একটা পথ্য লইয়া পঙ্কজিনী দেবী সে-ঘরে প্রবেশ করিলেন, ডাকিলেন,—দাদু...

পরস্পরের মধ্যে কি বলিয়া সম্বোধন চলিবে, পরামর্শ করিয়া তাহাও স্থির হইয়া গিয়াছিল—যতীন্দ্রবাবুকে ব্রজনাথ ও নীলিমা দাদু বলিয়া ডাকে, এবং পঙ্কজিনী দেবী ও যতীন্দ্রবাবু ব্রজনাথকে দাদু বলে,—যতীন্দ্রবাবু নীলিমাকে ডাকেন, দিদি,—পঙ্কজিনী দেবীকে ব্রজনাথ ও নীলিমা দিদি বলিয়া ডাকে,—এইটেই বহু পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল। নাম

ধরিয়া বাবু বলিয়া ডাকার মধ্যে প্রাণের নাগাল থাকে না। তাছাড়া পঙ্কজিনী দেবী হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—এ আমাদের সেই লেখক-বন্ধু শিখিয়ে দিয়ে গেছেন...আর আমার সেই পাগলী বোন,...খাঁদু, লেখক-মশায়ের স্ত্রীটি।

পঙ্কজিনী দেবীর আহ্বানে ব্রজনাথ কহিল,—কি এনেচেন দিদি?

পঙ্কজিনী কহিলেন,—ওভালটিন্...

ব্রজনাথ কহিল,—না, থাক্...

পঙ্কজিনী কহিলেন,—ছি, ভাই দাদু, অমন করে না! খেতে হবেই তো...না খেলে শরীরে বল পাবেন কেন! ডাক্তারের হুকুম—দেড় ঘণ্টা অন্তর একটু একটু করে খাওয়া,...শুপ্, বেদানার রস, ওভালটিন, এই-সব!

ব্রজনাথ কহিল,—ভালোও লাগে দিদি! নড়ন-চড়ন-রহিত হয়ে মাংসপিণ্ডের মত আপনাদের দয়ার প্রত্যাশী হয়ে পড়ে আছি...এ অবস্থায় মুখে কিছু রোচে? না, মুখে কিছু দেবার প্রবৃত্তিও কখনো হয়? আপনাদের কি জ্বালাতনই না কর্চি!.. ভুগুন, যেমন ঘাড়ে নিয়েচেন!

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—বেশ তো, ভুগতে যখন কাতর নই, তখন আর জ্বালাতন না করে, না ভুগিয়ে এটুকু বিনা-আপত্তিতে খেয়ে ফেলুন দিকি, নাহলে ভোগান্তির যে সীমা থাকবে না...এসো তো, নীলিমা,...মুখে এটুকু ঢেলে দাও।...এ কি ভাই, কাঁদচো পড়ে পড়ে? ছি, কাঁদে কি! ওতে যে অকল্যাণ হয়...কথাটা বলিয়া তিনি নীলিমাকে ভূমি-শয্যা হইতে উঠাইলেন।

ব্রজনাথ কহিল,—আহা ছেড়ে দিন ওঁকে, দিদি...উনি কান্নাটা মকশো করে রাখচেন...

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—কান্নার মকশো আবার কি?

ব্রজনাথ কহিল,—অর্থাৎ উনি স্থির সিদ্ধান্ত করে রেখেচেন যে, আমি আর বাঁচবো না, সুতরাং ওঁর বৈধব্য আসন্নপ্রায়, কান্নাটা তাই...

পঙ্কজিনী দেবী বাধা দিয়া সরোষ ভঙ্গীতে কহিলেন,—ছি, ছি! ষাট, ষাট...এ-সব ভারী ভালো কথা বলতে শিখেচেন, না? ভারী পৌরুষ হয় এ-সব কথা বলে! বেচারী একা, বিদেশে এ বিপদে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে... তার উপর এ কি কথা? পুরুষ মানুষের সবই আলাদা! আমাদের জীবন নিয়ে আপনারা নকড়া-ছকড়া করবেনই তো.. এক স্ত্রী গেলে আবার স্ত্রী হবে,...কোনো ভাবনা যখন নেই... না?...ছি! ওঠো তো বোন্—দাদুকে এটুকু খাইয়ে দাও...আপনি খান, বলচি, দাদু...নইলে আপনার দাদু এলে তাঁকে বলে দেবো। তিনি গেছেন, মহারাজার অর্চ্চার্ড আছে না? সেখান থেকে ভালো আঙুর আনবার জন্য...এখানে আঙুরটা একটু টক্ হয় সাধারণতঃ। ভালো মিষ্টি আঙুর পেতে হলে ঐ মহারাজার খাশ্ বাগান থেকে তা সংগ্রহ করতে হয়...কিনতে পাওয়া যায়।

নীলিমা ব্রজনাথের মুখে পেয়ালা ধরিল,—ব্রজনাথ ওভালটিনটুকু পান করিল। তারপর পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—তুমি বসে কথা কও। কেঁদো না, খবর্দ্দার! আমি দাদুর পায়ের পুলটিশটার ব্যবস্থা করচি... বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

নীলিমার নিজের উপর ধিক্কার ধরিতেছিল—এত বড় বিপদে স্বামীর

সেবার যা-কিছু, এঁরাই তা স্বহস্তে করিতেছেন, সে শুধু সাজানো পুতুলটির মত বসিয়া আছে...সাধে কি স্বামী রাগ করিতেছেন? শুধু কান্না দেখিয়া বিরক্ত হইতেছেন? কিন্তু এ কান্না কি সে সাধ করিয়া কাঁদিতেছে? সে যে হাজার চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে এ-চোখে অশ্রু না আসে, তবু,...হায়রে, তার যে কি দুঃখ, তা কে-বা বুঝিবে!

ব্রজনাথ ডাকিল—নীল...

নীলিমা কহিল,—কেন? কি বলচো?

ব্রজনাথ কহিল,—কেবলি মনে হচ্ছে, যদি দেশে আর না ফিরি...

আবার ঐ সব কথা! নীলিমার চোখে আবার জল ঝরিল। কি এ জ্বালা! পোড়া চোখের জলও...ব্রজনাথ কহিল,—আমার অপরাধ হয়েচে, আমায় ক্ষমা করো...আমি এই চুপ করলুম। আর কথা কবো না। আমি কথা কইলেই তো তোমার যত কান্না...

তাই কি!...নীলিমা হতাশ নিরুপায় দৃষ্টিতে দুই ডাগর চোখের দৃষ্টি মেলিয়া ব্রজনাথের পানে চাহিল, কহিল,—ও-সব কথা ছাড়া তোমার কি আর কোনো কথা নেই গো!...ব্রজনাথ কহিল,—আমার এ-সব কথার জবাবে তুমি আমায় ভৎর্সনা কর, রূঢ় ভৎর্সনা কর,...আনন্দের দমকা হাওয়ায়, আদরের ঘটায় এ-সব চিন্তা আমার বন্ধ করে দাও...তবে তো আমার আরাম হবে! তা না, কোনো কথা বললে অমনি তোমার চোখে জল! একটানা বর্ষা কোনো কবিরও যে ভালো লাগে না!...

তাই বটে! নীলিমা ভাবিল,—এ কি বিপদে যে সে পড়িয়াছে...তার এই রূপ, এই শ্রী—ইহারাই তো যত নষ্টের মূল! এদের জন্যই তো স্বামীর কাছে আর পাঁচ-জনের মত সে স্ত্রী হইয়া কোনো দিন দাঁড়াইতে

পারে নাই! প্রেয়সী, রূপসী প্রেয়সী সে...এমন রূপের মুখে আগুন জ্বালিয়া দিতে হয়! এর চেয়ে কুৎসিত কুরূপ বাঁদী হইয়া দিন কাটানোও ঢের আরামের!...

এমনি মনের দ্বন্দ্বে একদিন সে পাগলের মত বসিয়া নীরজাকে চিঠি লিখিল,—দিদি, এঁর এখানে ভারী অসুখ। কি করিয়া দেশে লইয়া যাই ...তুমি উপায় করিয়া দাও দিদি, নয় নিজে আসিয়া লইয়া চলো। ডাক্তার বলিতেছেন, পা কাটিতে হইতে পারে। আমি একলা—ভয়ে-ভাবনায় আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া রহিয়াছে। তোমার স্বামী, দিদি, তুমি তাঁকে আরাম করিয়া দাও, তাঁকে বাঁচাও—আমি দু'দণ্ডের ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি বৈ তো না! তোমার সংসারের বাহিরে পড়িয়া থাকিব, দিদি। তুমি শুধু আসিয়া এঁর ভার লও। আমিও নিশ্চিন্ত হই। আমার উপর মান-অভিমান রাখিয়ো না, দিদি—আমি তোমার ছোট বোন...তুমি বড়, চিরদিন তোমার আদেশ মাথায় পাতিয়া থাকিতে চাই।

চিঠিটা মনের এমনি নিরুপায় কাতরতার মধ্য দিয়া ডাকে চলিয়া গেল।...

পরের দিন ডাক্তার আসিয়া যতীন্দ্রবাবুকে কহিলেন,—একবার এক্স-রে করিয়া দেখা দরকার—পায়ের মধ্যে হাড়ের কুঁচিগুলা...যতীন্দ্রবাবু কহিলেন,—দেখুন, এঁরা কলকাতার লোক—টাকার অভাব নাই... কাটাকুটি কিছু করতে হলে কলকাতা ছেড়ে এ-বিদেশে করা কি ঠিক হবে! অনেকখানি ভাবনার কথা। সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে একটা পরামর্শ করে দেখলে হয় না...? এমনি কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল...

হঠাৎ প্রায় হপ্তাখানেক পরে একদিন বেলা প্রায় দেড়টার সময় যতীন্দ্রবাবুর গৃহের দ্বারে এক মোটর আসিয়া হাজির। দ্বারের সামনে একটা কলরব...এবং সংবাদ আসিল, নীলিমার ভগ্নী নীরজা আসিয়াছেন, কলিকাতা হইতে। তাঁর সঙ্গে আসিয়াছেন একটি বাঙালী ভদ্রলোক; তাঁর নাম নলিনাক্ষ বাবু। পঙ্কজিনী দেবী তাড়াতাড়ি নীরজা দিদিকে আনিবার জন্য নীচে ছুটিলেন।

বিছানায় শুইয়া এ কথা শুনিয়া ব্রজনাথ সঝঙ্কারে বলিয়া উঠিল,—এখানকার এ খপর সেখানে দিলে কে? এবং তা দিলেও নীরজা আসে কি বলে? কার কথায়? কার অনুমতিতে?...নীলিমা ম্লান মুখে মৃদু স্বরে কহিল—মন আমার খুবই খারাপ—মনের অবস্থা কখন কেমন থাকে! কোন্ সময়ে মন খুব খারাপ হয়েছিল, মনের খেয়ালে তাঁকে আসতে লিখে ছিলুম...তোমাকে বলা হয়নি...আমার দোষ হয়েচে...

ব্রজনাথ কহিল,—বেশ করেচো...এখানে এঁদের উপর যে জুলুম চলচে...তাছাড়া এঁরা বোটে গিয়ে নখন থাকতেও দেবেন না, জানো,—তখন দুম্ করে এদের আনালে কি বলে...? একটু আক্কেলও হলো না?

নীলিমার চোখের জল শুকাইয়া গেল। এত বড় অপরাধ সে করিয়াছে, যার জন্য স্বামী এমন রূঢ়ভাবে...এ বাড়ীতে জুলুম খুবই চলিতেছে, সে তা বোঝেও...কিন্তু তুমি কি বুঝিবে, একা, অসহায়া নারী আমি, কতখানি দুশ্চিন্তার আগুন আমার বুকে প্রতিনিয়ত জ্বলিয়া বুকটাকে কি-ভাবে পুড়াইয়া ছাই করিতেছে...!

ব্রজনাথ কহিল,—আমি কালই কলকাতায় ফিরতে চাই...তুমি তার

ব্যবস্থা করো...না, তোমাকে কিছু করতে হবে না...নলিনকে ডাকাও, আমি তাকেই বলচি...

—তাই ডেকে দিচ্ছি। বলিয়া নীলিমা প্রস্থানোদ্যত হইলে ব্রজনাথ কহিল,—কোথায় যাচ্ছো ?

নীলিমা কহিল,—দাদাকে ডেকে দি...

ব্রজনাথ কহিল,—তাই দাও...আমার কাছে বসতে তোমার আজকাল বিরক্তি ধরে! শয্যাগত রোগী...বিপন্ন...কথায় বলে না, সিংহ খানায় পড়লে কেউ তার পানে ফিরে তাকায় না...? পর ঢের ভালো, দেখচি!...নীলিমা ম্লান চোখে ব্রজনাথের পানে চাহিল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—হায়রে, তার মন বুঝিয়া এইবারেই এই ঠিক কথা বলিয়াছ, বটে!...

নীরজা নীলিমাকে কহিল,—তোর চিঠি পেয়ে এমন ভয় হলো—ছেলেমানুষ তুই—বিদেশ-বিভুঁয়ে এত-বড় বিপদে...তা এ্যাদ্দিন কোনো কথা লিখতে নেই...!

নীলিমা কহিল,—এঁরা যা করচেন, মার পেটের ভাই-বোনও তা করে না। তাবলে কত দিন জ্বালাতন করবো...? তাছাড়া দেশে ডাক্তারও অনেক আছেন...মনও বড্ড অস্থির হচ্ছিল...

নীরজা কহিল,—দাদাকে তাই বলছিলুম...দাদাও বললেন, কলকাতায় নিয়ে যেতে পারলেই ভালো হয়...

পঙ্কজিনী দেবী কহিলেন,—কিন্তু এ শরীরে পাহাড় বয়ে নামা...

নীরজা কহিল—সাবধানে গেলেই চলবে। একখানা গাড়ীতে ওঁকে

শুইয়ে আমরা দু'জনে সঙ্গে থাকবো—দাদাও থাকবেন। আর অন্য গাড়ীতে জিনিষ-পত্তর নিয়ে লোকজন যাবে...

পঙ্কজিনী কহিলেন,—উনি বড় দুঃখ করছিলেন—আরাম করে দাদুকে কলকাতায় পাঠাবেন,...কিন্তু সত্যি ভাই, এখানে ডাক্তার কম,—তোড়জোড়ও তেমন নেই, তার জন্য দাদুও অহেতুক হয়তো ঢের বেশী কষ্ট পাচ্ছেন, কাজেই...তবে এ অবস্থায় ওঁকে পাঠাতেও যে মন সরচে না, ভাই।......

তবু সব আপত্তি কাটাইয়া তিন দিন পরে শ্রীনগর ছাড়া হইল। প্রচুর অশ্রু-বর্ষণের মধ্যে এই বিদায়! যতীন্দ্রবাবু বলিলেন,—আজ তো উরি-অবধি। সেখান থেকে টেলিগ্রাম করবেন। নলিনাক্ষ কহিল,—নিশ্চয়!...

নীরজা মার মত বুক পাতিয়া দিল,—নীলিমার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। সেবা করিতে গিয়া আতঙ্কে তার হাত-পা এমন কাঁপিতে থাকে যে, তাহাতে উল্টা বিপত্তি ঘটিয়া যায়! ভয়ে সর্ব্বক্ষণ সে যেন কাঁটা হইয়া আছে!...আর দুস্তর লজ্জা...এমন অপদার্থ সে! হায় রে...

কলিকাতার বাড়ীতে বহু ডাক্তার আসিলেন, বহু পরামর্শ চলিল,—তাঁদের রায় হইল, পায়ে অস্ত্র করিতে হইবে,—এবং তারপরও দীর্ঘকাল ব্রজনাথকে শয্যাশায়ী হইতে হইবে।...হয়তো ও পায়ে পুরানো শক্তি আর ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না!

নীরজার দুই হাত যেন সহস্র হইয়া উঠিল। নির্ভীক বুকে সেবার যত কিছু কঠিন কাজ, তা সে নিজেই করিল। ব্রজনাথের তা ভালো লাগিতেছিল না—এ সময়ে নীলিমার সেই কোমল রাঙা হাত দু'খানি...

কিন্তু তার চোখের জল আর ফুরায় না! প্রেমের দু'টা মধুর বাণী, সোহাগের সে শত ছল.. নীলিমা সে সব ভুলিয়া গিয়াছে! হায় রে, দুর্দ্দিন যখন আসে, তখন এমনি করিয়াই আসে! রাগে অভিমানে ব্রজনাথের বুক তাতিয়া ওঠে!.. আর নীলিমা? মনের অসহ্য বেদনায় একান্তে বসিয়া আঁচলে চোখের জল মুছিতে থাকে! তার চোখে জলের আর বিরাম নাই—সপ্ত-সমুদ্রের সব জল যেন তার দুই চোখে আশ্রয় লইয়াছে!

ক্রমে এমন হইল, যে, নীলিমা চোখের জল মুছিয়া পায়ে হাত বুলাইতে আসিলে ব্রজনাথ বলে,—না, না, তুমি আমার বুকের কাছে এসে বসো—আমি তোমায় দেখি,—দু'চোখ মেলে শুধু তোমার মুখখানি দেখি! এ কথায় নীলিমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া ওঠে—কিন্তু প্রতিবাদ তুলিবার জো নাই, স্বামী এখনি বিরক্ত হইবেন! সে সুখের সহচরী শুধু,...দুঃখে-বিপদে অশ্রু দিয়া সান্ত্বনা রচিতে গেলে তার চলিবে না! যেন এ বিপদে তার বুক এতটুকু কাতর হয় নাই,...সে যেন নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার একটা গ্রামোফোন যন্ত্রমাত্র...তার আবার দুঃখ কি, যাতনা কি! তুমি শুধু সুখের গান গাহিয়া চলো...প্রেমের সুর, প্রীতির সুর! লোককে শুধু আনন্দ দাও, হাসি বিলাও। তোমার বুক ছেঁচিয়া যায় যদি তো তাহাতে কি! বেচারী, বেচারী নীলিমা! হায় ব্রজনাথ, তোমার পা ভাঙ্গিয়া বিছানায় পড়িয়া তুমিই শুধু যাতনা পাইতেছ, কিন্তু অটুট পায়ে বসিয়া দাঁড়াইয়া, চলিয়া ফিরিয়া নীলিমা তার ছোট বুকে যে যাতনা অহরহ ভোগ করিতেছে, তার মর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে না! কেন মিছা রাগ করো যে...প্রমোদ-কুঞ্জে ফুলের সাজে সাজিয়া যে তোমার বিভ্রম জাগাইত, সে আজ অশ্রু দিয়া তোমার এ যাতনার জ্বালা

অনেকখানি ধুইয়া মুছিয়া দিতে পারে—এ কথা কেন তুমি একবারটিও ভাবো না!...

রোগীর পাশ ফিরিয়া শুইবার শক্তি নাই,—নড়িতে গেলে বেদনা লাগে...তার পরিচর্য্যা সহজ নয়,—শক্তির দরকার। তাই সেবায় সেই নীরজা,—বাক্‌হীন গতি-ভঙ্গী দিয়া সে-ই সেবা করিয়া যায়...আর নীলিমার ডাক পড়ে—সেবা-পরিচর্য্যার পর আকাশে-বাতাসে যখন বিহ্বলতা জাগে, সে বিহ্বলতা ঘরে রুগ্নশয্যায় শায়িত ব্রজনাথকে আকুল করিয়া তোলে, তখন...আর নীলিমা আসিলে,—তোমার হাতখানি এই হাতে রাখো, চাও নীল, আমার মুখের পানে...চাঁদের আলোয় তোমায় কি সুন্দর যে দেখায়, পাগল হইবার জো!...এ-সব কথা এত বেদনার মাঝে ভালো কি ছাই লাগে! সে তো বিলাস-খেলার পুতুলটি নয়! সে-ও ব্যথা-বেদনা-হর্ষ-পুলকে দোলা পায়,—হাওয়া দিয়া বা স্বপ্ন দিয়া সে গড়া নয়, রক্ত-মাংসে গড়া নারী, সে তোমার স্ত্রী...

এমনি করিয়া কাচ এই যে ভাঙ্গিল, সে ভাঙ্গা আর জোড়া লাগিল না। আরোগ্য লাভ করিয়া ব্রজনাথের সেই আদর, সেই সোহাগ... নীলিমার মন তাহাতে হা-হা করিয়া ওঠে!...তবু কলের পুতুলের মত তার দুই বাহু ব্রজনাথের নির্দ্দেশে তেমনি তার কণ্ঠে মালার মত দুলাইয়া দিতে হয়, অধরের পাত্র ভরিয়া ব্রজনাথের মর্জ্জি-মত চুম্বন-সুধাও তার তৃষিত অধরে ধরিতে হয়...কিন্তু প্রাণের দিক হইতে এ-সবে আর তেমন সাড়া ওঠে না! এ যেন কারাগারে বন্দীর রাজ-সভায় আসিয়া বৈতালিক গাওয়া!...এ সোহাগ-আদরে তার বুকে আগ্রার সেই ইরাণ বাঁদীর অশ্রু-সজল কাহিনী, কাশ্মীরের সেই মহারাণী অম্বার দুর্ভাগ্যের

কথা বেদনার মত রাজিয়া ওঠে! হায় নারী, পুরুষের বুকে মোহ জাগাইবার জন্যই কি তুমি শুধু এ নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে!

*** *** ***

আরো পাঁচ বৎসর পরে।

সব-চেয়ে অসহ্য যে বিপদ, তাও একদিন ঘটিয়া গেল। তুচ্ছ একটা উপসর্গ ..তারি ফলে একটা জীবনের সব দেনা-পাওনা চুকিয়া গেল। ব্রজনাথের শেষ নিশ্বাস একদিন বাতাসে মিশিল।...

জগতে নিত্য এমন কত ঘটিতেছে...নূতন নয়, আশ্চর্য্যও কিছু নয়! তবু যে চলিয়া গেল, সে যে কতখানি চূর্ণ করিয়া, ছিন্ন করিয়া দিয়া গেল, তার খোঁজ সে রাখিল না! যে যায়, সে-খোঁজ সে রাখেও না কখনো! তা যদি রাখিত তাহা হইলে পরলোকের পথে দীর্ঘ-শ্বাসের ঝড় বহিত, সারাক্ষণ...!...

নীলিমা নির্জীবের মত পড়িয়াছিল। যতিনাথ এখন ডাগর হইয়াছে। কাজ-কর্ম্ম চুকিয়া গেলে বৈষয়িক ব্যাপারের দিকে সকলের লক্ষ্য পড়িল। টাকা-কড়ি বেশী থাকিলে তাদের পানে চাহিয়াই শোক ভুলিতে হয়। ধনীর ঘরে শোক তাই তেমন করিয়া বাসা বাঁধিতে পারে না। শোকে যাদের আকুল হইবার কথা, তারা এই টাকা-কড়ি নাড়িয়া শোক

ভুলিয়া থাকে! তবু সে-সব ধনীর ঘরে এমন লোকও থাকে, টাকা-পয়সার দিকে যারা কোনো কালেই চাহিতে শিখে নাই! তাদের শোক বড় বিষম বাজে...তেমন শোক নীলিমার বুকে বাজিয়াছিল!...

তার মনে হইতেছিল, সে যেন আতস বাজী...ব্রজনাথের হাতে দেওয়া আগুনে আলোর কি ফুল ফুটাইয়া, রঙের কি মালা দুলাইয়া সারা আকাশ আলোয় আলোয় কি রঙীন না করিয়া তুলিয়াছিল! ক্ষণিকের সে আগুন আজ নিবিয়াছে, আর সেও অমনি কালো ছাই হইয়া কালো মাটীর বুকে লাঞ্ছনার মধ্যে মিশিয়া শুধু আবর্জ্জনাই বাড়াইয়াছে!... মস্ত একটা পুলকের হাসি...আজ প্রচণ্ড দীর্ঘ নিশ্বাসে তার সমাধি! তার সমস্ত বুকটা আজ যেন সেই আগ্রার কবরভূমি হইয়া গেছে!

যতিনাথ আসিয়া এক সময়ে ডাকিল,—ছোট-মা···

নীলিমা ভূমি-শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, মুখ তুলিয়া কহিল, —কেন বাবা?

যতিনাথ কহিল,—বাবা ভারী একটা অন্যায় কাজ করে গেছেন... আপনাকে তা খুলে বলা দরকার। অর্থাৎ, তাঁর যা-কিছু বিষয়-সম্পত্তি... সব তিনি আমাদের নামে লিখে দিয়ে গেছেন, আপনার শুধু এ-বাড়ীর এক মহল বাসের জন্য, আর খরচের জন্য মাসিক দু'শো টাকা বরাদ্দ... তা,...আপনি যেমন মা, আমাদের মা হয়েই তেমনি থাকবেন,—দু'শো টাকা কেন, আপনার যখন যা দরকার, আমায় বলবেন...

যতিনাথের কথায় বাধা দিয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে নীলিমা কহিল,—না, না, বাবা,...আমার জন্য কোনো ভাবনা তোমাদের ভাবতে হবে না। দুশো টাকা আর একটা মহলেই বা আমার কি দরকার! এ-সবে কোনো

দরকার নেই...কেনই বা তাঁর দেওয়া? ছি! ছি...কে চেয়েছিল এ-সব? আমার তো এ-সবে কোনো দরকার নেই! আমার জন্যে কিছু ভেবো না, বাবা, তোমাদের সব থাক—আমার কি হবে?...

যতিনাথ একটু অপ্রতিভ ভাবেই কহিল,—শুনুন ছোটমা, আমার যা কথা...

নীলিমা কহিল,—তোমাদের কারো উপর কোনো অভিমান নেই আমার, বাবা। তোমায় তো আমি জানি, বাবা...তোমার মঙ্গলের চেয়ে আমার কোনো কামনাই বড় নয়—তোমার সামনে আমার মনের কথা বলচি, আমি...এ-সব তুচ্ছ পয়সা-কড়ির দিকে কোনো ঝোঁক নেই আমার —কোনোদিন ছিলও না...তাঁর সঙ্গে আমার জীবনেরও সব শেষ হয়ে গেছে ..একখানা কাপড়, লজ্জা-রক্ষার জন্য...তার সংস্থান আমার আছেও ...আমার জন্য কিছু ভেবো না বাবা,...এ পয়সা-কড়ি, বা বিষয়-সম্পত্তির এক কণাও আমি ছুঁতে চাই না—এর উপর আমার এতটুকু লোভ নেই, কোনো দিনই ছিল না...

যতিনাথ কাঠ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল...ভাবিল, এত বড় শোকের মধ্যে এ সব তুচ্ছ পয়সা-কড়ির কথা কহিতে আসা তার উচিত হয় নাই। থাক, অন্য এক সময়ে নয়...যতিনাথ চলিয়া গেল।

নীরজা আসিয়া ডাকিল,—ছোট বৌ...

নীলিমা কহিল—দিদি...

নীরজা কহিল,—খুবই তোর দুঃখ বেজেচে জানি বোন, তা বলে নিজেকে এমনভাবে হত্যা করবি? না। তোর ছেলে-মেয়ে, তোরি এ সংসার—ওঠ্ বোন...

নীলিমা কহিল,—আমায় মাপ করো দিদি...আমার চিরদিনের জন্য ছুটী হয়ে গেছে...আমায় কিছু করতে বলো না। এ বাড়ী আমার যেন আগুনের খাপ্‌রা বলে মনে হচ্ছে...আমায় অনুমতি করো দিদি, আমি এ-বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচি...

নীরজা কহিল,—আমার কোনো ব্যবহারে অভিমান করেচিস, বোন?...সত্যি বলচি, স্বামীকে নিয়েছিলি, তার জন্য কোনো দিন আমি তোর হিংসা করিনি...ছোট বোনের মতই দেখে আসচি তোকে সেই প্রথম দেখার দিন থেকেই...

নীলিমা কহিল,—তা কি আমি জানি না, দিদি...তবে আমার এ যে কতখানি বাজচে, কিসে আর কোথায় বাজচে, আজ তোমায় তা বোঝাতে পারবো না। একদিন বোঝাবো, যদি পারি!...তবে আজ শুধু এইটুকু বলি যে, আমার সমস্ত দেহ-মন লজ্জায় ধিক্কারে আমায় পাগল করে তুলচে যেন...প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্ত্তে...

নীরজা নির্ব্বাক বিস্ময়ে নীলিমার পানে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা কাঠ হইয়া বসিয়াছিল,—এত-বড় অপমান শেষের দিনেও করিয়া গেলে তুমি, স্বামী হইয়া! আমায় তো জানিতে, পয়সা-কড়ির কাঙাল আমি কোনোদিন ছিলাম না গো...মাসহারা ও বাসের ব্যবস্থা করিয়া তোমার মস্ত কর্ত্তব্য তুমি করিয়া গিয়াছ, স্বামী তুমি, তোমায় সে জন্য সহস্র ধন্যবাদ! যদি তোমার এই বিষয়-সম্পত্তির সবটুকুই তুমি আর সকলকে বঞ্চিত করিয়াও আমায় দিয়া যাইতে, তুমি ভাবো, আমি তা লইতাম? কথনো-না...আমার এই রূপ আর এই শ্রী লইয়া যে বিলাসের

খেলা খেলিয়াছ, সে খেলা আমার মনে-প্রাণে কি আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে! আমার বুক জ্বলিয়াছে, আর সে আলোয় তুমি দেওয়ালির উৎসব করিয়াছ!...ভালোবাসা!...এ মোহ, এ বিভ্রমের সাধই যদি জাগিয়াছিল তো বিবাহের মন্ত্র পড়িতে গিয়াছিলে কেন! সমাজের কাছে সুনাম রক্ষা করিতে, পাছে কোনো কলঙ্ক হয়, সে কলঙ্ক হইতে বাঁচিবার জন্য...? স্বার্থপর পুরুষ!...রূপের মদিরা-পিয়াসী-পুরুষ, নারীকে চাও প্রাণমনহীন একটা পানের পাত্র করিতে! আর নারী, তার বুক-ঢালা ভালোবাসা দিয়া, তার সর্ব্বস্ব দিয়া শুধু অপমান আর লাঞ্ছনাই কিনিয়া থাকে... স্ত্রীর প্রাপ্য সম্মানটুকুও তাকে যে-স্বামী দিতে পারে নাই কোনোদিন ..

প্রচণ্ড রোষে ক্ষোভে নীলিমার বুক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। তারি আঁচে সমস্ত শরীর এমন কঠিন ভাব ধারণ করিল...

নীরজা সভয়ে ডাকিল,—ছোট বৌ...

নীলিমা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—কোনো ভয় নেই দিদি, তুমি যাও ..

নীরজা কহিল,—আমি এমনি যাবো না তো...তুইও আয়। মুখে একটু কিছু দিবিনে? আয়...

নীলিমা কহিল,—আমায় মাপ করো দিদি,—জল গ্রহণ করার শক্তিও নেই আমার...ছোট বোন আমি,...একটু আমায় একলা থাকতে দাও...

নীরজা একটু দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কহিল,—আসবি তো একটু পরেই...?

নীলিমা কহিল,—আসবো,...

নীরজা কহিল,—আমার মাথা খাবি, যদি না অ

নীলিমা কহিল,—আসবো, আসবো দিদি ..

—আসিস শীগগির—বলিয়া নীরজা চলিয়া গে... র নীলিমা তেমনি কাঠ হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।...